গান্ধী

অন্নদাশঙ্কর রায়

এম. সি. সরকার অ্যাণ্ড সন্স প্রাইভেট লিমিটেড
১৪, বঙ্কিম চাটুজ্যে স্ট্রীট, কলিকাতা-৭৩

ভূমিকা

অসহযোগের দিনে আমিও ছিলুম গান্ধীজীর অন্ধ ভক্ত। তারপর রবীন্দ্রনাথের প্রভাবে আমিও সমালোচক হয়ে উঠি। কিন্তু বিকল্প কোনো পন্থার সন্ধান না পেয়ে, বিকল্প কোনো নেতৃত্বের উপর আস্থা রাখতে না পেরে আবার সেই মহাত্মার কাছেই ফিরে আসি। এবার কিন্তু অন্ধ ভক্ত হিসাবে নয়। সমালোচক হিসাবেও নয়।

তা হলে কী হিসাবে? তা এককথায় বোঝানো যাবে না। তার জন্যে আস্ত একখানা পুঁথি লিখতে হয়। সেরকম পুঁথি লেখার সাধ বিশ-একুশ বছর বয়সেই হয়েছিল। লিখলে লিখতুম ইংরেজীতে। তার নাম দিতুম 'গান্ধীজম ইন থিওরি অ্যাণ্ড প্র্যাকটিস'। বিধাতা আমাকে সেই ছেলেমানুষীর থেকে রক্ষা করেছেন।

গান্ধীজীর এপিক সংগ্রাম নিয়ে নতুন এক মহাভারত লেখার খেয়ালও যে কখনো হয়নি তা নয়। লিখলে সেটা হতো এপিক উপন্যাস। তার সময় এখনো আসেনি। তার জন্যে আরো পঞ্চাশ বছর অপেক্ষা করা চাই। সেকাজ আমাদের কারো সাধ্য নয়।

তারপরে ভাবি গান্ধী যুগের শেষ পাঁচ বছর নিয়ে বড়ো একটা উপন্যাস লিখব, কিন্তু তাঁকে আমার নায়ক বা প্রধান চরিত্র করব না। তিনি চকিতে দেখা দিয়ে যাবেন। অন্যান্য নেতারাও। পরে আবার এ কল্পনাও ত্যাগ করি। ছোটখাটো ট্র্যাজেডী আমি সহ্য করতে পারি, কিন্তু এত বড়ো ট্র্যাজেডী আমার সহনাতীত। তাই বচনাতীত। স্বাধীনতাদিবসেই দাঁড়ি টানতুম। কিন্তু সেটাও কি কম ট্র্যাজিক নাকি? বাংলাদেশ ও ভারতভূমি এক কোপে দু'খানা হয়ে গেল, কী করে আমি অবিচলিত না হয়ে বর্ণনা করব? আর অবিচলিত না হয়ে কথাসাহিত্যের জগতে সিদ্ধি কোথায়?

গান্ধীজীর তিরোধানের পর বন্ধুরা আমার কাছে প্রত্যাশা করেন তাঁর একটি জীবনকথা। স্বর্গীয় সুধীরচন্দ্র সরকার তাঁদের একজন। আরেকজন শ্রীঅচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত। আমি এড়াতে চেষ্টা করি। কিন্তু যখন যা মনে আসে তা খাতায় টুকতে শুরু করি। সেসব খাতা জমতে জমতে পাহাড় হয়েছে। আমার নিজের লেখা নোট পড়তেই এত সময় লাগবে যে ততদিনে পুরো মাপের একখানা বই লিখে ফেলা যায়। শতবার্ষিকীর আগেই ও ভার মাথা থেকে নামাতে চাই বলে একদিন কলম ধরি। তারই পরিণতি এ বই।

না বলা রয়ে গেল দশগুণ কথা। অপরের জন্যে সেসব অপেক্ষা করবে। আমি গান্ধীবিশেষজ্ঞ নই। গান্ধীবাদীও নই। আমি একজন সাক্ষীমাত্র। তাও দূর থেকে। এই আমার সাক্ষ্য। অন্যের সাক্ষ্যের সঙ্গে মিলতেও পারে, না মিলতেও পারে। তবু সত্য।

অন্নদাশঙ্কর রায়

শ্রীমতী লীলা রায়

প্রিয়তমাসু

"I know, too, that I shall never know God if I do not wrestle with and against evil even at the cost of life itself."

— Gandhi

॥ এক ॥

কথাটা তাঁর শত্রুপক্ষের মুখে শোনা। বোধহয় সেই জন্যে আমাকে অমন চমৎকৃত করেছিল। যতদূর মনে পড়ে ১৯৪২ সালের কথা। কিন্তু আগস্ট মাসের আগেকার কি না স্মরণ নেই।

"All his ideas are right. But he is two hundred years in advance of his time."

বলেছিলেন যিনি তিনি একজন পুলিশ অফিসার। আইরিশম্যান। রোমান ক্যাথলিক। বয়সে অনেক বড়ো। গোয়েন্দা বিভাগে উচ্চতর পদে অধিষ্ঠিত ছিলেন যখন তখন নিশ্চয়ই গান্ধীজীর ক্রিয়াকলাপের সঙ্গে গোপনীয় সূত্রে পরিচিত।

দু'শ বছর আগে, একথা যদি স্বীকার করি তবে হয়তো মেনে নেওয়া হবে যে ভারতের স্বাধীনতারও ততকাল বিলম্ব হবে। কিন্তু ভদ্রলোক সে অর্থে বলেননি। গান্ধীজীর নৈতিক, আধ্যাত্মিক ও সামাজিক আইডিয়াগুলোরই কথা তাঁর মানসে ছিল।

গান্ধীজীর স্বপ্নের ভারত যে বিংশ শতাব্দীতে সম্ভব নয় এটাই ছিল তাঁর বক্তব্য। কিন্তু স্বপ্নটা অবাস্তব নয়। বাস্তব রূপ পরিগ্রহ করবে দ্বাবিংশ শতাব্দীতে।

ততদিন অপেক্ষা করতে আমার মন রাজী ছিল না। গান্ধীজীর যেমন অলৌকিক প্রতিভা তিনি হয়তো আমার জীবিতকালেই অসাধ্য সাধন করবেন। যুক্তিবাদী হিসাবে আমি মিরাক্ল বিশ্বাস করতুম না। গান্ধীজীর বিরুদ্ধে এই নিয়ে কতবার বলেছি। তবু অন্তরে অন্তরে বিশ্বাস করতুম যে গান্ধীজী একজন মিরাক্ল মেকার। ঘটাবেন একদিন এক মিরাক্ল। ভিতরে ভিতরে আমি ছিলুম ভক্তিবাদী।

"তামিল ব্রাহ্মণ আর সীমান্তের পাঠান মিলে এক নেশন হতে পারে কখনো? এক টেবিলে বসে খাবে?" শ্লেষের সঙ্গে বলেছিলেন পুলিশ সাহেব। আরেকদিন।

"নিশ্চয়। রাজাজী আর সীমান্ত গান্ধীর দিকে চেয়ে দেখুন।" আমি সগর্বে বলি।

একবারও মনে উদয় হয়নি যে ১৯৪৭ সালে পুলিশ সাহেবের কথা ফলে যাবে। কেন যে তিনি ভারতীয় একতায় বিশ্বাস করেন না! সাম্রাজ্যবাদী সংস্কার তাঁরও আছে।

জেল থেকে গান্ধীজীও বলতে আরম্ভ করলেন যে তিনি একশো বিশ বছর বাঁচতে চান। তার মানে স্বাধীনতার দেরি আছে। আরো একবার কি দু'বার বলপরীক্ষা

দিতে হবে। ওদিকে হিন্দুমুসলিম সমস্যাটি তো প্রায় সমাধানের অতীত। যদি গৃহযুদ্ধ এড়াতে হয় তবে তার জন্যেও গণসত্যাগ্রহের দরকার হতে পারে।

একপক্ষ যদি দাবী করেন যে হিন্দু মুসলিম নির্বিশেষে সব ভারতবাসীরই তাঁরা প্রতি-নিধি আর অপরপক্ষ যদি পাল্টা দাবী করেন যে ভারতীয় বলে কেউ নেই, আছে শুধু মুসলমান ও হিন্দু, আর তাঁরাই হলেন সব মুসলমানের একমাত্র প্রতিনিধি তা হলে গৃহযুদ্ধ ছাড়া আর কীভাবে এর মীমাংসা হতে পারে আমার বুদ্ধিতে কুলোত না। কিন্তু গান্ধীজীর উপর আর তাঁর অলৌকিক ক্ষমতার উপর এমনি গভীর ছিল আমার আস্থা যে, আমি আশা করতুম গৃহযুদ্ধও এড়ানো যাবে, যদি একপক্ষ অহিংসার দ্বারা অপর পক্ষকে প্রতিরোধ করে।

একদিন খবর পেলুম যে গান্ধীজী শান্তিনিকেতনে আসছেন। আমরা দু'জনেই তাঁর সঙ্গে দেখা করতে পারি, যদি সিউড়ি থেকে তাঁর প্রার্থনাসভার পূর্বে এসে হাজির হতে পারি। কিন্তু নবজাত কন্যাকে নিয়েও যাওয়া যায় না, রেখেও যাওয়া যায় না। তাই তার মা রইলেন বাড়িতে আর আমি একাই উঠে বসলুম মোটরে। পথে আমার সঙ্গ নিলেন আমাদের সদর মুনসেফ। পৌঁছে শুনি গান্ধীজী আমার সঙ্গে আলাপ করতে রাজী। পনেরো মিনিট সময় হাতে রেখেছেন। যা তিনি সাধারণত করেন না।

দিনটা ছিল ১৯শে ডিসেম্বর ১৯৪৫। সেইদিনই অ্যাণ্ড্রুজ মেমোরিয়াল হাস-পাতালের ভিত্তিশিলা স্থাপন। বিনয়ভবনের কাছাকাছি এক দাগ জমিতে। গান্ধীজী পায়ে হেঁটে আসতে আসতে আমার সঙ্গে সাক্ষাৎকারের সময় উত্তীর্ণ হয়ে যায়। শুধু দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়েই দুটি-একটি কথা হয় উত্তরায়ণের প্রাঙ্গণে।

"ইনি" আমাদের জেলা জজ, কিন্তু—" বলে আমার সাহিত্যিক পরিচয় দিতে যাচ্ছিলেন রথীন্দ্রনাথ।

"বাট হি ইজ নো জজ।" বলে গান্ধীজী কথা কেড়ে নেন। তাঁর মুখে দুষ্টু হাসি। বলেই তিনি 'শ্যামলী'র দিকে পা বাড়াতে যান।

আমি তাকে মনে করিয়ে দিই যে মালিকান্দায় তাঁর সঙ্গে সাক্ষাৎ করেছিলুম। তারপর অন্যের কানে না যায় এমনভাবে খুব তাড়াতাড়ি ও খুব কম কথায় নিবেদন করি যে কলকাতা শহরের ক্ষুধা আর কলকাতার বড়লোকের লোভ বাংলাদেশের মন্বন্তরের জন্যে প্রত্যক্ষভাবে দায়ী।

'শ্যামলী'তে প্রবেশ করবার মুখে গান্ধীজী বলেন, "আজ তো সময় হবে না। আরেকদিন শুনতে চাই আপনার কথা। কলকাতা সম্বন্ধে ওকথা আরো কেউ কেউ আমাকে বলেছেন।"

অহিংস পন্থা তৈরি নেই দেখে দেশের লোক বাঁটোয়ারায় রাজী হয়ে গেল। গান্ধীজীর জন্যে অপেক্ষা করল না।

তাছাড়া এমন কোনো সংবিধান রচনা করা সম্ভব ছিল না যেটা কংগ্রেস লীগ উভয় দলের বা হিন্দু মুসলিম উভয় সম্প্রদায়ের গ্রহণযোগ্য। ইংরেজরা যে সংবিধান দিয়েছিল তাকে খারিজ করা সোজা, কিন্তু তার বদলে আর একটি সংবিধান নিজেরাই একমত হয়ে গড়ে তোলা রাম রহিমের অসাধ্য। মহাত্মা কি তাঁর অহিংসা দিয়ে কারো উপরে কিছু চাপিয়ে দিতেন নাকি? না, ঐক্যের নামেও কিছু চাপানো যেত না। তা সে যতই ভালো হোক। সবাই স্বেচ্ছায় নেবে এমন জিনিস একটিমাত্র ছিল, ইংরেজের হাত থেকে মুক্তি। আর সবই বিতর্কিত। মহাত্মাও সে বিতর্কের উত্তর জানতেন না।

জানতেন হয়তো কোনো এক ডিক্টেটর, যাঁর পেছনে হিন্দু মুসলিম উভয় সম্প্রদায়ের সশস্ত্র সৈন্যবল। কিন্তু সেদিন আমরা দেখেছি সৈন্যদলও একই ধ্বজা বইবে না, একই কমাণ্ড মানবে না। সর্বত্র একাত্মগত্যের অভাব। কি পুলিশ কি সিভিল সার্ভিস। কি জনসাধারণ। ইংরেজ যদি সময় থাকতে উত্তরাধিকারী স্থির করে দিয়ে না যেত তা হলে উত্তরাধিকার নিয়ে শাহজাহানের ছেলেদের মতো লড়াই বেধে যেত।

স্বাধীনতার সংগ্রাম যাদের একজোট করতে পারেনি ক্ষমতার দ্বন্দ্ব তাদের একচ্ছত্রাধীন করত? না, তেমন কোনো মিরাক্ল মহাত্মার হাতের মুঠোয় ছিল না। অনশন বৃথা হতো। নিয়তির গতি দুর্বার। ব্রিটিশ অপসারণকেও রুখতে পারা যেত না, সর্বসম্মত হস্তান্তর না ঘটলে হিন্দু মুসলমানের দ্বন্দ্বকেও ঠেকাতে পারা যেত না।

পনেরোই আগস্টের দিন সাতেক আগে আমি ময়মনসিং থেকে বদলি হয়ে চলে আসি। গান্ধীজী তখন কলকাতায় শান্তি পুনঃস্থাপনের সাধনায় নিযুক্ত। চোখে দেখলুম তাঁর সিদ্ধি। পনেরোই আগস্ট ঘোরতর রক্তপাত হবে এরকম একটা দুঃস্বপ্নের ভিতর রাত কাটে। কিন্তু রাত পোহাবার আগেই যে মর্মভেদী চিৎকার শুনে জেগে উঠি তা মহামারীর নয়। নিজের কানকেই বিশ্বাস হয় না এমন এক সুধাবর্ষণ। ভাইয়ে ভাইয়ে কোলাকুলি করছে, তাই তাদের হর্ষধ্বনি। শুধু সেই নয়। ইউনিয়ন জ্যাক নেমে গেছে। দু'শ বছরের জগদ্দল। ওইটেই সত্যিকার সত্য।

পনেরোই আগস্ট যা ঘটল তা অলৌকিক ঘটনা বইকি। গান্ধী না হলে আর কোন শক্তি তা পারতেন না। কলকাতা থেকে ঢাকা, ঢাকা থেকে বাংলার সর্বত্র গড়িয়ে যেত রক্তস্রোত। ধাবিত হতো জনস্রোত। দেখতে দেখতে আর একটা পাঞ্জাব ট্র্যাজেডী। একজন মানুষ যে একটা ট্র্যাজেডী নিবারণ করতে পারেন এটা ইতিহাসে

সোনার অক্ষরে লেখা থাকবে। পারতেন কি তিনি যদি অদ্বেষ্টা সর্বভূতানাং মৈত্রঃ করুণঃ না হতেন ? যদি তাঁর অহিংসা শক্তিধর না হতো ? হ্যাঁ, এটাও সত্যিকার সত্য।

ঐতিহাসিক শক্তিগুলো ব্যক্তি নয় যে ব্যক্তিবিশেষের অহিংস যাদুদণ্ড তাদের গতি বা স্থিতি নিয়ন্ত্রণ করতে পারবে। ভারতবর্ষে তিন তিনটে শক্তি কাজ করছিল। ইংরেজ, তার প্রতিপক্ষ কংগ্রেস, তার প্রতিপক্ষ লীগ। বছরখানেকের জন্যে তিন শক্তি একই শিখরে সমবেত হয়েছিল। সেখানে নিত্য মতান্তর। ইংরেজ মাঝখানে না থাকলে আর দুটো জুড়ে যেত এই ধারণা ভুল। ভারতবর্ষের ইতিহাসে ইংরেজ আগমনের পূর্বে যেমন দুই প্রধান শক্তি ছিল মুঘল ও মরাঠা পরেও তেমনি দুই প্রধান শক্তি হলো কংগ্রেস ও লীগ। দুই শক্তির দুই স্থান। এটা ঐতিহাসিক নিয়তিবাদ বা ডিটারমিনিজম। ব্যক্তি এখানে নিমিত্তমাত্র, হলেনই বা তিনি মহাত্মা। পনেরোই আগস্ট প্রমাণ করে দিল যে ঐতিহাসিক শক্তির খেলায় ব্যক্তির ইচ্ছা অনিচ্ছা কিছু নয়।

আবার সেই পনেরোই আগস্ট কি সাক্ষী রইল না যে অসাধারণ ব্যক্তি না থাকলে ও তাঁর যাদুদণ্ড না থাকলে বাংলাদেশে পাঞ্জাবের পুনরভিনয় হতো ? মানতেই হবে যে ইতিহাসে ডিটারমিনিজম সব কথা নয়। ব্যক্তিও একপ্রকার শক্তি। ভারতবর্ষের স্বাধীনতায় কংগ্রেস নামক শক্তি ও গান্ধী নামক ব্যক্তি কার কী পরিমাণ অংশ তা নির্ণয় করা সহজ নয়। কংগ্রেস নেতারা সাধারণত গান্ধীজীর সিদ্ধান্তই চূড়ান্ত বলে মেনে নিতেন, কিন্তু মাউন্টব্যাটেনের সঙ্গে কথাবার্তার বেলা এর ব্যতিক্রম দেখা গেল। মহাত্মার সঙ্গে পরামর্শ না করেই, এমন কি তাঁকে না জানিয়েই, কথাবার্তার বেসিস বদলে দেওয়া হয়। একটিমাত্র কেন্দ্র থাকবে, তার নিচে থাকবে তিনটে জোন, তাতে কংগ্রেস ও লীগ উভয়ের ভারসাম্য, এই ছিল বেসিস। পরে এক সময় দেখা গেল এভাবে কথাবার্তা অগ্রসর হবে না। ইংরেজ না থাকলে উচ্চতম পর্যায়ে মতবিরোধ ও নিম্নতম পর্যায়ে অরাজকতা রোধ করা যাবে না। অতএব দুই পাঞ্জাব। দুই বাংলা। কংগ্রেস ও গান্ধী দ্বিমত।

নিম্নতম পর্যায়ের অরাজকতা আমার সাক্ষাৎ অভিজ্ঞতা। নোয়াখালীর পুনরাবৃত্তি ময়মনসিংহ জেলায় হতে পারত, হলো না যে তার জন্যে সাধুবাদ দিতে হয় আমাদের জনাকয়েক সহকর্মী অফিসারকে। এঁরা নিষ্ক্রিয় হলে গান্ধীজীর অহিংস সহকর্মীরা হয়তো জানতেনই না কোথায় কী ঘটেছে। নৈরাজ্যবাদী আমি, আমাকেও অবশেষে স্বীকার করতেই হলো যে পুলিশ চাই, আদালত চাই, জেল চাই ও কিছুতেই সামলাতে না পারলে মিলিটারি চাই। তার মানে পুরোদস্তুর রাষ্ট্রিক কাঠামো চাই। কাঠামোটা

কার হাতে পড়বে, কংগ্রেসের হাতে না লীগের হাতে, সেটা পরের কথা। কিন্তু কাঠামো একটা না থাকলেই নয়। সে কাঠামো আধুনিক হওয়া চাই। সেকেলে হলে চলবে না। এদিক থেকে বিচার করলে ইংরেজ রাজত্ব আমাদের যা দিয়ে গেছে তা মহামূল্য সম্পদ।

॥ দুই ॥

সাতচল্লিশ সালের গোড়ার দিকে গভর্নর আসেন ময়মনসিং সফরে। ডিনারে ডাকেন। সেই প্রথম তাঁর মুখে শুনি যে ইংরেজরা সত্যি সত্যি চলে যাচ্ছে।

"হিন্দু মুসলমান পরস্পরের সঙ্গে লড়তে চায় লড়ুক। আমরা কেন থাকব রিং ধরতে?" মানে সার্কাসের রিং।

আরো বললেন, "আমরা ভেবে দেখেছি যে বাণিজ্যেই লাভ। আয়ারল্যাণ্ড স্বাধীন হবার পর থেকে সেদেশে আমাদের বাণিজ্য বেড়ে গেছে। ভারতবর্ষেও তাই হবে।"

একদিন যেমন ওরা বণিকের মানদণ্ড ছেড়ে রাজদণ্ড ধরেছিল তেমনি শর্বরী পোহালে রাজদণ্ড ছেড়ে মানদণ্ড ধরবে। এখন শর্বরী পোহালে হয়।

মহাত্মা তখন নোয়াখালীতে শর্বরীর অন্ধকারে পথ হাতড়ে চলেছিলেন। কোনদিকে এতটুকুও আলোর ছটা দেখতে পাচ্ছিলেন না।

আমার অন্তরেও তখন একটা মন্থন চলছিল। ইংরেজ তো আপনা হতে যাচ্ছেই, তাকে গলাধাক্কা দিতে হবে না। বিদ্রোহ বিপ্লব গণসত্যাগ্রহ সবই এখন নিষ্প্রয়োজন। যেটা সত্যিকার প্রয়োজন সেটা হচ্ছে দুর্জনের হাত থেকে সুজনকে রক্ষা করা।

গান্ধীজী আমার তরুণ মনে যে ক'টি স্বপ্নের বীজ বুনেছিলেন তার একটি ছিল নৈরাজ্য, আর একটি সত্যাগ্রহ। একটি ছিল এণ্ড, আর একটি মীনস। অন্যান্য নেতারা কেউ আমার মনে তেমন কোনো স্বপ্নের আবাদ করেননি।

আপাতত তাঁর সমস্ত শক্তি তিনি নিয়োগ করেছিলেন মীনসের উপরে, সত্যাগ্রহের উপরে। তাঁর কথা হলো মীনস যদি ঠিকমতো অনুসরণ করা হয় তবে এণ্ড আপনি ভিতর থেকে আসবে। এণ্ড নিয়ে আমরা যেন অকারণে মাথা না ঘামাই।

কিন্তু এই অরাজকতাই কি সেই নৈরাজ্য? আলেয়া কি আলো? না, তা নয়। শুনতে কতকটা একই রকম, আসলে অন্য জিনিস।

দু'শো বছরের সাম্রাজ্য যখন ভেঙে পড়ে তখন দিকে দিকে অরাজকতা দেখা দেয়। মুঘল সাম্রাজ্যের শেষেও দেখা গেছে। ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের রাত বারোটা বাজার আগেও দেখা

যাচ্ছে। নানা যুগে নানা দেশে এর নজীর মেলে। এর নাম সত্যাগ্রহসাপেক্ষ নৈরাজ্য নয়। এর জন্যে এদেশের লোক আটাশ বছর কাল সাধনা করেনি।

এটা অন্য জিনিস। বেশ, তা না হয় হলো। কিন্তু এখন এর সম্মুখীন হই কী করে? অরাজকতার সঙ্গে মোকাবিলা করতে হলে আমার হাতে কী থাকবে? রাজদণ্ড না সত্যাগ্রহ নামে নতুন এক অস্ত্র? আমাকে দুঃখের সঙ্গে স্বীকার করতে হলো যে সত্যাগ্রহ দিয়ে অরাজকতার প্রতিরোধ করা কাজের কথা নয়, প্রতিরোধ করা চলে সুপ্রতিষ্ঠিত রাজশক্তির। তার অসহনীয় অন্যায়ের। তার অন্তহীন অধীনতার। তার ভিত্তিমূলে অবস্থিত হিংসার। তার অপ্রতিদ্বন্দ্ব বাহুবলের।

তত্ত্বের দিক থেকে এটা হয়তো ঠিক যে সুপ্রতিষ্ঠিত রাজশক্তির চেয়ে অরাজকতা এমন কী ভয়ঙ্কর যে সত্যাগ্রহের দ্বারা তার প্রতিরোধ অহিংসাব্রতীর অসাধ্য? তা নিয়ে তর্ক করা যেতে পারত, কিন্তু তর্কের জন্যে আমাদের হাতে সেদিন সময় যথেষ্ট ছিল না। গভর্নর ময়মনসিং ছাড়ার কিছুদিন বাদে ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রী ঘোষণা করেন যে ১৯৪৮ সালের জুন মাসের মধ্যেই ইংরেজ রাজত্বের অবসান হবে। ক্ষমতা কার হাতে হস্তান্তর করা হবে সেটা নির্ভর করবে ভারতীয়দের একমত হওয়া না হওয়ার উপরে। একমত না হলে একাধিক হাতে।

একমত হওয়া যে একান্ত জরুরি এবিষয়ে আমার সন্দেহ ছিল না। সময় বয়ে গেলে আদর্শ সমাধানও অবাস্তব হয়ে যায়। সুতরাং সময় থাকতে এমন কোনো সিদ্ধান্ত নিতে হবে যা হয়তো আদর্শের দিক থেকে খাটো, কিন্তু বাস্তবের দিক থেকে অপেক্ষাকৃত কার্যকর। সে সিদ্ধান্ত আর যাই হোক অরাজকতা নয়।

সুপ্রতিষ্ঠিত রাজশক্তির আসনে সুপ্রতিষ্ঠিত রাজশক্তিকেই বসাতে হবে। সেই যে নতুন রাজশক্তি তার অধীনেও সৈন্য পুলিশ আদালত ও জেল থাকবে। রাষ্ট্রিক কাঠামো ভেঙে দিয়ে বা তাকে ভেঙে যেতে দিয়ে ক্ষমতার হস্তান্তর কার কোন কাজে লাগবে? সে যেন গাছে উঠিয়ে দিয়ে মই কেড়ে নেওয়া! অমন একটা অসহায় গবর্নমেণ্ট অরাজকতা রোধ করতে অক্ষম হবে।

গান্ধীপন্থীদের প্রত্যেকের জীবনে সে এক অগ্নিপরীক্ষা। ওঁরা চেয়েছিলেন সাত লক্ষ গ্রামে সাত লক্ষ রেপাবলিক গজিয়ে উঠবে। তারা তাদের ক্ষমতার কিয়দংশ অর্পণ করবে উপরিতন আঞ্চলিক রেপাবলিককে। তারা তাদের ক্ষমতার কিয়দংশ অর্পণ করবে তাদের উপরিতন প্রাদেশিক রেপাবলিককে। তারাও তেমনি তাদের ক্ষমতার কিয়দংশ অর্পণ করবে কেন্দ্রীয় রেপাবলিককে। ইংরেজ যদি রাষ্ট্রিক ক্ষমতা অপর এক রাজশক্তিকে হস্তান্তর না করে চলে যায় তা হলেই সাত লক্ষ রেপাবলিক

গজিয়ে ওঠার সুযোগ পায়। নতুবা একবার হস্তান্তর হয়ে গেলে তারপর যে রাজশক্তি প্রতিষ্ঠিত হবে সেই হবে ক্ষমতার মালিক। সে হয়তো কেন্দ্রীয় ক্ষমতার কিয়দংশ প্রদেশকে দেবে, তারপর প্রদেশ হয়তো প্রাদেশিক ক্ষমতার কিয়দংশ অঞ্চলকে দেবে, তারপর অঞ্চল হয়তো আঞ্চলিক ক্ষমতার কিয়দংশ গ্রামকে দেবে। একেবারে বিপরীত প্রোসেস।

শাসনের দিক থেকে ক্ষমতার ভাণ্ডারে একপ্রকার শূন্যতা না হলে সাত লক্ষ রেপাবলিক গজিয়ে উঠতে পারে না। অপরপক্ষে শূন্যতা হয়েছিল বলেই অষ্টাদশ শতাব্দীতে শত শত দেশীয় রাজ্য গজিয়ে উঠেছিল। ইংরেজরা তাদের সংখ্যা কমাতে কমাতে প্রায় ছ'শোটিতে দাঁড় করিয়েছিল। আবার এক শূন্যতা সৃষ্টি হলে কে জানে ক'হাজার বঙকাল রাজ্য মাটি ফুঁড়ে ওঠে! সেইজন্যে শূন্যতার উপরে ভারতীয় জাতীয়তাবাদীদের বিশ্বাস ছিল না। সে ঝুঁকি তাঁরা নিতেন না।

লগ্ন উত্তীর্ণ হয়ে গেলে যেমন পরিণয় হয় না তেমনি ইতিহাসও হয় না। বেশ বুঝতে পারছিলুম যে ইংরেজ চলে যাচ্ছে। নেতারা একমত হতে না পারলে ক্ষমতার হস্তান্তর একাধিক হাতেই হবে। একাধিক মানে দুই হাতও হতে পারে, দশ হাতও হতে পারে। ক্ষমতার হস্তান্তর না হলে যা হবে তা শূন্যতাও হতে পারে। কুইট ইণ্ডিয়া টু গড অর অ্যানার্কি।

সিপাহী বিদ্রোহের সময় থেকেই ইংরেজদের একটি স্কীম ছিল, তাকে বলত র‍্যালিয়িং পয়েন্ট স্কীম। কোথাও বিদ্রোহ বাধার লক্ষণ দেখলে জেলার সব জায়গার ইংরেজরা এক জায়গায় জুটত। তাদের সেখানে নিরাপত্তার ব্যবস্থা হতো। সাতচল্লিশ সালে সেই জাতীয় একটা স্কীম প্রস্তুত করেন বড়লাট ওয়েভেল। সারা ভারতের সব প্রদেশের ইংরেজ এক প্রদেশে জমায়েত হবে ও মিলিটারি প্রোটেকশন পাবে। অন্যান্য প্রদেশ থেকে ব্রিটিশ শাসন গুটিয়ে আনা হবে। এ পরিকল্পনা যখন ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রী অ্যাটলীর কাছে পেশ করা হয় তখন তিনি সেটা নাকচ করে ওয়েভেলকেই সরিয়ে দেন।

এরপর মাউন্টব্যাটেন আসেন বড়লাট হয়ে। তিনি দেখেন ক্যাবিনেট মিশন স্কীমের ভিত্তিতে নেতারা একমত হবেন না। বৃথা চেষ্টা। কিন্তু ওয়েভেলের মতো হাল ছেড়ে না দিয়ে তিনি নতুন করে কথাবার্তা শুরু করেন। ইতিমধ্যে পাঞ্জাবের কোয়ালিশন ভেঙে যাওয়ায় বিকল্প সরকারের আশা না থাকায় গভর্নরের শাসন চলছিল। হঠাৎ হিন্দু ও শিখদের তরফ থেকে দাবী ওঠে, পাঞ্জাব পার্টিশন করা হোক। এ দাবী পাঞ্জাব থেকে বাংলায় ছড়ায়। এ দাবী ওঠার আগে পাঞ্জাবে একদফা দাঙ্গা হয়ে গেছে। তেমনি বাংলায়। একদিকে মুসলিম লীগ দাবী করছে ভারতবর্ষের পার্টিশন,

অপর দিকে পাঞ্জাব বাংলার হিন্দু শিখ দাবী করছে স্ব স্ব প্রদেশের পার্টিশন। নেতাদের সঙ্গে কথা কয়ে মাউন্টব্যাটেন বুঝতে পারেন যে, দোতরফা যদি হয় তবে পার্টিশনে রাজী আছেন বল্লভভাই ও জবাহরলাল। সেই মর্মে মাউন্টব্যাটেন প্ল্যান তৈরি হয়। জীণাকে রাজী করানোর ভার নেন মাউন্টব্যাটেন। সিলেট ও উত্তর-পশ্চিম সীমান্তের রেফারেণ্ডাম হবে আশ্বাস পেয়ে জীণাও অবশেষে সায় দেন, কিন্তু গান্ধী সায় দেন না।

ক্যাবিনেট মিশন পরিকল্পনায় গান্ধীজীর আপত্তির হেতু ছিল আসামের ভাগ্য। মাউন্টব্যাটেন পরিকল্পনায় তাঁর আপত্তির কারণ ছিল বাংলার ভাগ্য। বাংলাকে অখণ্ড রাখার জন্যে তিনি বাঙালীদের পরামর্শ দিয়েছিলেন। শরৎচন্দ্র বসু ও শহীদ সুহারাবর্দী সেই লাইনে কাজ করছিলেন। সে চেষ্টা সফল হলে দুটোর জায়গায় তিনটে ডোমিনিয়ন হতো। তাতে কংগ্রেসের আপত্তি। কংগ্রেসের ভিতরে এমন অনেকে ছিলেন যাঁরা ডোমিনিয়ন স্টেটাস পছন্দ করতেন না। এতে ইংরেজদের মনে খটকা ছিল যে মাউন্টব্যাটেনের পরিকল্পনা শেষপর্যন্ত সফল হবে না। ক্যাবিনেট মিশন পরিকল্পনার মতো ভেস্তে যাবে। সেই কথা ভেবে তাঁরা একটি গোপন পরিকল্পনা তৈরি করে রেখেছিলেন, নেতাদের সঙ্গে কথাবার্তা ব্যর্থ হলে সেই গোপন পরিকল্পনা কার্যকর হতো। বড়লাট এক একটা প্রদেশ এক একটা দলের হাতে সঁপে দিয়ে কেন্দ্রীয় সরকার বলতে বিশেষ কিছু টিকে থাকলে অবশিষ্ট ক্ষমতা তার হাতে ছেড়ে দিয়ে রাজ্য-পাট গুটিয়ে নিয়ে প্রস্থান করবেন। তার পরে কাকে কাকে স্বীকৃতি দেওয়া হবে তা ব্রিটিশ সরকার বিবেচনা করবেন।

কাউকে না জানিয়ে মাউন্টব্যাটেন তাঁর পরিকল্পনায় একটি ধারা যোগ করে ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রীর কাছে পাঠিয়ে দিয়েছিলেন। যদি বাংলার হিন্দু মুসলমান একমত হয় তা হলে বাংলা অখণ্ড থাকবে ও একাই একটি রাষ্ট্র হবে। সম্ভবত ওরা একমত হতো না। তবু তার জন্যে একটা ফাঁক রাখা হয়েছিল। বিলেত থেকে প্রধানমন্ত্রীর মঞ্জুরি এলে মাউন্টব্যাটেন প্রকাশ্যে তাঁর পরিকল্পনা ঘোষণা করতেন। ইতিমধ্যে তিনি বিশ্রামের জন্যে সিমলায় যান। নিভৃতে কথাবার্তার জন্যে নেহরুকেও অতিথি হতে আমন্ত্রণ করেন। একদিন খানার পরে ডিনার সময় কী মনে করে দলিলটি নেহরুকে দেখতে দেন। বড়লাটের ধারণা ছিল জীণা আপত্তি করতে পারেন, নেহরু করবেন না।

কিন্তু জবাহরলাল তা পড়ে প্রথমে লাল, তারপরে সবুজ। দলিলটা ফেরত দিয়ে বললেন, "এ জিনিস চলবে না। আমি তো নয়ই, কংগ্রেসও না, ভারতও এটা গ্রহণ করবে না।" এর পরে তিনি বড়লাটকে এক কড়া চিঠি লিখে জানিয়ে দেন যে, ওর

ফল হবে ভারতবর্ষের বলকানীকরণ ও গৃহযুদ্ধ। ব্রিটেনের সঙ্গে সম্পর্কেরও অবনতি হবে।

এতদিন মাউন্টব্যাটেন তাঁর ইংরেজ পারিষদের দ্বারা চালিত হচ্ছিলেন। এবার তাঁর সহায় হন তাঁর ভারতীয় পারিষদ ভি. পি. মেনন। এই ভদ্রলোক অনেকদিন আগেই সর্দার বল্লভভাইকে বাজিয়ে দেখেছিলেন যে, ডোমিনিয়ন স্টেটাসকে ভিত্তি করে পার্টিশন হলে সে পার্টিশনে তিনি রাজী, যদি বাংলা ও পাঞ্জাব সেইসঙ্গে ভাগ হয় ও যদি স্বাধীনতা তার ফলে ত্বরান্বিত হয়। মেনন তাঁর সঙ্গে কথাবার্তার উপর ভিত্তি করে সেই মর্মে একটা পরিকল্পনার খসড়া তৈরি করে রেখেছিলেন। মাউন্টব্যাটেনের নির্দেশে সেটা ভালো করে মুসাবিদা করে সিমলায় পেশ করেন। নেহরুকে সেটা দেখানো হয়। এবার জবাহরলাল সম্মতি দেন।

তখন তারই নাম হয় মাউন্টব্যাটেন প্ল্যান বা দুই স্বতন্ত্র ডোমিনিয়ন প্ল্যান। সঙ্গে সঙ্গে বড়লাট লণ্ডনে উড়ে যান। সঙ্গে সঙ্গে ব্রিটিশ সরকার পূর্বের পরিকল্পনা বাতিল করে পরবর্তী পরিকল্পনা মঞ্জুর করেন। এর পরে নেতাদের একত্র করে তাঁদের সবাইকে দিয়ে গ্রহণ করিয়ে নেবার দায় মাউন্টব্যাটেনের। বিশেষ করে জিন্নাকে দিয়ে।

বেশ বোঝা যায় যে ব্রিটিশ পক্ষের স্বার্থ ছিল কংগ্রেসকে ভুলিয়ে ভালিয়ে ডোমিনিয়ন স্টেটাসে সম্মত করানো। যেই সেটি হাসিল হলো অমনি বাংলা, পাঞ্জাব পার্টিশনে ইংরেজদের যে আপত্তি ছিল তাদের সে আপত্তি দূর হলো। বাকী রইল মুসলিম লীগের বাধা। সে বাধা মাউন্টব্যাটেনই খণ্ডন করলেন। তখন ভারতবর্ষ সেই পিঠে ভাগের মতো দু'ভাগ হলো। ব্যালান্স অভ্ পাওয়ার ঠিক আছে দেখে ব্রিটিশ পার্লামেণ্ট তাড়াতাড়ি স্বাধীনতা বিল পাশ করে দিলেন।

পরাধীন দেশে যার নাম ডিভাইড অ্যাণ্ড রুল স্বাধীন দেশদ্বয়ে তারই নাম ব্যালান্স অভ্ পাওয়ার। দুই দেশ ডোমিনিয়ন না হয়ে এক দেশ ডোমিনিয়ন হলে কিন্তু এ ব্যালান্স বজায় রাখা কঠিন হতো। জবাহরলাল দীর্ঘকাল চেষ্টা করেছিলেন ডোমিনিয়ন স্টেটাস ঠেকাতে। দৃঢ় থাকলেন না এইজন্যে যে সেই গোপনীয় পরিকল্পনা অনুসারে অবিভক্ত পাঞ্জাব বিচ্ছিন্ন হয়ে যাবার আশঙ্কা ছিল।

বাংলা যাতে অবিভক্ত থাকে তার জন্যে মহাত্মার বিশেষ মাথাব্যথা ছিল। কিন্তু উল্টো বুঝলি রাম। আমাদের এক সাবজজ আমাকে শুধান, "আচ্ছা, বাংলার সেই সব বিপ্লবী ছেলেরা গেল কোথায়? গান্ধীকে কেন কেউ গুলি করে না?" আমি তো হতবাক। অতি শান্তশিষ্ট নিরীহ মানুষটির হঠাৎ এমন মতিভ্রম প্রত্যাশা করিনি। তিনি বিষম

কংগ্রেসের হয়ে বলেন, "বাংলা ভাগ না হলে বাঙালী বাঁচবে কী করে?" অর্থাৎ মুসলিম লীগ তো অবাধে শাসন করবে।

ডাইরেক্ট অ্যাকশন শুরু করে মুসলিম লীগ যে হিংসা প্রতিহিংসার পরম্পরা পয়দা করেছিল তার থেকে পরিত্রাণের উপায় হতে পারত মহাত্মার অহিংসা। কিন্তু সেই সঙ্কটকালে তেমন কোনো নির্ভরযোগ্য উপায় হাতের কাছে ছিল না বলে বাঙালী হিন্দু বাংলা ভাগকেই ঠাওরায় নিরুপায়ের উপায়। সে মুহূর্তে হিংসাবাদীরা এগিয়ে এসে অভয় দিতে পারতেন। কিন্তু সেদিন তাঁদের হিংসাও ছিল নিষ্ক্রিয়। আমাদের পরম সৌভাগ্য যে তাঁরা ভ্রাতৃরক্ত পাত করেন নি।

দোসরা জুন রাত বারোটার একটু আগে দিল্লীর বড়লাটভবনে ডেনমার্কের যুবরাজকে বাদ দিয়ে হ্যামলেট নাটকের অভিনয় সারা হয়। ভারত ভাগ্যবিধাতার এমনি নিষ্ঠুর পরিহাস যে সংগ্রামের আটাশ বছর যিনি সকলের পুরোভাগে সন্ধির দিন তিনিই সবার পিছে। মাউন্টব্যাটেনের শঙ্কা ছিল যে গান্ধী সেদিন ইচ্ছা করলে পাকা ঘুঁটি কাঁচিয়ে দিতে পারতেন। তিনি তো পার্টিশনে সায় দেননি।

পাকা ঘুঁটি কাঁচিয়ে দেওয়া শক্ত ছিল না। ছোট্ট একটি "না" বলাই যথেষ্ট। কষ্ট করে অনশনও করতে হতো না। কিন্তু কাঁচিয়ে দিলে তাঁকে শূন্যতার সঙ্গে পাঞ্জা করতে হতো। ইংরেজশূন্যতার সঙ্গে। একটা সুপ্রতিষ্ঠিত রাষ্ট্রের সেনাবাহিনীর যে সশস্ত্র ফোর্স তার সঙ্গে ম্যাচ করবার জন্যে তিনি সৃষ্টি করেছিলেন মাস সিভিল ডিস-ওবিডিয়েন্স নামক নিরস্ত্র ফোর্স। যাকে তিনি বলতেন ম্যাচিং ফোর্স। কিন্তু ইংরেজ যদি উত্তরাধিকারী স্থির করে দিয়ে না যায় তা হলে যে উত্তরাধিকারের যুদ্ধ বেধে উঠবে তার সঙ্গে ম্যাচ করবার মতো নিরস্ত্র ফোর্স কই তাঁর তূণীরে?

উত্তরাধিকারের যুদ্ধের উত্তর গণসত্যাগ্রহ নয়। তিনি বোধহয় কল্পনা করেছিলেন যে মুসলিম লীগকে মসনদে বসিয়ে দিলে সে কংগ্রেসের সঙ্গে সন্ধি করবে। নয়তো লীগ সরকারের অন্যায়ের বিরুদ্ধে একদিন গণসত্যাগ্রহ করা যাবে। কিন্তু তার সাঙ্গোপাঙ্গরা কেউ বিশ্বাস করতেন না যে মসনদে বসলে লীগের স্বভাব শোধরাবে। গুণ্ডাবাজের বিরুদ্ধে সত্যাগ্রহ করে কি সত্যি কোনো ফল হতো? হলে সে ফল নোয়াখালীতেই প্রত্যক্ষ করা যেত।

যে অহিংসার সঙ্গে দেশের লোক এতদিন পরিচিত ছিল সে ছিল কারাবরণের শৌর্য ও দুঃসাহস। কিন্তু গৃহযুদ্ধের দিন লক্ষ লক্ষ নিরীহ নরনারীকে রক্ষা করার জন্যে যে অহিংসার প্রয়োজন হতো সে অহিংসা হাজার হাজার সত্যাগ্রহীর মরণ বরণ। অথচ

মরণব্রতী সত্যাগ্রহীর সংখ্যা সেদিন হাজার হাজার তো নয়ই, শত শতও নয়। এমন কি দশ-বিশটিও নয়। যে দু-চারজনকে পাওয়া গেল তাঁরা ধরিত্রীর লবণ। কিন্তু সেই ক'জনকে নিয়ে গৃহযুদ্ধের সম্মুখীন হওয়া যায় না।

তা ছাড়া গান্ধীজী ছিলেন মুক্তার জহুরী। স্বাধীনতার মুক্তাটি সাচ্চা না হয়ে ঝুটা হলে নিশ্চয়ই তিনি বাধা দিতেন। মুক্তাটি যে ঝুটা নয় সাচ্চা এবিষয়ে তিনি আশ্বস্ত হয়েছিলেন। ভারতবর্ষ এক না হয়ে দুই হলো বলে তিনি সাচ্চা স্বাধীনতাকে ঝুটা বলে প্রত্যাখ্যান করতেন না। তবে অন্তর থেকে মেনে নেওয়া তাঁর পক্ষে অসম্ভব। ভালোবাসার জিনিসকে ভেঙে দু'খানা করা কি সহ্য হয়? বিশেষ করে বাংলাকে?

আসলে স্বাধীনতা ও পার্টিশন ছিল একই মুদ্রার এপিঠ ওপিঠ। একপিঠকে খারিজ করলে অন্যপিঠকেও খারিজ করা হয়। কংগ্রেসের ইচ্ছার বিরুদ্ধে সেটাও তাঁর পক্ষে অসম্ভব।

॥ তিন ॥

মালিকান্দায় যেবার তাঁর সঙ্গে আমি সাক্ষাৎ করেছিলুম সেবার সেই ১৯৪০ সালের গোড়ায় আমার মনে হয়েছিল যে এই নিরস্ত্র মানুষটির শক্তির রিজার্ভ অপরিমেয়। অনাগত দিনের সংগ্রামের জন্যে তিনি সেই রসদ মজুদ রেখেছেন।

বিয়াল্লিশ সালের বলপরীক্ষায় তাঁর রিজার্ভ কি নিঃশেষিত হলো? না, তা নয়। …ক্তির নবীকরণের অফুরন্ত স্বতা ছিল তাঁর অন্তরে। পুনঃ পুনঃ ভরে উঠত ভাণ্ডার। …াল্লিশ সালের শেষে আবার যখন তাঁর সঙ্গে দেখা তখন আবার তিনি যেমনকে …। শ্রান্ত ক্লান্ত ভগ্নোৎসাহ সৈনিকের মতো চেহারা নয় তাঁর। প্রয়োজন হলে …ব রণে ঝাঁপ দিতে পারতেন।

…ে আরেকবার আর এলই না। সংগ্রামের জন্যে অফুরন্ত শক্তির রিজার্ভ …মহাত্মা। কিন্তু কোথায় সেই সংগ্রাম? না, মুসলিম লীগের সঙ্গে …ক নাম গান্ধীর সংগ্রাম নয়। জাতীয় সংগ্রামও নয়। তেমন

কোনো সংগ্রামের দায়িত্ব নিতেন না তিনি। তাঁর ইস্পাতের সমকক্ষ মুসলিম লীগ নয়, ব্রিটিশ সরকার। তাঁর উপযুক্ত প্রতিপক্ষ জীণা নন, সম্রাটের প্রতিনিধি।

তাঁর অনিঃশেষিত সংগ্রামী শক্তি তূণভরা বাণের মতো তূণেই রয়ে গেল। তাঁর সঙ্গে লড়ছে কে যে তিনি লড়বেন? অভিনয়ের মাঝখানে সহসা যবনিকাপাতন। নায়ক প্রতীক্ষা করছেন রঙ্গমঞ্চে প্রতিনায়কের, কিন্তু প্রতিনায়ক সাজঘর থেকে বাড়ি চলে যাবার জন্যে পা বাড়িয়েছেন। নেপথ্যে নায়কের দলবলের সঙ্গে প্রতিনায়কের সন্ধি হয়ে গেছে। প্রতিনায়কও রণক্লান্ত, নায়কের দলবলও তাই।

আমাদের জীবনে সেটা ছিল একটা সত্যের মুহূর্ত। মোমেন্ট অফ ট্রুথ। ইংরেজের সঙ্গে আর নয়, মুসলীম লিগের সঙ্গেই সংগ্রাম আবশ্যক। অথচ গান্ধী তাতে নেতৃত্ব করবেন না, জীণা তাঁর প্রতিনায়ক নন। ইতিহাসে তাঁর ভূমিকা ইংরেজ রাজের প্রতিদ্বন্দ্বীরূপে। আর কোনো ভূমিকায় তাঁকে মানায় না। তা ছাড়া লীগের সঙ্গে লড়তে হলে হাজার হাজার মরণব্রত সত্যাগ্রহী চাই। কোথায় পাবেন তাদের? কারাবরণকারীদের নিয়ে ইংরেজের সঙ্গে সংগ্রাম চলত। লীগের সঙ্গে নয়। গান্ধীজী সেই সত্যের মুহূর্তে অনিচ্ছুক বা অক্ষম। ইচ্ছুক যারা ছিলেন তাঁরা হিংসা দিয়ে হিংসার সঙ্গে মোকাবিলা করতেন, কিন্তু পারতেন কি দেশকে অখণ্ড রাখতে, প্রদেশকে অবিভক্ত রাখতে? না, সে শক্তি তাঁদের ছিল না। সেইজন্যে তাঁরা সন্ধিতে রাজী হলেন।

গান্ধীজীর রিজার্ভ শক্তি সংগ্রামের আরেকবার উপলক্ষ না পেয়ে বিড়ম্বিত হয়। তাঁর নিশানমতে না হয়ে আরো আগে—আরো অনেক আগে—ভূমিষ্ঠ হয় স্বাধীনতা। শ্যামদেশীয় যমজ।

একবার যদি ধরে নিই যে ইংরেজের সঙ্গে আর নয়, লীগের সঙ্গেই সংগ্রামের প্রয়োজন ছিল তা হলে গান্ধীজীর তাতে কোনো ভূমিকা ছিল না, থাকতে পারত না। যাদের ভূমিকা তাঁরা মাউন্টব্যাটেনের মধ্যস্থতায় দেশ ভাগাভাগি ও প্রদেশ ভাগাভাগি করে নিলেন। আর্মিরও একভাগ তাঁদের হাতে এল। দরকার হলে সৈন্যচালনা করবেন।

স্বাধীনতার সার কথা যদি হয় রাষ্ট্রিক ক্ষমতা লাভ তথা সংবিধান প্রণয়নের অ
অধিকার তবে স্বাধীনতার কোথাও কিছু কম পড়ল না। শুধু বাদ গেল জনগণের ঐ
ভারতবর্ষের ঐক্য। পাঞ্জাবের ঐক্য। বাংলার ঐক্য।

আমরা এক নেশন হইলুম না। আমাদের ইতিহাস একধারায়
আমাদের মন ভেঙে গেল। হৃদয় ভেঙে গেল। আমাদের মধ্যে
পাকিস্তানের হিন্দু শিখ আর ভারতের মুসলমান—তাদের কাছে স্বা

হলো। তার চেয়েও মারাত্মক কথা ভবিষ্যতে যদি ভারত পাকিস্তান যুদ্ধযুক্ত হয় তারা হবে সন্দেহভাজন বিভীষণ। গৃহযুদ্ধের মূল কারণ তো থেকেই গেল। হিন্দু মুসলমানের বিরোধ।

এ বিরোধকে মীমাংসায় পরিণত করা ইংরেজ থাকতে সম্ভব ছিল না। ইংরেজ যেতেই কি সম্ভব হলো? যারা মুসলিম রাজকে বা হিন্দু রাজকে যমের মতো ভয় করত তারা ঘরবাড়ি ক্ষেত-খামার ফেলে গেল। লক্ষ লক্ষ লোক মারল ও মরল। এমন হিংসার নজির আমাদের ইতিহাসে মেলে না। মিললে সেই মহাভারতের যুদ্ধে মেলে। তিন সপ্তাহে পাঞ্জাবের মৃত্যুসংখ্যা তিন লক্ষেরও বেশী। আর উৎপাটিতের সংখ্যা তো এক কোটির কাছাকাছি যায়।

পাঞ্জাবে যে এরকম হতে পারে তার আভাস আমি মেদিনীপুরে বসে ১৯৪০ সালে পাই। আমার এক পাঞ্জাবী মুসলিম সহকর্মী ছুটির থেকে ফিরে গল্প করেন যে পাঞ্জাবে একটুকরো লোহা কিনতে পাওয়া যায় না। লোকে সংগ্রহ করছে লড়াইয়ের জন্য। তাদের ধারণা দ্বিতীয় মহাযুদ্ধে ইংরেজের হার হবে। ইংরেজ অপসরণ করবে। তখন পাঞ্জাব কার হবে? শিখদের মতে শিখদের, কারণ তাদের হাত থেকেই তো ইংরেজরা ছিনিয়ে নিয়েছিল, যার ধন সেই পাবে। তেমনি মুসলমানদের মতে মুসলমানদের, কারণ তাদের হাত থেকেই তো শিখরা কেড়ে নিয়েছিল, যার ধন সেই পাবে। তেমনি হিন্দুদের ধারণা হিন্দুদের, কারণ তাদের হাত থেকেই তো মুসলমানরা অপহরণ করেছিল, যার ধন সেই পাবে।

পাঞ্জাব ছেড়ে আর কোথাও লড়তে যেতে কেউ রাজি ছিল না বলে রিক্রুটিং বন্ধ হবার জোগাড়। শেষে একটা কৌশলের আশ্রয় নিতে হয়। শিখদের বলতে হয়, মুসলমানরা কেমন সেয়ানা। যুদ্ধে নাম লিখিয়ে ওরা তালিমও পাবে, হাতিয়ারও পাবে। তারপর তোমাদের পিটিয়ে পাঞ্জাব দখল করবে। তেমনি মুসলমানদের বলতে হয়, দেখছ তো শিখরা কেমন চালাক। যুদ্ধে নাম লেখাচ্ছে তালিমের জন্যে, হাতিয়ারের জন্যে। সময় এলে তোমাদের হটিয়ে পাঞ্জাব ভোগ করবে। তেমনি হিন্দুদের বলতে হয় —যাক গে! সাম্রাজ্যবাদের যা চিরকেলে পলিসি। সবাই জানে, সবাই বোঝে, অথচ সবাই ভোলে। বিস্তর শিখ, বিস্তর মুসলমান, বিস্তর হিন্দু যুদ্ধে যায়। ফিরে এসে গৃহযুদ্ধের জন্যে উদ্যত থাকে। পাঞ্জাবের অনর্থ যে ভয়ঙ্কর হবে এটা আমার কাছে অজানা ছিল না।

গান্ধীজী একবার বলেছিলেন যে ইংরেজরা চলে গেলে বড়জোর পনেরো দিনের অরাজকতা হবে। তা পড়ে আমি লিখছিলুম যে কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধে আঠারো দিনে আঠারো অক্ষৌহিণী সৈন্য ধ্বংস হয়েছিল। সেটাও ভাইয়ে ভাইয়ে লড়াই।

বিয়াল্লিশ সালের সেই প্রবন্ধে আমি আরো লিখেছিলাম, "এতকাল আমরা বলাবলি করেছি তৃতীয় পক্ষই এর থেকে লাভবান হয়েছে ও হচ্ছে, ভবিষ্যতেও হবে, এর মানে এমন নয় যে তৃতীয় পক্ষ চলে গেলেই আমরা ভাইয়ে ভাইয়ে কোলাকুলি করব। বরং তৃতীয় পক্ষের প্রস্থানের পরেই এ সমস্যা চরমে উঠবে, এরূপ আশঙ্কা করবার কারণ যদি না থাকে তা হলেও আশঙ্কা আছে। আশঙ্কাকে এককথায় উড়িয়ে দেওয়া যায় না।"

সেই আশঙ্কা অবশেষে বাস্তবে পরিণত হলো। পার্টিশনের জন্যে হলো এটা যেমন সত্য তেমনি এটাও সত্য—আরো বড় সত্য—যে ব্রিটিশ শক্তির অপসরণের জন্যে হলো। এক শক্তি নিষ্ক্রিয় হয়েছে, তার জায়গায় অপর শক্তি সক্রিয় হয়নি, সেই যে গোধূলিবেলা বা সন্ধিক্ষণ সেটা অরাজকতার অবাধ অবসর। সে সময় মহাত্মা যদি কলকাতায় না থেকে পাঞ্জাবে থাকতেন তা হলে তাঁর নৈতিক প্রভাব হয়তো বা কাজ দিত। যেমন দিল কলকাতায়।

কিন্তু নৈতিক প্রভাবেরও একটা প্রচ্ছন্ন শর্ত ছিল। কলকাতার গবর্নমেণ্ট আন্তরিকতার সঙ্গে তাঁর কাজে সহযোগিতা না করে বাধাবিঘ্ন ঘটালে ফল অন্যরূপ হতো। তেমনি সুহরাবর্দী সাহেবের সাহায্যেরও দরকার ছিল গান্ধীজীর। লাহোরের গবর্নমেণ্ট তো তাঁকে অবাঞ্ছিত বলে অনাদর করতই, রাজনৈতিক নেতারাও যে স্বাগত জানাতেন তা নয়। আর লাহোরই হলো পাঞ্জাবের প্রাণকেন্দ্র। কলকাতার মতো লাহোরে গিয়ে পার্টিশনের পূর্বাহ্ন হতে প্রভাব বিস্তার করা অত্যাবশ্যক ছিল। মহাপুরুষের নৈতিক প্রভাবের শূন্যতাও শাসনতান্ত্রিক শূন্যতার সঙ্গে যুক্ত হয়ে অরাজকতাকে দুর্বার করেছিল।

কলকাতা যেমন বাংলার প্রাণকেন্দ্র, লাহোর যেমন পাঞ্জাবের, দিল্লী তেমনি ভারতবর্ষের। হঠাৎ দিল্লী থেকে ডাক আসে। যে মানুষটির পুব মুখে নোয়াখালী রওনা হবার কথা তাঁকে পশ্চিম মুখে দিল্লী ছুটতে হয়। সেখানে গিয়ে দেখেন সে এক বিচিত্র অরাজকতা। পুলিশ আছে, মিলিটারি আছে, আদালত আছে, জেল আছে, মাথার উপরে নিজেদের সরকার আছে। রাষ্ট্রিক ক্ষমতার কোথাও এতটুকু অকুলান নেই। সে ক্ষমতার শরিক নেই। অপোজিশন নেই। তা সত্ত্বেও সংখ্যালঘু নাগরিকদের ধন প্রাণ মানসম্মান ধর্মস্থান কিছুই নিরাপদ নয়, কোনো কিছুরই মূল্য নেই। তারা গান্ধীজীর মুখের দিকেই তাকিয়ে রয়েছে, আবার এক মিরাক্লের প্রত্যাশায়। কলকাতার মতো।

কিন্তু কলকাতার সঙ্গে দিল্লীর তুলনাই হয় না। কলকাতা ছিল ইংরেজদের রাজধানী, তার আগে আর কারো নয়। দিল্লী ছিল তার আগে মুঘলদের রাজধানী, তুর্কদের রাজধানী। আরো আগে রাজপুতদের রাজধানী, মহাভারত সত্য হলে

কুরুপাণ্ডবের রাজধানী। এখন তার উপর ভারতীয় জাতীয়তাবাদের পতাকা উড়লেও ভিতরে ভিতরে ইতিহাসের বিলুপ্ত অধ্যায়গুলির হিসাবনিকাশ চলছিল। হিন্দুরা ভাবছিল কতকাল পরে যবনের হাতে পরাভবের অবসান হলো। সাতশো বছর যেন একটা দুঃস্বপ্ন। মারাঠারা ভাবছিল কতকাল পরে তৃতীয় পাণিপথের যুদ্ধের পরাভবের অপমান গেল। দু'শো বছর যেন একটা দুর্গ্রহ। মরাঠারাও তো এককালে দিল্লীর হর্তাকর্তা ছিল। মুঘল রাজত্ব যদি পাকিস্তানে ফিরে এসে থাকে মরাঠা আধিপত্য তেমনি হিন্দুস্থানে ও তার রাজধানীতে ফিরে আসতে কতক্ষণ!

আমার এক মন্ত্রী বন্ধু দিল্লী ঘুরে এসে দুঃখ করে বলেন, কংগ্রেস তো নামেই ক্ষমতার আসনে, আসল ক্ষমতা এখন মহারাষ্ট্রীয়দের কী একটা সঙ্ঘের কবলে। সেদিন ওকথা আমার বিশ্বাস হয়নি, কিন্তু একটু একটু করে প্রত্যয় হয় যে দেশের একভাগ মুঘলদের দিলে আরেকভাগ মরাঠা ও শিখদের দিতে হয়। গোলমাল করছিল ওরাই। কেউ শরণার্থী হয়ে, কেউ প্রতিশোধপ্রার্থী হয়ে। ওদের সঙ্গে জুটেছিল সাম্প্রদায়িকতাবাদী বিভিন্ন সংস্থা। এমন কি কংগ্রেসেরও একটা অংশ। হাঁ, ক্যাবিনেটেরও কোনো কোনো সভ্য।

মহাত্মার নীতি ছিল স্বার্থহীন ও নিঃশর্ত। সেকুলার স্টেটের নাগরিকমাত্রেরই সমান মর্যাদা ও অধিকার। সবাইকে সমান প্রোটেকশন দিতে হবে। দিতে রাষ্ট্র বাধ্য। তার জন্যে পাকিস্তানের মুখাপেক্ষী হতে হবে না। পাকিস্তান যদি সেকুলার স্টেট হতো সেও তার সংখ্যালঘু নাগরিকদের সঙ্গে সমান ব্যবহার করত। তা যখন সে নয় তখন তার ব্যবহারে তারতম্য ঘটতে পারে, ঘটলে প্রতিকার করা যেতে পারে, কিন্তু ওখানকার দুর্ব্যবহারের জন্যে এখানকার নিরীহ সংখ্যালঘুদের সাজা পেতে হবে কেন? একের অপরাধে অপরের শাস্তি কি ন্যায় না ধর্ম?

অন্যদিকের বক্তব্য হলো, পাকিস্তান যখন সেকুলার স্টেট নয়, ইসলামিক স্টেট, তখন সে তার সংখ্যালঘুদের সঙ্গে দুর্ব্যবহার করবেই। এর কোনো প্রতিকার নেই। একদিন না একদিন সবাইকে চলে আসতে হবেই। তা হলে এরা এখানে থাকবে কেন? এখানকার সংখ্যালঘুরা। লোকবিনিময় ভিন্ন আর কোন পন্থা নেই। আর লোক-বিনিময় তো অমনিতেই হবে না। চোখের বদলে চোখ, দাঁতের বদলে দাঁত, ঘরের বদলে ঘর, জমির বদলে জমি, গোরুর বদলে গোরু, জরুর বদলে জরু এই হচ্ছে পদ্ধতি। এর নাম বদলা।

অর্থাৎ ভারত হবে কেবলমাত্র হিন্দুদের স্থান। যেমন পাকিস্তান কেবলমাত্র মুসলিমদের স্থান। এ সেই পুরাতন তর্ক, শুধু পরিস্থিতিটা নূতন। কংগ্রেস হবে কেবল হিন্দুদের জন্যে। যেমন মুসলিম লীগ কেবল মুসলিমদের জন্যে। জীণার এই দাবী

কংগ্রেস তখন মেনে নেয়নি, এখন দেখা যাচ্ছে কংগ্রেসেরই একভাগ সেই লাইনে চিন্তা করছেন।

ভারতের কংগ্রেসের মতবাদ জয়ী হবে বলেই এর নাম হিন্দুস্থান না হয়ে হয়েছে ভারত। এ রাষ্ট্র হিন্দুরাষ্ট্র না হয়ে হয়েছে সেকুলার স্টেট। অপরপক্ষে পাকিস্তানে লীগের মতবাদ জয়ী হবে বলেই তার নাম পাকিস্তান, সে ইসলামিক স্টেট। কংগ্রেস ও লীগ যে যার মতবাদে অটল থাকলে পাকিস্তানের সংখ্যালঘুদের জীবন দুর্বহ হবে এটা সত্য, কিন্তু তার জন্যে মহাত্মা নোয়াখালী ফিরে গিয়ে যা হয় করবেন। তাঁর দিল্লীর মিশন সফল হলে তাঁর নোয়াখালীর মিশনও সাফল্যের অভিমুখে যাবে। কিন্তু দিল্লীর মিশন যদি ব্যর্থ হয় তবে তো নোয়াখালীর হাল ছেড়ে দিতেই হয়।

মহাত্মার অপ্রতিশোধ নীতির কদর্থ করা হলো মুসলিমপ্রীতি। ওদের অমন করে তোষণ করা দুর্বলতা। তার চেয়ে ওদের উপর শোধ নাও। হিংসার বদলে হিংসা। পাকিস্তান একমাত্র হিংসার ভাষাই বোঝে। কিন্তু ওরা যে ভারতীয় নাগরিক, যেমন কংগ্রেসী মুসলমান। কে শোনে কার যুক্তি! সব মুসলমানই পাকিস্তানী, সব মুসলমানই পঞ্চমবাহিনী।

ভারতের অন্যায় দিয়ে পাকিস্তানের অন্যায়ের প্রতিকার হবে, মহাত্মা এটা মেনে নিতে পারেন না। তাঁর জীবনের সমস্ত শিক্ষাই লোকে ভুলতে বসেছে, এমন কি তাঁর প্রিয় সহকর্মীদের কেউ কেউ। রাষ্ট্র হাতে পেয়ে তাঁরা রক্ষক হবেন না, ভক্ষক হবেন। প্রাইভেট ভায়োলেন্সকে প্রশ্রয় দেবেন। ভারতীয় জাতীয়তাবাদকেও বিসর্জন দিয়ে তার আসনে বসাবেন হিন্দু সাম্প্রদায়িকতাবাদকে। গান্ধীজী তা হলে কিসের জন্যে বাঁচলেন ? কিসের জন্যে বাঁচবেন ? অনশন-মৃত্যুই শ্রেয়।

কলকাতা থেকে মুর্শিদাবাদ বদলী হয়ে গিয়ে শুনি অনশন ভঙ্গ হয়েছে। কিন্তু দিন দুই যেতে না যেতেই প্রার্থনাসভায় বোমা। প্রহ্লাদের মতো তাঁর পরীক্ষা চলেছে। অনশনে মরণের হাত থেকে বাঁচলেন তো বোমার মুখে পড়লেন। বোমায় মরণের হাত থেকে বাঁচলেন তো—আমি নিশ্চিত ছিলুম যে প্রহ্লাদের মতো গান্ধীজীও বাঁচবেন।

একদিন টেনিস খেলে ফিরছি, বাড়িতে ঢুকতে যাবো, এমন সময় দেখি আমার জন্যে অপেক্ষা করছেন স্থানীয় কংগ্রেস প্রধান। সুধান, "আপনি কি কিছু শুনেছেন ? রেডিওতে নাকি বলেছে—"

"কী বলেছে ?" আমিও তাঁরই মতো অধীর।

"মহাত্মাকে নাকি গুলি করেছে। মহাত্মা নাকি—" তিনি আবেগের সঙ্গে বলেন।

"অসম্ভব।" আমি তাঁর দু'হাত চেপে ধরে বলি, "এ হতেই পারে না।"

ভিতরে ঢুকতেই শুনি রেডিওতে জবাহরলালের বিলাপ। আলো নিবে গেছে।

হা ভগবান!

দেখতে দেখতে সরকার থেকে রেডিওগ্রাম এসে হাজির। ঘটনার সংক্ষিপ্ত বিবরণ। কিন্তু আততায়ীর নাম নেই। তার পরিচয় সে একজন ডাউনকাস্ট্ হিন্দু। ডাউনকাস্ট্ বলতে তো বাংলাদেশও বোঝায়। বাঙালী নয় তো? সারা রাত ছটফট করি। অমন কাজ করতে পারে কে? কার এত হিংসা? মরাঠা বনাম প্রচ্ছন্ন মুঘল, ব্রাহ্মণ বনাম অব্রাহ্মণ গুরু, হিন্দু বনাম ম্লেচ্ছদের বন্ধু, সনাতনী বনাম অন্ত্যজদের সখা, হিংসা বনাম অহিংসার উদ্গাতা, এমনি করে ভাবতে ভাবতে যে নির্ণয়ে উপনীত হই তা পরের দিনকার খবরের সঙ্গে মিলে যায়।

এতদিন যেটা করা উচিত ছিল, করা হয়নি, এখন ঘোড়া চুরি যাবার পর আস্তাবলের দরজায় তালা পড়ে। সাইফার মেসেজের পর সাইফার মেসেজ। অমুক প্রতিষ্ঠান বেআইনী ঘোষিত হলো। অমুক আইন অনুসারে অ্যাকশন নাও। তখন আমি জেলশাসক। ধরপাকড় করে জেলে পাঠাই। কিন্তু রাজ্যিশুদ্ধকে জেলে পুরলেও মহাত্মাকে তো ফিরে পাবার নয়।

পরে শুনি সে রাত্রে নাকি বহরমপুর শহরের অনেকগুলি বাড়িতে মিষ্টান্ন বিতরণ হয়েছিল। শুধু শহরে নয়, মফস্বলেও। খবরটা রটবার সঙ্গে সঙ্গেই। একের কাছে যা পরম শোকাবহ অপরের কাছে তাই পরম সুখকর। হিন্দুর শত্রু নিপাত হয়েছে। হিন্দু এখন নিষ্কণ্টক।

যীশুর ক্রুশিফিকশন দ্বিতীয়বার অভিনীত হলো। আমাদের জীবনে দেখতে হলো সে সকরুণ অথচ গৌরবময় দৃশ্য। আমার পক্ষে জ্বালাময়। আমি নিষ্ফল রোষে জ্বলেছি। আমার মতে এ ঘটনা অনিবার্য ছিল না। ইচ্ছা থাকলে উপায় থাকে। ইচ্ছাটাই বিতর্ক।

তিরিশে জানুয়ারির ঘটনার পরিপূরক হলো পরের দিনের ঘটনা। করাচী বন্দর থেকে জাহাজে উঠল শেষ ব্রিটিশ সৈনিক। দু'শো বছর বাদে রাহুমুক্ত হলো দেশ। মনে হলো প্রথম সত্যাগ্রহীর অপসারণ ও শেষ বিদেশী সৈনিকের অপসরণ একই মুদ্রার এপিঠ ওপিঠ। গান্ধীজী জন্মেছিলেন যে কাজটা করতে সেটিও ফুরোল, তাঁর আয়ুও ফুরোল।

॥ চার ॥

গান্ধীজী তখনো জীবিত। স্বাধীনতার কিছুদিন বাদে একবার দার্জিলিং থেকে ফিরছি। শিলিগুড়িতে আমার কামরায় সহযাত্রী হন এক ইংরেজ মিলিটারি অফিসার। ট্রেন ছাড়ার আগের মুহূর্ত পর্যন্ত তিনি প্ল্যাটফর্মের এক নির্জন প্রান্তে দাঁড়িয়ে গল্প করছিলেন অপর একজন সাহেবের সঙ্গে। যিনি তাঁকে তুলে দিতে এসেছিলেন। শেষের দিকে তাঁরা পাগলের মতো জড়াজড়ি করেন।

লাফ দিয়ে চলন্ত ট্রেনে উঠে ভদ্রলোক আমার সঙ্গে আলাপ জুড়ে দেন। বলেন, "আমাদের দু'জনের ব্যবহার দেখে আপনি হয়তো হকচকিয়ে গেছেন। ও হচ্ছে আমার দাদা। ওর সঙ্গে বিশ বছর বাদে আজকেই প্রথম দেখা। শেষ দেখাও বলতে পারি। আমি ব্রিটিশ আর্মির সঙ্গে এদেশ ছেড়ে চলে যাচ্ছি। দাদা চা বাগানের মালিক। সে থেকে যাচ্ছে।"

এরপরে তিনি যা বলেন তা আমার মনে খোদাই হয়ে আছে।

"দাদার সঙ্গে তর্ক করেই সময় কেটে গেল। দাদা বুঝতে পারছে না কেন আমরা এই সোনার দেশ ছেড়ে চলে যাচ্ছি। কে আমাদের যেতে বাধ্য করছে। আমি ওকে বোঝাই, দাদা, মাইট ইজ রাইট। মাইট ইজ অলওয়েজ রাইট। আমাদের সে মাইট কি আর আছে! কেমন করে থাকি!"

কথাটা ঠিক। ইংরেজদের মাইট ছিল, আর সেই মাইটের ধারক ছিলেন সেই মিলিটারি অফিসার। মাইট কমতে কমতে প্রায় তলানিতে ঠেকেছে, সে দাপট আর নেই, তাই ওঁরা মানে মানে বিদায় নিচ্ছেন।

তেমনি গান্ধীজীর সত্যাগ্রহীরা বলতে পারতেন, রাইট ইজ মাইট। রাইট ইজ অলওয়েজ মাইট। মিলিটারি অফিসারের কথাটার ঠিক উল্টোটি। তার থীসিসের অ্যান্টিথীসিস।

রাইট বাড়তে বাড়তে যেখানে পৌঁছেছে সেখান থেকে হাত বাড়ালেই সিদ্ধি। কিন্তু এমন সব ঘটনা ঘটে গেল যার ফলে ষোল আনা সিদ্ধিলাভ আর হলোই না। তবু বোঝা গেল, রাইট ইজ মাইট। রাইট ইজ অলওয়েজ মাইট।

গান্ধীজীর বাণী সেই মিলিটারি অফিসারের বাণীর সম্পূর্ণ বিপরীত। জোর যার ন্যায় তার নয়। ন্যায় যার জোর তার।

গায়ের জোর বনাম ন্যায়ের জোর এই দুই জোরের সংঘাত ত্রিশ বছর ধরে চলে।

ওটি একটি এপিক সংগ্রাম। ও নিয়ে একদিন এপিক লেখা হবে। কিন্তু যেভাবে সে সংগ্রাম সারা হলো তাকে গ্লোরিয়াস এণ্ডিং বলা শক্ত। মহাত্মার নিজের কথায় ওটা একটা গ্লোরিয়াস স্ট্রাগলের ইনগ্লোরিয়াস এণ্ডিং।

অথচ এমনই নিয়তির বিধান যে পনেরোই অগাস্ট তাঁকে যার থেকে বঞ্চিত করল তিরিশে জানুয়ারি তাই তাঁকে দিল। গ্লোরিয়াস এণ্ডিং। গৌরবময় পরিসমাপ্তি।

ভারতের স্বাধীনতার সংগ্রামের এপিক চরিত্র তাকে একদিন এপিকের বিষয়বস্তু করবে। তাকে নিয়ে এপিক উপন্যাস, এপিক নাটক, এপিক কাব্য রচিত হবে। আর তার মহানায়ক হবেন গান্ধীজী। আধুনিক মহাভারতের আধুনিক যুধিষ্ঠির তথা কৃষ্ণ।

গান্ধীজী বেঁচে থাকতেই আইডিয়াটা আমার মাথায় এসেছিল। তখন কিন্তু খেয়াল হয়নি যে কুরুক্ষেত্রই শেষ কথা নয়, তারপরে আছে যুধিষ্ঠিরের মহাপ্রস্থান ও শ্রীকৃষ্ণের শোচনীয় দেহাবসান। নতুন মহাভারতও সেই পুরাতন ট্র্যাজেডীর রূপান্তর। মন আমার কিছুতেই মেনে নিতে পারেনি যে এপিকের প্রয়োজনেই গান্ধীজীকে অপসৃত হতে হবে। ব্রিটিশ অপসরণ ও গান্ধী অপসারণ যেন একই সূত্রে গাঁথা। যেন মঞ্চ থেকে নায়ক ও প্রতিনায়ক উভয়েরই নিষ্ক্রমণ একই কালে। যেন একজনের প্রস্থানের পর আরেকজনের উপস্থিতি অর্থহীন।

গান্ধী বিয়োগের পর একদিন বহরমপুরের বিশিষ্ট নাগরিক রমণীমোহন সেন মহাশয়ের সঙ্গে কথা হচ্ছিল। রমণীবাবুর মুখে শুনি যে গান্ধীজী একবার তাঁদের বাড়িতে অতিথি হয়েছিলেন। বাড়ির একটি নবজাত শিশুকে দেখে আশীর্বাদ করেন। বলেন, দীর্ঘজীবী হও। দীর্ঘজীবী হও।

তখন রমণীবাবু বলেন, মহাত্মাজী, আপনিও দীর্ঘজীবী হোন। গান্ধীজী তা শুনে গভীর প্রতীতির সঙ্গে বলে ওঠেন—

"Believe me, Ramani Babu, I shall not live a day longer than necessary."

তাই হলো। যেই তাঁর প্রয়োজন ফুরোল অমনি তাঁর পরমায়ু ফুরোল। প্রয়োজনটা আমাদের দিক থেকে নয়, তাঁর দিক থেকে। আমরা তো তাঁকে কোনোদিনই নিষ্প্রয়োজন মনে করতুম না। এই দুর্ভাগা দেশের প্রয়োজনের তালিকাটি তো ছোট নয়। কিন্তু তাঁর দিক থেকে তেমন কোনো প্রয়োজন ছিল না। ইতিহাসের দিক থেকেও। ব্রিটিশ সৈনিক না থাকলে প্রথম সত্যাগ্রহী লড়বেন কার সঙ্গে? ব্রিটিশ রাজের সঙ্গেই অর্ধনগ্ন ফকিরের দ্বন্দ্ব। একের অন্তর্ধান অপরকে অনাবশ্যক করে।

তিনি অন্তরে অন্তরে বুঝতে পেরেছিলেন যে আর তাঁকে কেউ চায় না। 'কেউ' মানে 'কেউ কেউ'। তিনি তাঁদের পথের কাঁটা।

মর্ত্যলোকে মানুষের মুখে যে শেষ কথা শুনে যান সেকথা নাকি কতকটা এইরকম —তোমার অহিংসা দিয়ে কাজ হবে না। তোমার দিন গেছে।

হাঁ, এইটেই ছিল মূল প্রশ্ন যা নিয়ে তাঁর আপনার লোকেদের সঙ্গে তাঁর দ্বন্দ্ব। তাঁর মতে এমন কোনো সমস্যা নেই যার অহিংস সমাধান নেই। খুঁজলেই মেলে। যত্ন করে সন্ধান করো। মিলবেই মিলবে।

তাঁদের মতে অহিংসা কেবল একটি বিশেষ উদ্দেশ্য সাধনের জন্যে। সে উদ্দেশ্য যখন আর নেই সে উপায়ও তখন অকেজো। আর তাঁরা হলেন রাজনীতির লোক। সাধুসন্ত নন যে সবকিছু ফেলে অহিংসাব্রত নেবেন ও তামাম সমস্যার অহিংস সমাধান হাতড়ে বেড়াবেন। তাই যদি হয় তো সৈন্যসামন্ত আছে কী করতে! ক্ষমতার হস্তান্তর কিসের জন্যে?

সত্যাগ্রহ যে কোথায় এক নিমেষে হাওয়া হয়ে গেল সেটাও একটা বিস্ময়। ত্রিশ বছর যা মঞ্চ জুড়ে ছিল তা কি সত্য না মায়া? গান্ধীজী নিজেই বলতে আরম্ভ করেন যে তিনি এতদিন একটা মায়া নিয়ে পথ চলেছিলেন। এখন সে মায়া তাঁর নেই। তিনি মোহমুক্ত।

একথাও বলেন যে, এতদিন তিনি যাকে অহিংসা বলে ভ্রম করেছিলেন সেটা হচ্ছে নিষ্ক্রিয় প্রতিরোধ। দুর্বলের অস্ত্র। দুর্বল যখন বলবান হয়ে ওঠে, অস্ত্র হাতিয়ার হাতে পায় তখন হিংসায় ফেটে পড়ে।

আমার মন গান্ধীজীর এই খেদোক্তিতে সায় দেয়নি। ত্রিশ বছর ধরে কত বড়ো একটা শক্তি কত বড়ো একটা দেশকে ইঞ্জিনের মতো চালিয়ে নিয়ে গেল, কতদূর চালিয়ে নিয়ে গেল। তার সমস্তটাই কি দুর্বলের নিষ্ক্রিয় প্রতিরোধ?

গান্ধীজী অতি সাধারণ মানুষের কাছে অতি অসাধারণ তপোবল প্রত্যাশা করেছিলেন। তাই হতাশ হয়েছিলেন। কিন্তু হিসাব নিলে দেখা যাবে যে সমবেত-ভাবে যা তারা করেছে তা সত্যি অসাধারণ। সমবেত যদি থাকত তা হলে আরো অসাধারণ কীর্তি রাখত। কিন্তু শেষের দিকে তারা দুই ভাগে ভাগ হয়ে গেল আর পরস্পরকে মর্মান্তিক আঘাত করে পর হয়ে গেল। এটা যেন ক্লাইমাক্সের পর অ্যান্টিক্লাইমাক্স।

ট্র্যাজেডী সন্দেহ নেই। কিন্তু অহিংসা তা বলে নিষ্ক্রিয় প্রতিরোধের ছদ্মবেশ হয়ে যায় না। সত্যাগ্রহ তা বলে মায়া হয়ে যায় না। মহাত্মার জীবনের কাজ অকারণ

হয়ে যায় না। বিচার করলে দেখা যাবে যে ভারতের লোকশক্তির উচ্চতা বেড়ে গেছে আর সেটা গান্ধীজীর নেতৃত্বের কল্যাণে। সাম্প্রদায়িক হানাহানির নীচতায় সে উচ্চতার হানি হয়েছে তা ঠিক। আমাদের মাথা হেঁট হয়ে গেছে তা ঠিক। তা সত্ত্বেও আমরা এমন কিছু করেছি যা নিয়ে এপিক লেখা যায়। ত্রিশ বছর তো মিথ্যা নয়।

দক্ষিণ আফ্রিকা থেকে ফিরে গান্ধীজী একবার একস্থানে বলেন, ভারতবর্ষকে স্বাধীন করা একশো বছরের কাজ। তার কমে কি হবে ?

কিন্তু জাগতিক অবস্থা সহায়ক হয়েছিল। তাই তাঁর সেই উক্তির ত্রিশ বত্রিশ বছরের ভিতরেই হলো। জাগতিক অবস্থা বলতে বোঝায় দু'দুটো মহাযুদ্ধ, প্রথম যুদ্ধের মাঝখানে রুশ বিপ্লব, দ্বিতীয় যুদ্ধোত্তোর ব্রিটেনে শ্রমিক শক্তির জয়। ও ছাড়া অর্থনৈতিক মন্দা ও মুদ্রাস্ফীতি। ক্যাপিটালিজমের সঙ্কট। কমিউনিজমের প্রসার।

স্টালিনগ্রাডের পরেই আমরা কেউ কেউ ইউরোপের মানচিত্র নিয়ে বসি ও তার উপর মনের সুখে লাইন টানি। জার্মানীর সবটা তো রাশিয়াকে ছেড়ে দেওয়া যায় না। ইংরেজ মার্কিনও তো লঙ্কাভাগ করবে। জার্মানীর পার্টিশন অবধারিত। পরে যখন তৃতীয় বিশ্বযুদ্ধ অবশ্যম্ভাবী হবে তখন ইংরেজ মার্কিন কিছুটা এগিয়ে থাকবে। তাই যদি হয় তবে ওরা রাশিয়ার সঙ্গে লড়বে, না সেই সঙ্গে ভারতের সঙ্গেও লড়বে ? এক-সঙ্গে ক'টা ফ্রন্ট খোলা যায় ? ভারতীয় ফ্রন্ট গুটিয়ে আনাই হবে ওদের নীতি। যদি ভারতকে তৃতীয় মহাযুদ্ধে মিত্ররূপে পাবার প্রয়োজন থাকে তবে তো স্বাধীন করে দিতে হবেই। অবশ্য স্বাধীন হবার পর ভারত মিত্র হবে কি না অগ্রিম অঙ্গীকার দিতে পারে না। মিত্রতার অঙ্গীকার স্বাধীনতার লক্ষণ নয়। বিনাশর্তে স্বাধীনতাই প্রকৃত স্বাধীনতা।

স্বাধীনতা আসছে, আর খুব বেশী দেরি নেই। তবে ঠিক কত দেরি তা তখনো বুঝতে পারিনি। তখন এইকথাই ভেবেছি যে স্বাধীনতা হলে তো গান্ধীজীর সংগ্রাম শেষ হয়ে যাবে, সংগ্রাম সারা হলে তো সেনাপতিত্বও সারা হবে, তারপরে কি তিনি বাঁচতে চাইবেন ? বাঁচবেন ? আমার তখন থেকেই আশঙ্কা যে স্বাধীনতা যেই আসবে অমনি গান্ধীজীও চলে যাবেন। তাই মনে মনে বলেছি, হোক না স্বাধীনতার দেরি, তা বলে গান্ধীজীকে তো হারাতে পারিনে। বিচার করে দেখিনি যে স্বাধীনতার চেয়ে গান্ধীজীর প্রাণকে আরো বেশী মূল্যবান ভেবেছি। ইংরেজ চলে গেলেই গান্ধীজীও চলে যাবেন এটা আমার কাছে একটা ইনটুইশন ছিল। সেইজন্যে রাতারাতি স্বাধীনতা কামনা করিনি।

জাগতিক অবস্থা সহায়ক হলো। সঙ্গে সঙ্গে আভ্যন্তরিক অবস্থাও। আমি

জানতুম যে দু'দু'বার রুশদেশে বিপ্লব ঘটে গেল মুদ্রাস্ফীতির দরুন। ভারতেও যে হারে মুদ্রাস্ফীতি হয়েছে তার পরিণতি বৈপ্লবিক না হয়ে পারে না। যুদ্ধ যদি দীর্ঘতর হয় তবে যুদ্ধের মাঝখানেই বিপ্লব অর্থাৎ স্বাধীনতা ভূমিষ্ঠ হবে ; গান্ধীজীরও ধারণা ছিল তাই। নানাকারণে যুদ্ধকাল সংক্ষেপিত হয়। তাই যুদ্ধের মাঝখানে বিপ্লব হয় না। বিপ্লবের রূপ নিয়ে স্বাধীনতা আসে না।

দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ ভারতের স্বাধীনতাকে বেশ কিছুদূর এগিয়ে যেতে সাহায্য করলেও অহিংস মতবাদের মহাক্ষতি করে। অহিংসার চেয়ে হিংসার প্রতিপত্তি বহুগুন বেড়ে যায়। হওয়া উচিত ছিল এর বিপরীত। হিংসায় উন্মত্ত পৃথ্বী শ্রান্ত হয়ে ক্লান্ত হয়ে কোথায় শান্তির ধ্যান করবে, না ধ্যান হলো হিংসা দিয়ে হিংসার সঙ্গে মোকাবিলা, রাশিয়ার সঙ্গে মার্কিনের, ব্রিটেনের সঙ্গে ভারতের, মুসলমানের সঙ্গে হিন্দুর। অহিংসা যেন চারদিক থেকে কোণঠাসা হয়। কোণঠাসা হয়ে সেবাগ্রামে নিবদ্ধ।

একেই বলে অদৃষ্টের বিড়ম্বনা। ভারতের স্বাধীনতা কদম কদম এগিয়ে যাচ্ছে, অহিংস মতবাদে দেশের লোকের বিশ্বাস কদম কদম পেছিয়ে পড়ছে। এটা এমন একটা পরিস্থিতি যাতে গান্ধীজী অবিচল, কিন্তু তাঁর সহযাত্রীরা অবিচলিত নন। নেতাকে ত্যাগ করার কথা তাঁরা ভাবতেই পারেন না, কিন্তু নীতিকে আঁকড়ে ধরা তাঁদের পক্ষে দিনকের দিন দুরূহ হয়। ব্রিটিশ সরকার নয়, মুসলিম লীগই দুরূহ করে।

নোয়াখালীর জন্যে আমার মনোবেদনা লক্ষ করে আমার মুসলিম বন্ধুরা বলেন, "ওর জন্যে দায়ী মহাযুদ্ধ। মহাযুদ্ধের হিংসা প্রতিহিংসা মানুষের মনুষ্যত্ব বিগড়ে দিয়েছে। মানুষগুলো কেমন যেন হয়ে গেছে।"

ভারতের মানুষ তো দুনিয়ার বার নয়। মনুষ্যত্ব বিগড়ে যায় দুনিয়া জুড়ে। সর্বত্র ওই একই তত্ত্ব। মাইট ইজ রাইট। মাইট ইজ অলওয়েজ রাইট। আমাদের যা আছে তা আমরা গায়ের জোরে রাখব। আমাদের যা নেই তা আমরা গায়ের জোরে কেড়ে নেব। গায়ের জোরই ন্যায়ের জোর।

আমাদের সৌভাগ্য এই যে পৃথিবীতে অন্তত একজন মানুষ ছিলেন যিনি উন্মত্ত কোলাহলের মাঝখানে স্থির থেকে শান্তস্বরে বলতে পারতেন, রাইট ইজ মাইট। রাইট ইজ অলওয়েজ মাইট। তাঁর মতবাদ থেকে তাঁকে টলাতে পারে এমন সাধ্য কার! তিনি শতবর্ষ পরমায়ু চেয়েছিলেন যাতে ধৈর্য ধরে অপেক্ষা করতে পারেন। আর সকলের পালা যখন শেষ হবে তখন তাঁর পালা আসবে। হিংসার দৌড় যতদূরই হোক না কেন, অহিংসার দৌড় তার চেয়েও বেশী। সেই জন্যে চাই দীর্ঘতর জীবন। হিংসা-বাদীরা হয়তো সাময়িকভাবে জিতবে। কিন্তু আখেরে জিতবে প্রেম মৈত্রী অহিংসা।

আমরাও মহাত্মার শতায়ু কামনা করে অহিংসার আরো মহৎ পরীক্ষার জন্যে মনে মনে তৈরী হচ্ছিলুম। পরীক্ষা যদিও একজনকে কেন্দ্র করে তবু তার পরিধি সারা দেশ ও সারা বিশ্ব। মানুষের আত্মা কি সাড়া না দিয়ে পারে? আসবে, সেদিন আসবে। আমাদেরও চাই দীর্ঘতর জীবন। তার মানে অসীম ধৈর্য।

শেষ পর্যন্ত কী দেখা গেল? দেখা গেল অহিংসা অপেক্ষা করতে পারে, কিন্তু স্বাধীনতা অপেক্ষা করতে পারে না। স্বাধীনতা অপেক্ষা করতে পারে, কিন্তু গৃহযুদ্ধ অপেক্ষা করতে পারে না। গৃহযুদ্ধের পদধ্বনি শুনতে পেয়ে ব্রিটিশ অপসরণ ত্বরান্বিত হয়। অকালে ভূমিষ্ঠ হয় রক্তাক্ত যমজ শিশু। ক্রন্দনমুখর। রক্ত আর অশ্রু মুছে দেওয়াই হয় মহাত্মার মহত্তর কৃত্য। কৃত্যের মধ্যপথে নিধন।

হৃদয়টা হায় হায় করে ওঠে। সান্ত্বনা মানে না। বলে, এরকম তো কথা ছিল না। আমরা তো কেউ কখনো এরকমটা ভাবিনি। কেন তবে এরকম হলো?

না ভেবেছি তা নয়। ভেবেছি বইকি। মাঝে মাঝে ভেবেছি যীশুকে ইহুদীরা সহ্য করতে পারল না, ক্রুশে বিঁধে মারল। গান্ধী বেঁচে আছেন কী করে? তা হলে কি তিনি যীশুর মতো মহান নন?

আমার অনেক আগে মিসেস বেসান্ট ভেবে রেখেছিলেন। দক্ষিণ আফ্রিকা থেকে ফেরার পর গান্ধী যখন তাঁর সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে যান তখন প্রথম দর্শনেই মিসেস বেসান্ট বলেন, যীশুর মতো চোখ। এঁর পরিণামও কি যীশুর মতোই হবে?

স্বাধীনতা আর অহিংসা দুই হাতে দুটি বর নিয়ে আসেন গান্ধীজী। আমরা স্বাধীনতাকেই চেয়েছি, অহিংসাকে চাইনি। স্বাধীনতার খাতিরে যেটুকু গিলতে পেরেছি গিলেছি। গিলে হজম করতে পারিনি। স্বাধীনতার দিক থেকে তাঁর যতটা মূল্য ততটা দিয়েছি, তার বেশী যদি দিয়ে থাকি তবে মহাত্মা বলে ভক্তি। কিন্তু তাঁর মতবাদ আমাদের আন্তরিক আনুগত্য পায়নি। সেটা তিনি জানতেন। কিন্তু তাঁর উত্তর ছিল অন্তহীন অপেক্ষা।

তা সত্ত্বেও বলতে হবে যে অহিংসার পরীক্ষায় দেশের লোক বার বার সাড়া দিয়েছে ও তেমন সাড়া হিংসার পরীক্ষায় দেয়নি। আমাদের ভবিষ্যতের বাদশাহী সড়ক গান্ধীজীরই হাতে গড়া। সে সড়ক কোনোদিনই সরু গলি হবে না। জনগণকে নিয়ে যদি কোনোদিন জয়যাত্রায় যেতে হয় তো সে-ছাড়া আর কোনো সড়কে কুলোবে না। যাদের দরকার তাদের জন্য থাকবে হিংসার রেল লাইন। তাতে আর ক'জনের যোগদান সম্ভব হবে! গতিবেগ হয়তো খরগোশের মতো হবে, কিন্তু কচ্ছপেরই তো জিৎ হলো উপকথায়। যীশুখ্রীষ্ট বলে গেছেন,

"The meek shall inherit the earth."

জনগণের ধরণীর উপর উত্তরাধিকার। যদি তাঁরা নম্র হয়, অথচ নত না হয়। গান্ধীজী তাঁর বিভিন্ন পরীক্ষায় শিখিয়ে দিয়ে গেছেন কেমন করে।

॥ পাঁচ ॥

গান্ধীনেতৃত্বের অস্তাচলের ধারে এসে পূর্বাচলের পানে তাকাই। মনে পড়ে ওয়ার্ডস্‌ওয়ার্থের কবিতার সেই দুটি বিখ্যাত পঙ্‌ক্তি।

"Bliss was it in that dawn to be alive,
But to be young was very heaven !"

ওয়ার্ডস্‌ওয়ার্থের জীবনে যেমন ফরাসী বিপ্লব আমার জীবনে তেমনি অসহযোগ আন্দোলন। প্রায় অর্ধশতক পরেও তার উন্মাদনা আমি এখনো অনুভব করি। তেমন দিন জাতির জীবনে একবার মাত্র আসে, চিরদিন প্রভাব রেখে যায়।

ফরাসী বিপ্লবও তো শেষ পর্যন্ত ব্যর্থ হয়। অথচ তার মতো সার্থক আর কোন ঘটনা? এখনো বিশ্বমানবের চিত্তে তার স্বপ্ন জেগে আছে।

তেমনি অসহযোগের দিনগুলির স্বপ্ন।

গান্ধীজী হঠাৎ কোন্‌খান থেকে এসে একটা সিচুয়েশন সৃষ্টি করেন। তার কমে ইংরেজ রাজের চৈতন্য হতো না। এবার তাঁরা জানলেন যে সব হাতিয়ার বাজেয়াপ্ত করলেও একটি হাতিয়ার থেকে যায়, সেটির নাম হাতিয়ার না থাকা। তার থেকে কোনো মানুষকে বঞ্চিত করা যায় না।

ভারতের জনগণ সেই প্রথম ইতিহাসের মঞ্চে প্রবেশ করে। তাদের ডাক দিয়ে নিয়ে আসেন এক অসাধারণ তেজস্বী নেতা। তাঁর হাতে একটিমাত্র অস্ত্র। তার নাম নিরস্ত্রতা। সেই অসামান্য অস্ত্রই তিনি জনগণের হাতে ধরিয়ে দেন।

আবেদন নিবেদন করে যেটুকু পাবার সেটুকু পাওয়া গেছে, তার বেশী পাওয়া যাবে না। স্বাধীনতা বা আত্মনিয়ন্ত্রণ সে পথে আসবে না। সুতরাং দেশবাসী তখন অন্য কোনো পথের সন্ধান করছিল। সে পথ কি তবে সশস্ত্র বিদ্রোহের বা বিপ্লবের পথ? মুষ্টিমেয় কয়েকজনের পথ সেইরূপ হলেও লক্ষ লক্ষ পথিকের জন্যে সে পথ নয়।

এদেশের সাধারণ লোকের হাতে রাইফেল বা রিভলবার ধরিয়ে দিলেও তারা সাহস করে ধরবে না। সেই সাহসই তাদের নেই। ধরবে যারা তারা অল্পসংখ্যক শিক্ষিত

তরুণ অগ্রধরের সন্তান। তাদের জীবনদর্শন রোমান্টিক। সেই অসমসাহসিকদের উপর ছেড়ে দিলে তারাই দেশকে স্বাধীন করে দেবে এ বিশ্বাস খুব বেশী লোকের ছিল না। আর থাকলেও তারা চাচার মতো আপনা বাঁচিয়ে নিরাপদ দূরত্বে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে দেখছিল। অংশ নিচ্ছিল না। ইতিহাসের মঞ্চে তাদের টেনে আনা অসম্ভব মনে হচ্ছিল।

তবে সে চেষ্টা যে একেবারেই হয়নি তা নয়। স্বদেশী আন্দোলনের সময় বিদেশী বর্জন বলে আরো একটা পথ আবিষ্কৃত হয়েছিল। সে পথে বেশ কিছুদূর অগ্রসর হওয়া গেছল। কিন্তু যে জিনিসটিকে বর্জন করবে সে জিনিসটি যদি অত্যাবশ্যক হয়ে থাকে তবে সেটির অভাব পূরণ করবে কি দিয়ে? দেশে কি সেটি তৈরি হয়? তৈরি না হলে তৈরি করে নিতে কি তোমরা তৈরি?

বর্জন যে ফল হলো না তার কারণ তার সঙ্গে গঠনের আয়োজন ছিল না। যারা গড়বে না, শুধু ভাঙবে, তাদের সঙ্গে জনগণ বেশীদূর যায় না। তাই বর্জন আন্দোলন ক্রমে স্তিমিত হয়ে আসে। দক্ষিণ আফ্রিকায় থাকতে গান্ধীজী এটা লক্ষ করেছিলেন। দেশে ফিরে এসে প্রথমেই মনোযোগ দেন গঠনের উপর। দেশ যাতে স্বাবলম্বী হতে পারে। প্রথম থেকেই গঠনের উপর ঝোঁক তাঁকে ধাপে ধাপে নিয়ে যায় খাদির অভিমুখে, চরকার অভিমুখে। একমাত্র সেই ভাবেই দেশের কোটি কোটি দীনহীন মানুষ স্বাবলম্বী হতে পারে। নয়তো যা হবে তা কয়েকটা শহরের কয়েকজন মিল মালিকের স্বাবলম্বন।

স্বাধীনতার সঙ্গে স্বাবলম্বনের সম্পর্ক সব দেশেই স্বীকৃত হয়েছে। ওটা এমন কিছু নতুন কথা নয়। স্বদেশী আন্দোলনের তত্ত্বও ছিল দেশকে সর্বতোভাবে স্বাবলম্বী করে তোলা। কিন্তু ঝোঁকটা পড়েছিল বর্জনের উপরে। তা দেখে রবীন্দ্রনাথ ক্ষুব্ধ হয়েছিলেন। তখন থেকে তাঁর মনে যে বিরূপভাব সঞ্চিত হয়েছিল তা অমূলক ছিল না। তিনি যখন শুনলেন যে গান্ধীজীও বর্জন প্রচার করছেন তখন তিনি ধরে নিলেন যে গান্ধীজীও গঠন না করে বর্জনের পক্ষপাতী। বর্জন কথাটাই রবীন্দ্রনাথের কানে জাতিবৈরসূচক অথবা একটা উৎপাত। কারণ তাঁর স্বদেশীযুগের অভিজ্ঞতা সেইরূপ ছিল।

কিন্তু প্রকৃত সত্য এই যে গান্ধীজী দেশকে দিয়ে বিপুল আকারে গঠনকর্ম করিয়ে নিতে চেয়েছিলেন ও বর্জনের সঙ্গে সঙ্গে চলেছিল গঠনকর্মের দেশব্যাপী উদ্যোগ। রবীন্দ্রনাথের মনের ইচ্ছা বর্জন কথাটি আদৌ উচ্চারণ না করে গঠন কথাটিকে একমাত্র উচ্চার্য শব্দ করা। গান্ধীজীর মনের ইচ্ছা যে তার থেকে ভিন্ন তা নয়। কিন্তু বর্জন কথাটি আদৌ উচ্চারণ না করলে বিদেশী প্রভুশক্তির সঙ্গে সংগ্রাম হয় না। আর সংগ্রাম না হলে স্বাধীনতা হয় না। তবে গান্ধীজীও স্বীকার করতেন যে নিছক গঠনমূলক কর্মের দ্বারাও দেশ স্বাধীন হতে পারে। রবীন্দ্রনাথের বাণীও কি তাই নয়?

তারপর অসহযোগ কথাটিও রবীন্দ্রনাথের অসহ্য। তার পেছনে রয়েছে কেবল শাসকদের বা শোষকদের সঙ্গে নয় জ্ঞানবিজ্ঞান শিল্পকলার পাশ্চাত্য তথা আধুনিক প্রবাহের সঙ্গে একপ্রকার অসহযোগী মনোভাব। সেটা তিনি কিছুতেই সমর্থন করতে পারেন না। না করাই উচিত। বিদেশী কাপড় বর্জন করলে দেশে একদিন স্বদেশী কাপড় বোনা হবে, তা সে যতই মোটা হোক, কিন্তু জ্ঞানবিজ্ঞানের দীপাবলী নিবিয়ে দিলে যা হবে তা অমাবস্যার অন্ধকার। মধ্যযুগ নেমে আসবে। শাসক ইংরেজ, শোষক ইংরেজের সঙ্গে সংগ্রাম করতে চাও করো। কিন্তু শিক্ষাদীক্ষায় পাশ্চাত্য সংস্পর্শ থাকবে না এটা সংস্কৃতির দিক থেকে অঙ্গহানি।

আমাদের সংস্কৃতি তিনটি স্রোতের ত্রিবেণীসঙ্গম। প্রাচীন হিন্দু, মধ্যযুগীয় মুসলিম ও আধুনিক পাশ্চাত্য। এর থেকে কোনো একটিকে বাদ দেওয়া যায় না। সরকারী বিদ্যালয় থেকে বিদ্যার্থীদের সরিয়ে নিয়ে যেতে চাও, বেশ। কিন্তু যেখানে নিয়ে যাচ্ছ সেখানেও তাদের ত্রিবেণীসঙ্গমে অবগাহন করাও। সাধারণত এইসব জাতীয় বিদ্যালয় ছিল সরকারী বিদ্যালয়েরই পরিবর্তিত সংস্করণ। প্রাচীন বা মধ্যযুগের মতো নয়। নতুনের মধ্যে ছিল ইংরেজীর বদলে বাংলা হিন্দী প্রভৃতি ভারতীয় ভাষার মাধ্যম। পাঠ্যতালিকায় হয়তো ছিল এমন কোনো বই যা সরকারী বিদ্যালয়ে পড়ানো হয় না, কারণ রাজদ্রোহ-গন্ধী। বর্জন এক্ষেত্রে গঠনের মৌলিকতাবিহীন। তাই জাতীয় শিক্ষা অবশেষে চরকা খাদিকেই অবলম্বন করে গ্রামমুখীন হয়। সংস্কৃতির প্রবাহ সে খাতে বয় না।

আদালত বর্জনের উদ্দেশ্য ছিল গাঁয়ে গাঁয়ে পঞ্চায়েৎ গঠন। সেখানেই দেশের লোক অন্যায়ের প্রতিকার খুঁজবে ও পাবে। আদালতে যারা সত্যকথা বলে না পঞ্চায়েতে বলতে বাধ্য হবে। গ্রামের লোক তাদের সহজাত প্রতিভার দ্বারা বুঝতে পারবেন কোন্‌টা সত্য কোন্‌টা মিথ্যা। কারাগারে না পাঠিয়েও দণ্ড দেওয়া যায় আর তাতেই মানুষের মনুষ্যত্ব থাকে। রাজদ্বারে যে দণ্ডদান হয় তা মনুষ্যত্ববিরোধী। আর ইংরেজের আদালতে তো দুর্নীতির বেসাতি। সেখানে ন্যায় বলতে কতটুকু মেলে? একরাশ উকিল মোক্তার ও টাউট পোষাই কি সভ্যতা? আর হাকিমদের চুলচেরা বিচার যতই মূল্যবান হোক ভারতের সাধারণ লোকের কাছে তার কতটুকু মূল্য?

বহু ইংরেজ অফিসারও ভারতবর্ষে ব্রিটিশ আদর্শের আইন আদালত প্রবর্তনের মহিমা বুঝতেন না। ভারতের লোকের জন্যে চাই কাজীর বিচার বা রাফ জাসটিস। তাঁদের ইচ্ছার উপর ছেড়ে দিলে হাইকোর্ট লোয়ার কোর্ট ইত্যাদি কিছুই গড়ে উঠত না। আমরাও যে তার বদলে পঞ্চায়েৎ গড়ে তুলতুম তাও নয়। আমাদের সম্বল হতো মরাঠা ও মুঘল বিচার পদ্ধতি। ব্রিটিশ রাজত্ব আমাদের রাষ্ট্রে একটি আধুনিক অঙ্গ

যোজনা করে। তার নাম জুডিসিয়ারি। তাকে ভেঙে ফেললেই যে তার বদলে নির্ভরযোগ্য আর এক জুডিসিয়ারি লাভ হবে তা নয়। যেটা হবে সেটা হয়তো মোটা ভাত মোটা কাপড়ের মতো মোটামুটি সুবিচার। কিন্তু দেখা গেল শিক্ষিত অশিক্ষিত কেউ সেটা চায় না। তারা চায় সূক্ষ্ম বিচার।

ব্যয়বহুল দুর্নীতিকলুষিত হলেও ব্রিটিশ আদর্শের জুডিসিয়ারি দেশের লোকের বহু শতাব্দীর অভাব পূরণ করেছিল। সেইজন্যে তারই উপর তাদের আস্থা বেশী। এসব বিষয়ে লোকে স্বদেশী বিদেশীর বিতর্ক বোঝে না। বিদেশী পদ্ধতি যদি স্বদেশী পদ্ধতির চেয়ে উন্নত হয়ে থাকে তবে উন্নততর বলে বিদেশীকেই বরণ করে। বিদেশী কাপড় সম্বন্ধে যাদের আপত্তি বিদেশী বিচার সম্বন্ধে তাদের আপত্তি থাকলে অসহযোগ নিশ্চয়ই জোর পেত। কিন্তু দেখা গেল আদালত বর্জন করে সরকারের চেয়ে সাধারণেরই অসুবিধে হলো বেশী। পঞ্চায়েৎ দিয়ে বিচারের অভাব মিটল না।

ইংরেজ রাজত্বে যেমন আমাদের রাষ্ট্রে আধুনিক আদর্শের জুডিসিয়ারি সংযোজিত হয় তেমনি হয় লেজিস্‌লেচার। এ জিনিস এর আগে এদেশে ছিল না। ব্রিটেন থেকেই আসে। এটা প্রবর্তন করতে ইংরেজদের যে বিশেষ ত্বরা ছিল তা নয়। তারা দীর্ঘ-সূত্রিতার চরম করেছে। কারণ তাদের দেশের ইতিহাসে পার্লামেণ্ট ক্রমে ক্রমে প্রবল হয়, রাজা ক্রমে ক্রমে হীনবল হন। ভারতের মাটিতে পার্লামেণ্ট প্রবর্তন করলে ইতিহাসেরই পুনরাবৃত্তি হবে। ভারতীয় লোকপ্রতিনিধিরা ক্ষমতাশীল হবেন, ইংরেজ শাসককুল সাক্ষীগোপাল হবেন। সাধে কি কেউ সাক্ষীগোপাল হয়?

তা ছাড়া ইংরেজদের ধারণা ছিল যে তাদের পার্লামেণ্টারি সীস্টেম তাদেরই বিশেষত্ব। ব্রিটেনের বাইরে প্রবর্তন করা নিষ্ফল। সে সীস্টেম চলে একজোড়া চাকার উপর গড়াতে গড়াতে। একটি সরকার পক্ষ। অপরটি বিরোধী পক্ষ। দুই পক্ষের মধ্যে একটা বোঝাপড়া থাকে যে সাধারণ নির্বাচনে বেশীর ভাগ ভোট যার ভাগ্যে পড়বে সেই শাসনভার নেবে। অপর পক্ষ নেবে বিরোধিতার ভার। বিরোধিতার ভারও দায়িত্বপূর্ণ। কারণ বিরোধীরাও একদিন সরকার গঠন করার হকদার হবে। পার্লামেণ্টারি কনভেনশন না মানলে পার্লামেণ্টারি ব্যবস্থা অচল। তেমন কনভেনশন তো আইন করে প্রবর্তন করা যায় না। ভারতীয়রা হাজার যোগ্য হোক সেসব কনভেনশন পাবে কোথায়! নিজেদের ভিতর থেকে বিবর্তন করা কি এত সহজ? অতএব লেজিস্‌লেচার প্রবর্তন করা বৃথা।

ঠিক ওই জিনিসটি দাবী করেই কংগ্রেসের সূচনা। কংগ্রেসের কাম্য ছিল ব্রিটিশ পার্লামেণ্টের একটি ভারতীয় সংস্করণ। বিদেশী বলে তাতে তার অরুচি ছিল না।

স্বদেশী বলতে যা ছিল তা পার্লামেন্টের বিকল্প নয়। তা লেজিস্লেচারই নয়। যে দেশে যেটা নেই সেদেশে সেটা চাওয়া কি দেশীয়ভাবিরুদ্ধ? অসহযোগ আন্দোলনের পূর্বে কোনো ভারতীয় জাতীয়তাবাদী তেমন কথা ভাবেননি। তাঁরা ইংরেজের কাছে ইংরেজের যা শ্রেষ্ঠ তাই বরং চেয়েছেন। পার্লামেণ্টারি শাসন।

ইংরেজদের মধ্যে বরাবরই একদল সহানুভূতিশীল ছিলেন, তাঁরা ভারতের আশা আকাঙ্ক্ষা পূর্ণ করতে প্রতিশ্রুত। গায়ের জোরে নয়, বন্ধুভাব ডোরে ভারত ও ব্রিটেন পরস্পরের সঙ্গে মিলিত থাকবে এই ছিল তাঁদের আদর্শ। তাঁদেরই একজনের উদ্যোগে ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেসের প্রতিষ্ঠা। প্রায় পঁচিশ বছর ধরে হিউম ছিলেন কংগ্রেসের জেনারেল সেক্রেটারি। জাতীয়তাবাদের সঙ্গে হাত মেলানোর জন্যে আরও অনেক ইংরেজ হাত বাড়িয়ে দিয়েছিলেন, হাত না ধরে হাত ছাড়িয়ে নেওয়া দাদাভাই, সুরেন্দ্রনাথ, ফিরোজশা, গোখলে, মালবীয় প্রমুখ জাতীয়তাবাদী নেতাদের সাধ্যাতীত ছিল। গান্ধীজীও কি হাত ছাড়িয়ে নিতেন? নিতে হলো, না নিয়ে উপায় ছিল না।

সহযোগিতা সমানে সমানে হতে পারে, স্বাধীনে স্বাধীনে হতে পারে, কিন্তু ইংলণ্ড যে এতবড় একটা মহাযুদ্ধের পরেও ভারতকে সমান ও স্বাধীন বলে স্বীকার করতে রাজী নয়। মহাযুদ্ধে ভারত কি কম রক্ত, কম অন্ন, কম অর্থ, কম উপকরণ দান করেছিল! তার সৈনিকরা প্রাণ না দিলে তুর্কদের হটানো যেত না। জার্মানদের হারানো আরো কঠিন হতো। অথচ কাজের বেলায় কাজী যারা কাজ ফুরোলেই পাজী তারা। তাদের উপর রাওলাট আইন চাপানো হলো। তাদের প্রতিবাদ গ্রাহ্য হলো না।

রাওলাট আইনের বিরুদ্ধে সত্যাগ্রহ করার সময়ও গান্ধীজী ব্রিটেনের সদিচ্ছায় বিশ্বাস করতেন। সে বিশ্বাস একটু একটু করে টলে। প্রথম ধাক্কা জালিয়ানওয়ালাবাগ হত্যাকাণ্ড। বুকে হাঁটার হুকুম। আনুষঙ্গিক বিবিধ প্রতিশোধ। কারণ কয়েকজন ইংরেজ পুরুষকে খুন করা হয়েছিল ও ইংরেজ নারীকে অপমান করা হয়েছিল। ইংরেজদের মনে আতঙ্ক জন্মেছিল যে সিপাহীবিদ্রোহ আবার বাধতে যাচ্ছে, তখন আর ইংরেজ পুরুষ বা নারী কেউ নিরাপদ নয়। কাজেই তাদের একজনের গায়ে হাত দিয়েছ কি সর্বনাশ করেছ। তারাও সর্বনাশ করবে।

দ্বিতীয় ধাক্কা মুসলমানদের মনে লাগে, তাই হিসাবে গান্ধীজীরও মনে। যুদ্ধের পরে যে শান্তি বৈঠক বসে তাতে তুরস্কের সুলতানের ক্ষমতা খর্ব করা হয়, খালিফ হিসাবে তিনি দুনিয়ার মুসলমানদের ধর্মস্থানগুলির উপর কর্তৃত্বের অধিকার থেকে বঞ্চিত হন। ভারতীয় মুসলমান বন্ধুরা গান্ধীজীকে নিমন্ত্রণ করে নিয়ে গিয়ে তাঁর পরামর্শ চান। তখন তিনি তাঁদের বলেন যে আবেদন নিবেদন করে যদি কোনো ফল না হয় তবে

মুসলমানদের কর্তব্য হবে অসহযোগ। অসহযোগ কথাটি আচমকা তাঁর মুখ দিয়ে বেরিয়ে যায়। তারপর তিনি সেটি ভুলে যান। পরে আবার মনে পড়ে যখন আবেদন নিবেদন সত্যি সত্যিই ব্যর্থ হয়। ইতিমধ্যে পাঞ্জাব ট্র্যাজেডী নিয়ে দেশময় ঝড় উঠেছিল। প্রথম অসহযোগী আর কেউ নয়, নাইট উপাধিত্যাগী রবীন্দ্রনাথ।

আমরা যে সবাই মিলে এক নেশন তার প্রমাণ পাঞ্জাবীদের লাঞ্ছনায় সকলেরই লাঞ্ছনাবোধ আর মুসলমানদের মর্মবেদনায় সকলেরই সমবেদনা। তবে এ দুটির ভিতরে একটু তফাৎ ছিল। খেলাফৎ বহুদূরের ব্যাপার। খেলাফৎ নিয়ে ব্যথা পাওয়া তাদের পক্ষেই স্বাভাবিক যারা তার সঙ্গে প্রত্যক্ষভাবে জড়িত। সাধারণ ভারতবাসীর পক্ষে সেটা অবাস্তব। তাই মুসলমান ভিন্ন আর কেউ সে ইস্যুতে অসহযোগ করতে এগিয়ে আসতেন না বড়ো। গান্ধীজীর কথাতেও না। তেমনি পাঞ্জাবের ইস্যুতেও আসমুদ্র হিমাচল এককথায় অসহযোগ করত না। এ ছাড়া আরো একটা ইস্যুর দরকার ছিল। তার নাম স্বরাজ।

মণ্টেগু চেমসফোর্ড শাসন সংস্কার সরাসরি প্রত্যাখ্যান করবার মতো ছিল না। গান্ধীজীও গোড়ায় তার বিরুদ্ধতা করেননি। কিন্তু ধীরে ধীরে তাঁর প্রত্যয় হয় যে মহাযুদ্ধের দুঃখদুর্দশার ফলে দেশ যেমন আগুন হয়ে রয়েছে হিংসাপন্থীরাই তার সুযোগ নেবে ও সাম্রাজ্যবাদীদের প্রতিশোধ ডেকে আনবে। অহিংসাপন্থীরা যদি হাত গুটিয়ে বসে থাকে তবে কোনোদিনই সুযোগ পাবে না। মুসলমানরা যখন অসহযোগ করতে উদ্বাহু, পাঞ্জাবীরাও প্রস্তুত, তখন আর সবাইকে স্বরাজের নামে ডাক দিলে তারাও সাড়া দেবে। কেননা স্বরাজের জন্যে অভূতপূর্ব এক আকুলতা জেগেছিল। ধাপে ধাপে শাসন সংস্কার, কে জানে ক'পুরুষ বাদে স্বরাজ, এটা তারা মেনে নিতে নারাজ যাদের রক্ত গরম। সন্ত্রাসবাদ যাদের বলা হতো তারা অস্ত্রশস্ত্রের জন্য বিশ্বময় জাল পেতেছিল। কোথায় কানাডা, কোথায় জার্মানী, কোথায় জাপান ও ইন্দোনেশিয়া সর্বত্র তাদের কার্যকলাপ সম্প্রসারিত ছিল।

একহাতে নরমপন্থীদের সরিয়ে আরেক হাতে সন্ত্রাসবাদীদের ঠেকিয়ে মাঝখানে এসে দাঁড়ালেন গান্ধীজী। তাঁর পেছনে খেলাফতী মুসলমানদের জমায়েৎ। আর যাদের কথা কেউ কোনোদিন ভাবেনি সেই অগুন্তি ইতর জনগণ। শূদ্রকে এতদিন ক্ষুদ্র বলেই অনুকম্পা ও অসম্মান করা হতো। এখন বোঝা গেল স্বরাজের জন্যে লড়তে হলে বিপুল সংখ্যকের যোগদান অত্যাবশ্যক। সুতরাং মুচি মেথর চাষার কামার এরাও যোদ্ধা।

যুদ্ধের প্রয়োজন সব দেশেই শূদ্রের মর্যাদা বৃদ্ধি করেছে। নারীর ও। গান্ধী পরিচালিত অহিংস সংগ্রামের বেলাও তাই ঘটে। দেশ যেন রুদ্ধশ্বাস হয়ে সংগ্রামের প্রতীক্ষায় ছিল।

অসাধারণ কুশলতার সঙ্গে গান্ধীজী সেই সংগ্রামের সূত্রপাত করেন। তার জন্যে একটা প্লাটফর্মের দরকার ছিল। আশ্চর্যের বিষয় রাতারাতি ভোল ফিরিয়ে কংগ্রেসই হয় সেই প্লাটফর্ম। সংগ্রামের তীব্রতা তাকে ক্রমে ক্রমে একটা পার্টির চেহারা দেয়।

অসহযোগ আপাতত কার্যক্রম হলেও সিভিল ডিসওবিডিয়েন্সই ছিল লক্ষ্য। লক্ষ লক্ষ লোক আন্দোলনে ঝাঁপিয়ে পড়ে তারই আকর্ষণে ও মহাত্মার সম্মোহনে।

॥ ছয় ॥

অহিংসার সর্বশক্তিমত্তার উপর গান্ধীজীর আন্তরিক বিশ্বাস ছিল পর্বতের মতো অটল। কিন্তু তাঁর অনুসরণকারীদের সম্বন্ধে সেকথা বলা চলে না। তারা আশা করেছিল হাতে হাতে ফল। ফল যখন ফলল না তখন তারা নিরাশ হলো।

গান্ধীকথিত একবছর তো ফুরিয়ে গেল। কোথায় স্বরাজ! তখনো বাকী ছিল মাস্ সিভিল ডিসওবিডিয়েন্স। যার বাংলা করা হয় গণসত্যাগ্রহ। সকলের আশা গণসত্যাগ্রহ যদি একবার আরম্ভ করে দেওয়া হয় তা হলে দাবানলের মতো ছড়িয়ে পড়বে ও দমকলের দ্বারা দমনের অতীত হবে। সেই তো স্বরাজ। তাই সকলেই দৃষ্টি বারদোলির উপর। গুজরাতের সেই তহশিল হবে পথপ্রদর্শক।

এমন সময় ঘটে গেল চৌরিচৌরায় আকস্মিক এক ঘটনা। পুলিশের গুলিবর্ষণের প্রতিবাদে উন্মত্ত জনতা থানায় আগুন দিল। পুড়ে মরল বাইশজন কনস্টেবল। মহাত্মার চোখে ভয়ঙ্কর এক অশুভ লক্ষণ। এত বড়ো দেশে চৌরিচৌরার মতো ঘটনা যে আর কোথাও ঘটবে না সে নিশ্চিন্তা কে দেবে? অহিংসা সত্যাগ্রহ হত্যাগ্রহ হতে কতক্ষণ? সরকার কি ছেড়ে কথা কইবে? সরকারও তার সমস্ত শক্তি দিয়ে আগুন নেবাবে।

ব্রিটিশ সরকার যে দরকার হলে তার মখমলের দস্তানা খুলে লোহার হাত বার করতে পারে এবিষয়ে গান্ধীকে কিছু বলার আবশ্যক ছিল না। তাহলেও তাঁর বন্ধুরা তাঁকে সতর্ক করে দেন যে ইংরেজরাও তাদের সৈন্যসামন্ত নিয়ে প্রস্তুত। গণসত্যাগ্রহ তারা অঙ্কুরে বিনাশ করবে।

এমনি এক বন্ধুর নাম মহম্মদালী ঝীণাভাই খোজানী। পরবর্তী বয়সে 'ভাই' ও 'খোজানী' বাদ দিয়ে মহম্মদ আলী ঝীণা। ইংরেজীতে জিন্না। ইনি একদিন রাত্রিবেলা বারদোলিতে উপস্থিত। এঁর মতে গণসত্যাগ্রহ কিছুতেই করা উচিত নয়, করলে গুরুতেই

গুলি চলবে। ইংরেজরা বেপরোয়া হয়ে রয়েছে। তার চেয়ে ভালো বড়লাট লর্ড রেডিং-এর সঙ্গে বৈঠক। জিন্না ও মালবীয় সেই চেষ্টায় আছেন।

গান্ধীজীও জানতেন যে সিপাহীবিদ্রোহের পর থেকে ইংরেজরা সর্বক্ষণ সন্ত্রস্ত, অতএব সশস্ত্র। একগুণ হিংসার উত্তর ওরা দশগুণ হিংসায় দেবে। তারপরে হয়তো কিছু শাসনসংস্কার বা চাকরিবাকরি দিয়ে নিহত ও আহতদের স্বদেশবাসীকে কৃতার্থ করে দেবে। সুতরাং একগুণ হিংসা যাতে আদৌ না হয় সেইটেই শ্রেয়। তার মানে কি সব আন্দোলন শুরু ? না, তা কদাচ নয়। অহিংসা সেকথা বলে না। অহিংসা বলে, আগে ক্ষেত্র প্রস্তুত করো, তারপরে গণসত্যাগ্রহ করো। ক্ষেত্র যে প্রস্তুত হয়নি চৌরিচৌরা তার সঙ্কেত। ওই লাল সিগনাল অগ্রাহ্য করলে সিপাহীবিদ্রোহের মতো পরিণাম হবে।

একজন সত্যাগ্রহী সব অবস্থায় অহিংস হতে পারে, কিন্তু এক কোটি সত্যাগ্রহী সব অবস্থায় অহিংস হতে পারে কি ? যেখানে জীবনমরণ সংগ্রাম চলেছে সেখানে এটাই হচ্ছে সর্বপ্রথম প্রশ্ন। নেতা যিনি তাঁকে এর সম্যক উত্তর দিতে হবে। বিশ্বাসের উপর ছেড়ে দিলে চলবে না। গণসত্যাগ্রহের সময় বয়ে যাচ্ছে। এখন যদি না হয় তবে আর কখন হবে কেউ বলতে পারে না। সময় আর জোয়ার কারো জন্যে সবুর করে না। অথচ যে সংগ্রাম অহিংস তার অহিংস চরিত্র না থাকলে তার নেতৃত্ব করা কি গান্ধীজীর উপযুক্ত কাজ ?

গণসত্যাগ্রহের তখনকার দিনের পরিকল্পনা ছিল বারদোলির অনুসরণে এক এক করে ভারতের অগণ্য তহশিল সরকারী কর্মচারীদের শাসনমুক্ত হবে। সরকারী কর্মচারীরা সেখানে গেলে সহযোগিতা পাবেন না। তাঁদের বর্জন করা হবে। তখন হয় তাঁরা তহশিলবাসীদের পক্ষে যোগ দেবেন নয় তাঁরা এলাকা ছেড়ে চলে যাবেন। এমনি করে ভারতের তহশিলে তহশিলে স্বাধীনতা আসবে। সরকারকে বাধ্য হয়ে সন্ধি করতে হবে।

তত্ত্বের দিক থেকে ভুল নয়। কিন্তু কার্যক্ষেত্রে যা হতো তা ওই বারদোলির মতো দুটি একটি তহশিলে আত্মশাসন। তারাও কিছুদিন বাদে হাল ছেড়ে দিত। পরস্পর বিচ্ছিন্ন হয়ে কেউ বেশীদিন চালাতে পারে না। তাছাড়া সরকারী কর্মচারীরা কি কেবল অপকারই করেন ? আপদে বিপদে উপকার করেন না ? তাঁরাও যদি অসহযোগ করেন, যদি তহশিলে না যান, তবে তহশিলবাসীরাই কি তাঁদের কাছে গিয়ে সাহায্যপ্রার্থী হবেন না ? বাংলাদেশে আমি বহু অঞ্চল দেখেছি যেখানে সরকারী কর্মচারীরা পারতপক্ষে পা দেন না। এতই দুর্গম ও বিচ্ছিন্ন। সাধারণের স্বার্থে তাঁদের

জোর করে পাঠাতে হয়েছে। অঞ্চলবাসী যদি তাঁদের সহ্য করতে না পারে তা হলে তাঁদের উপর চাপ দেওয়া বৃথা। তাঁরা যদি না যান অঞ্চলই অবহেলিত থাকবে।

থিওরির সঙ্গে প্র্যাকটিস যদি না মেলে, তবে চমৎকার একটা আইডিয়াও মাঠে মারা যায়। ব্যর্থতাই ছিল তখনকার পরিকল্পনার কপালে। যদি গান্ধীজী চৌরিচৌরার ইঙ্গিতে গণসত্যাগ্রহ স্থগিত না রাখতেন। ফলে তাঁকে হাস্যাস্পদ হতে হলো। অনেক গালমন্দ শুনতে হতো, যদি না সরকার তাঁর বিরুদ্ধে মামলা করে তাঁকে কারারুদ্ধ করতেন। ওটা শাপে বর। জেলে গিয়ে তিনি সব সমালোচনা এড়ালেন।

গণসত্যাগ্রহ যখন শিকেয় তোলা রইল তখন কর্মীদের একদল ধুয়ো ধরলেন যে বিকল্প হচ্ছে কাউন্সিল বর্জন তুলে নেওয়া। কাউন্সিলে গিয়েও তো সরকারের সঙ্গে একহাত লড়তে পারা যায়, অনাস্থা প্রস্তাব এনে সরকারপক্ষকে হারিয়ে দিতে পারা যায়। তা যায়। কিন্তু সরকার তা বলে দেশের কাঁধ থেকে নামে না। আইনসভার হারজিতের উপর সরকারের হারজিৎ নির্ভর করে না। তবে প্রাদেশিক সরকারের কয়েকটা বিভাগ নির্বাচিত মন্ত্রীদের পরামর্শ অনুসারে পরিচালিত। সেইসব বিভাগের ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রীদের বিরুদ্ধে অনাস্থা প্রস্তাব পাশ করিয়ে নিতে পারলে তাঁদের পতন ধ্রুব। কাউন্সিলগামী স্বরাজীদের সাধ্যের সীমা সেই পর্যন্ত। সেভাবে কি স্বরাজ হতে পারে? কংগ্রেস ওই প্রশ্নে দ্বিমত। পরে স্বরাজীদের কাউন্সিলে যাবার জন্যে নির্বাচনে নামতে দেওয়া হয়।

এমনি করে অসহযোগ নীতিতে উজান বইতে শুরু করে। বিদ্যার্থীরা ফিরে যায় স্কুল কলেজে। উকিলেরা আদালতের পসারে। কোথায় সেইসব জাতীয় বিদ্যাপীঠ, কোথায়ই বা গ্রাম পঞ্চায়েৎ! চরকা ও খাদি টিম টিম করে জ্বলতে থাকে। গঠনকর্মীরা নিষ্ঠার সঙ্গে শিবরাত্রির সলতে জ্বালিয়ে রাখেন।

অহিংসার দৌড় দেখে হিংসাপন্থীরা আবার হিংসাত্মক কাণ্ডকারখানায় উৎসাহ ফিরে পান। কংগ্রেসের এক অংশ তাঁদের নৈতিক সমর্থন জোগান। পেণ্ডুলাম ধীরে ধীরে অহিংসার থেকে হিংসার অভিমুখে দোলায়িত হয়। আর সে হিংসা যে কেবল রাজনৈতিক হিংসা হয়েই ক্ষান্ত থাকে তা নয়। বহুস্থলে সাম্প্রদায়িক হিংসার আকার ধারণ করে। দোষ অবশ্য দেওয়া হয় তৃতীয়পক্ষের 'ভাগ করো আর শাসন করো' নীতিকে। দু'পক্ষের মধ্যে বিরোধের হেতু তা বলে হাওয়া হয়ে যায় না।

খেলাফতের স্তম্ভ ছিলেন তুরস্কের খালিফ। কামাল পাশা তাঁকে বিতাড়ন করে নিরাশ্রয় করেন। তখন খেলাফতের ভারতীয় স্তম্ভধারীরা স্তম্ভীভূত হন। খেলাফতের ইস্যুতে যারা হাতে হাত মিলিয়েছিলেন তাঁদের হাতের জোড় খুলে যায়। তারপরে হাতা-

হাতি বাধতে কতক্ষণ! একদা যেসব হিন্দু মুসলমান হয়েছিল বা হতে বাধ্য হয়েছিল আর্যসমাজ তাদের ফিরিয়ে নিতে হাত বাড়ায়। মোল্লা ও মৌলবীরা বিনা দ্বন্দ্বে ফিরতে দিতে পারে? ধর্মান্তরীকরণ নিয়ে যে বিবাদের সূত্রপাত তার পরিণতি ভয়াবহ দাঙ্গায়।

নির্বাচনে জিতে কংগ্রেসপ্রার্থীরা অনেকগুলি মিউনিসিপালিটির কর্ণধার হয়েছিলেন। তাঁরা ইচ্ছা করলে মুসলমানদের আরো কয়েকটা চাকরি দিতে পারতেন। কিন্তু দিলে হয়তো হিন্দু ভোট হারাতেন। ফল যা হলো তা সাম্প্রদায়িক গাত্রদাহ। মুসলমানরা অনেকেই কংগ্রেসের উপর ক্রমে ক্রমে বীতশ্রদ্ধ হয়। কংগ্রেস রাজা হলে মুসলমানের কী এমন সুবিধে! ও তো হিন্দুরাজ। পরের জন্যে লড়তে যাবে ও জান দেবে কোন্ আহাম্মক!

তা সত্ত্বেও বিস্তর মুসলমান কংগ্রেসে রয়ে যান, জাতীয় সংগ্রামের দায়িত্ব অস্বীকার করেন না, হিন্দুর দোষে ভারতকে দণ্ড দিয়ে নিজেরা খালাস হন না। দেশের জন্যে নৈতিক বাধ্যবাধকতা তাঁদের সাম্প্রদায়িক ঈর্ষাদ্বেষের ঊর্ধ্বে রাখে।

গান্ধীজী যখন জেল থেকে বেরিয়ে আসেন তখন দেশের আবহাওয়া বদলে গিয়ে এমন হয়েছে যে গণসত্যাগ্রহের লেশমাত্র সম্ভাবনা নেই। অসহযোগও মৃতপ্রায়। বেঁচে আছে কেবল চরকা ও খাদি। ওদের বাঁচিয়ে রাখাই হয় তাঁর পিতৃকৃত্য। সে কাজে তিনি তাঁর সকল শক্তি ঢেলে দেন। তিনি বিশ্বাস করতেন যে জোয়ার আবার একদিন আসবে। যেদিন আসবে সেদিনকার জন্যে আপনাকে প্রস্তুত রাখাই তাঁর কর্তব্য। সেদিন যাঁরা তাঁর সঙ্গে চলবেন তাঁদের প্রস্তুত থাকতে হলে গঠনকর্ম নিয়েই জনসংযোগ রক্ষা করতে হবে। সেদিক থেকে বিচার করলে কাউনসিলযাত্রা হচ্ছে লক্ষ্যভ্রংশ। আর হিংসা তো রীতিমতো বিপথ।

কলেজে গিয়ে আমি নানা বিদেশী গ্রন্থ পাঠ করি ও নানা মুনির নানা মতের সঙ্গে পরিচিত হই। গান্ধীজীর সঙ্গে মিলিয়ে নেবার সুযোগ পাই। মানবের ইতিহাসে গান্ধীই আদি বা অন্ত নন। গান্ধীবাদীদের গোঁড়ামি দেখলে আমিও সমালোচনা করি। কিন্তু আমার সমালোচনা বাইরের লোকের নয়, ঘরের লোকের। আর সমালোচনাই কি শুধু করি, সমর্থনও কি করিনে? আমার সমর্থন আমার সাজে পোশাকে। টিকি আর টুপী ছাড়া আর সবই তো আমি নিয়েছি। টিকি যে আমি নিইনি এর কারণ আমি পাশ্চাত্য রেনেসাঁসের দ্বারা প্রভাবিত ভারতীয় রেনেসাঁসের সন্তান। গান্ধীজীর সঙ্গে এই ক্ষেত্রে আমার মিল নেই। টিকি দেখলেই আমার হাত নিসপিস করে। কাঁচি আমার অস্ত্র। আমি তার বেলা হিংসাপন্থী। আর টুপী না পরাই আমাদের

প্রাদেশিক ঐতিহ্য। আমরা টুপী পরিনে, মাথা খালি রাখি। পরলে আর বাঙালী থাকিনে, সাহেব বনে যাই।

একদিনে নয় দিনে দিনে আমার এ ধারণা দৃঢ় হয় যে অহিংসাই প্রকৃষ্ট উপায়, যেমন সততাই প্রকৃষ্ট পলিসি। ভারতের যা অবস্থা তাতে অহিংসা ভিন্ন আর কোনো উপায় জনগণের কাছে খোলা নয়। যাঁদের কাছে খোলা তাঁদের দলে জনগণ নেই। বিপ্লবীদের দলেও না, কাউন্সিলগামীদের দলেও না। তাঁরা যদি জনগণকে বাদ দিয়ে স্বাধীনতা অর্জন করতে ও পরে সংরক্ষণ করতে পারেন তো আমি সাধুবাদ দিতে রাজী আছি। কিন্তু জনগণকে বাদ দিয়ে ভাবা মহাত্মার আবির্ভাবের পর আর আমার পক্ষে সম্ভব নয়। গান্ধীজী এসে জনগণকে এমনভাবে জাগিয়ে দিয়েছেন যে তারা কিছুদিনের মতো অসাড় থাকলেও আর কখনো অসাড় হবে না। তখন জনগণের সঙ্গে মোকাবিলা করবেন কোন্ বিপ্লববাদী বা কোন্ কাউন্সিলগামী? করলে কী ভাবে করবেন? তাদের হাতে হাতিয়ার দিয়ে না ভোটপত্র দিয়ে? হাতিয়ার দিলে গৃহযুদ্ধ। ভোটপত্র দিলে তিন বছর বা পাঁচ বছর অন্তর একবার ঘুম ভাঙা। বাকী সময়টা নিদ্রা। কুম্ভকর্ণের মতো। আমার কাছে গান্ধী, অহিংসা ও জনগণ তিনে এক, একে তিন। হিন্দুদের ত্রিমূর্তি, খ্রীষ্টানদের ট্রিনিটি, বৌদ্ধদের ত্রিরত্ন যেমন।

তারপর আধুনিক যুগের অপরাপর মতবাদের মধ্যে ন্যায়ের অন্তঃসার যথেষ্ট থাকলেও প্রায় প্রত্যেকটির আড়ালে রয়েছে উদ্দেশ্যই আসল, উদ্দেশ্যসাধনের জন্যে যে-কোনো উপায় অবলম্বনীয়, উদ্দেশ্য মহৎ হলে উপায়ের সাত খুন মাফ। এণ্ড জাস্টিফায়েস মীনস্। টলস্টয় অনুপ্রাণিত গান্ধী মতবাদই বলতে গেলে একমাত্র মতবাদ যে বলে উপায়ই আসল, উপায় অশুদ্ধ হলে উদ্দেশ্যও মাটি হয়, উপায় শুদ্ধ হলে উদ্দেশ্যও হয় তদনুরূপ। এর কণ্ঠস্বর অতি ক্ষীণ। এর হাতে না আছে ঢাল না আছে তলোয়ার। তবু এ বলবে, উদ্দেশ্য মহৎ হলে কী হবে, উপায় যদি নীচ হয় তবে তেমন সিদ্ধি কাম্য নয়। ন্যায়ের জগৎ অন্যায়ের রক্ত আর কর্দম পিচ্ছিল পথ দিয়ে আসতে পারে না।

Mars-এর পূজা করব না, Mammon-এরও না, একথা বলতে পারতেন একমাত্র গান্ধীজী। সেইজন্যে জাতীয়তাবাদের মতো একটা সংকীর্ণ মতবাদও তাঁর নেতৃত্বের মহিমায় মহীয়ান হয়ে ওঠে। নেশনের পূজারীরা মানব সত্যেরও পূজারী হন। ভারতের জাতীয়তাবাদ মানবতাবোধে উদ্বুদ্ধ হয়। তা হলেও তার তলায় বিদ্বেষের বিষক্রিয়া ছিল। অহিংসার সঙ্গে তা সঙ্গতিহীন। অহিংসাকে তা ভিতরে ভিতরে লঙ্ঘন করে চলেছিল। বীরের প্রকাশ্য হিংসাও তার চেয়ে ভালো। প্রকাশ্য

হিংসার সাহস যাদের ছিল না গান্ধী নেতৃত্বের ছত্রছায়ায় মুখ ঢেকে তারা অহিংসার গৌরব বৃদ্ধি করত না। করত কেবল সংখ্যাবৃদ্ধি। সংগ্রামের দিন সেটারও দরকার ছিল। বস্তুত সর্বসাধারণের কাছে আন্দোলনের বা প্রতিষ্ঠানের দুয়ার খোলা রাখলে বাছবিচারের কড়াকড়ি থাকে না। যারা ঢোকে তারা যদি অহিংসার জল ঘোলা করে বা জাতীয়তার সঙ্গে বিজাতিবিদ্বেষ মেশায় তা হলে মহাত্মারও সাধ্য নেই যে ঠেকান। তাঁর ধারণা চরকা কাটার বিধান দিলে কেবল সাধুসজ্জনরাই টিকে থাকবে, আর সবাই কেটে পড়বে। বিদেশীর আইন ভঙ্গ করতে যারা এগিয়ে এসেছে মহাত্মার আইন ভঙ্গ করার থেকে তারা পিছিয়ে যাবার পাত্র নয়।

উপায় নিয়ে গান্ধীজীর সঙ্গে আমার মতভেদ ছিল না। আমিও মানতুম যে অহিংসা অর্থাৎ অহিংস প্রতিরোধই প্রকৃষ্ট উপায়। কিন্তু উদ্দেশ্য নিয়ে মতভেদ ছিল। ইংরেজ সরকার যাক, আমার আপত্তি নেই, কিন্তু আধুনিক সভ্যতা ও সংস্কৃতিও কি যাবে, যেহেতু তার বাহন পাশ্চাত্য বা ইংরেজী? সত্য আর অহিংসা আর মৈত্রী প্রভৃতি শাশ্বত মূল্যগুলি আসুক, সে তো অতি উত্তম কথা, কিন্তু রেনেসাঁসের পর থেকে যেসব মূল্য চলিত হয়েছে—যুক্তি আর তথ্য আর সংস্কারমুক্তি আর বন্ধনহীনতা—সেসবের প্রস্থান ঘটবে না তো? জনগণ অহিংস হোক, আমিও চাই। কিন্তু অজ্ঞ হলেই কি ভালো হবে? রেনেসাঁসকে জনজীবনের খাতে বইয়ে দেওয়াই কি কাম্য নয়?

একটিমাত্র কোকিল দিয়ে যেমন একটা বসন্ত হয় না তেমনি একজনমাত্র গান্ধী দিয়ে একটা ভাববিপ্লব। ধীরে ধীরে আমার প্রত্যয় হলো যে রেনেসাঁস তাঁর উপর বিশেষ কোনো প্রভাবপাত করেনি, অষ্টাদশ শতকের ইউরোপীয় এনলাইটেনমেন্ট তাঁকে স্পর্শ করে থাকলে সামান্যই করেছে, আধুনিক যুগ বলতে তিনি বোঝেন ইণ্ডাস্ট্রিয়ালিজম ও মিলিটারিজম। তাঁর নেতৃত্বে দেশ স্বাধীন হতে পারবে, জনগণও প্রতিরোধশক্তি লাভ করবে, সাম্প্রদায়িক মৈত্রীও সম্ভবপর, কিন্তু আর একটা ফরাসীবিপ্লব কেমন করে সম্ভব? তার প্রস্তুতি কোথায়? কোথায় ভলতেয়ার? কোথায় রুশো? দিদেরো ও তাঁর বিশ্বকোষরচয়িতা বন্ধুগণই বা কোথায়?

আমরা কি তা হলে মধ্যযুগে ফিরে যাব? ইংরেজ বিদায় মানে কি ইংরেজপূর্ব যুগের প্রত্যাবর্তন? মধ্যযুগ তো তবু হিন্দুমুসলমান উভয়ের। মুসলমানকে বাদ দিয়ে, আরো অতীতে ফিরে যাবার চিন্তাও অনেকের মনে ছিল। তাঁদের বলা হতো হিন্দু রিভাইভালিস্ট। তেমনি একদল মুসলিম রিভাইভালিস্টও ছিলেন। আমরা কি তা হলে রিভাইভালিস্টদের সংঘর্ষের দৃশ্য দেখব? মানুষ যেমন দেশবিশেষের সন্তান তেমনি যুগবিশেষেরও সন্তান। আমরা কোন্ যুগের সন্তান? যদি আধুনিক যুগের সন্তান

হয়ে থাকি তবে সে যুগের সঙ্গে আমাদের কি ভালোবাসার সম্পর্ক না বিদ্বেষের সম্পর্ক ?

মিলিটারিজম ও ইণ্ডাষ্ট্রিয়ালিজম যে আমাদের যুগকে ফোঁপরা করে তুলছে আমি তা ভালো করেই জানতুম। স্বাধীন ভারত বলতে যদি বোঝায় আর-একটা ইটালী বা জাপান তা হলে সে ভারত গান্ধীজীর তো কাম্য নয়ই। কাম্য নয় আমারও। গান্ধীজীর সঙ্গে আমি এক্ষেত্রে একমত। কোনো একটা যুগের সব কিছুই গ্রহণীয় নয়। তাই যদি হতো তবে গত শতাব্দীর দাসপ্রথাও গ্রহণীয়ের তালিকায় পড়ত। আমাদের যুগ ওটাকে অতিক্রম করে এসেছে। তেমনি মিলিটারিজম তথা ইণ্ডাষ্ট্রিয়ালিজমকেও করবে। এই ছিল আমার বিশ্বাস। তাই স্বাধীন ভারত বলতে আমি আর-একটা ইটালী বা জাপান বুঝতে চাইতুম না।

কিন্তু ওটা তো হলো নেতিবাদ। কী চাইনে তা বলা হলো। কী চাই তা তো বলা হলো না। গান্ধীজীর দিকে তাকাই। মন মেনে নিতে পারে না যে হাজার হাজার বছর ধরে গ্রামে বাস করা মানুষ চিরকাল গ্রামে বাস করলেই নতুন এক সমাজ-ব্যবস্থার পত্তন হবে, নতুন এক সভ্যতার উদয় হবে। উচ্চনীচ ভেদ তুলে দিলেই জাতিভেদ আরো পাঁচ হাজার বছর সহনীয় বা স্পৃহনীয় হবে। ব্রহ্মচর্য রক্ষা করলেই নরনারীর সম্পর্ক মধুময় হবে ও নরনারীর সাম্য প্রতিষ্ঠিত হবে। ধনিক শ্রমিক, খাতক মহাজন, জমিদার রায়ত সকলেরই স্বার্থ অক্ষুণ্ণ রেখেও শ্রেণীসাম্য সম্ভব। সনাতন শাস্ত্র শাসিত মন একতিলও বদলাবে না, একটুও বিদ্রোহ করবে না, অথচ বিংশশতাব্দীর গতিশীল মন হবে। এই যদি তাঁর মত হয় তবে আমি তাঁর সঙ্গে একমত হতে পারিনে।

॥ সাত ॥

গান্ধী, অহিংসা ও জনগণ এই ত্রয়ীতে আমার বিশ্বাস ছিল, কিন্তু তিনের যোগফলে ভারতের কী ভাবরূপ হবে তা আমাকে ভাবিয়ে তুলত। যদি হয় বর্ণাশ্রমী ভারত তাহলে তো তার সঙ্গে আমার মূলগত অমিল। কারণ আমি চাই গতিশীল জীবন, স্থিতিশীল জীবন নয়। আর আমি চাই নতুন শৃঙ্খলা, পুরাতন শৃঙ্খল নয়।

গান্ধীজীর দিকে আমি তাকিয়ে থাকি, প্রতি সপ্তাহে 'ইয়ং ইণ্ডিয়া' পড়ি। ইতি-পূর্বেই পড়া হয়েছিল 'হিন্দ্ স্বরাজ'। এরপরে পড়া গেল 'সত্যের পরীক্ষা' বা আত্মজীবনী। এ জগতে যারা ইতিহাস সৃষ্টি করেন ইনি হলেন তেমনি একজন পুরুষ। এঁকে যীশু বুদ্ধের মতো মহাগুরুও বলতে পারা যায়। আমার নৈতিক ও আধ্যাত্মিক সত্তা এঁর

বাণী সতৃষ্ণ আগ্রহে পান করে। ইনি যে বাতাসে নিঃশ্বাস নিচ্ছেন আমিও যে সেই বাতাসে নিঃশ্বাস নিচ্ছি এ কি আমার পরম সৌভাগ্য নয়! ভাবীকালের মানুষ আমাকে এই জন্যে ঈর্ষা করবে। আমার সাধ ছিল যাতে একদিন বলতে পারি—"হাঁ, গান্ধীজীকে আমি দেখেছি।"

সুযোগ জুটে যায় তাঁর জেল থেকে বেরোবার বছর দেড়েক বাদে পাটনায়। যে বার স্বরাজীদের হাতে কংগ্রেসকে সঁপে দেওয়া হয়, সঙ্গে সঙ্গে নিখিল ভারত কাটুনী সঙ্ঘের প্রতিষ্ঠা হয়। ধার করা এক ক্যামেরা কাঁধে ঝুলিয়ে আমিও ঢুকে পড়ি নিখিল ভারত কংগ্রেস কমিটির সভায়। মহাত্মার কাছ থেকে অদূরেই আমার আসন। ফোটো তুলিনি, তবে সমস্তক্ষণ তাঁর উপর দৃষ্টি রেখেছি সূর্যমুখীর মতো। মানুষটার সীক্রেট কী? কিসের জোরে উনি নতুন এক সৌরমণ্ডলীর সূর্য? কেন ওইসব সর্বজনমান্য জ্যোতিষ্ক তাঁর চারদিকে ঘুরছেন? হাঁ, সেই সভায় ভারতের অবং বড়ো বড়ো নেতাকেও প্রত্যক্ষ করি। নেত্রীকেও।

কেমন করে বুঝব কী তাঁর সীক্রেট? ডেস্ক সামনে রেখে মেজের উপর পা মুড়ে বসেছিলেন ও একমনে শুনছিলেন নেতাদের বক্তব্য। অখণ্ড ধৈর্য। মাঝে মাঝে দুটি একটি উক্তি করছিলেন একান্ত বিনয়ে ও নিম্নস্বরে। তখন ঠিক মালুম হয়নি যে স্বরাজীদের কাছে তিনি হেরে গেছেন, ওটা তাঁর পরাজয়সভা। এই মর্মে সন্ধি হয়েছে যে ওঁরা তাঁর খদ্দর নীতি মেনে নেবেন আর তিনি ওঁদের পার্লামেণ্টারি প্রোগাম মেনে নেবেন। বুদ্ধের মতো অবিচলিত বিগ্রহ। কিন্তু বুদ্ধের মতো প্রশান্ত নন। ভিতরে ভিতরে অশান্ত। কি যেন করতে এসেছিলেন, করতে পারেন নি, করতে পারছেন না। তবু স্থিতপ্রজ্ঞ। স্বীয় মতবাদে অটল। বজ্র দিয়ে গড়া।

কিন্তু ততদিনে আমি তাঁর মতবাদের থেকে অনেক দূরে সরে গেছি। যদিও সংযোগ রেখেছি। কে পার্লামেণ্টে যাবে, কে চরকা নিয়ে থাকবে এসব আমার গণনা নয়। ইতিমধ্যে মার্কসবাদীরা সক্রিয় হয়েছেন, আমার সতীর্থরা এম এন রায়ের 'ভ্যানগার্ড' পড়ছেন। কেউ কেউ আবার মুসোলিনির ভক্ত ও ফাসিস্ট মতবাদের অনুরক্ত। মুসলমান বন্ধুদের মনেও সংশয় দেখা দিয়েছিল। খেলাফতের ইস্যুতেই তাঁরা সংগ্রামে নেমেছিলেন, নইলে শুধুমাত্র স্বরাজের জন্যে তাঁরা ইংরাজদের সঙ্গে বিবাদ বাধাতেন না। তাঁরা বরং কমিউনিস্ট বনবেন, তবু ন্যাশনালিস্ট হতে তাঁদের অন্তরের বাধা। তাঁরা যে একটি আন্তর্জাতিক ভ্রাতৃসঙ্ঘ। তাঁদের খালিফ না থাকলেও তীর্থ আছে, মক্কার সঙ্গে তাঁদের নাড়ীর টান। আমাদের চোখে তুর্করা আরবরা ইরানীরা এলিয়েন। কিন্তু তাঁদের চোখে এলিয়েন নন।

ইংলণ্ডের ইতিহাসে একদা ক্যাথলিকরা তাঁদের আন্তর্জাতিক ধর্মগুরু পোপ ও আন্তর্জাতিক তীর্থকেই অগ্রাধিকার দিয়ে প্রোটেস্টান্টদের জাতীয়তাবাদের সঙ্গে ছন্দ রাখতে অক্ষম হয়েছিলেন। এই নিয়ে চূড়ান্ত বিচ্ছেদ ঘটে যায়। দেশের চার্চ থেকে তো বটেই, রাষ্ট্র থেকেও ক্যাথলিকদের নিষ্কাশন করা হয়। এখানে ওখানে এক আধ-জন ক্যাথলিক রাজকর্মচারী থাকলেও থাকতে পারেন, কিন্তু রাজা থেকে আরম্ভ করে রাজ্যের উচ্চতর স্তরে তাঁরা অনধিকারী বলে গণ্য হন। তাঁদের সুদিন ফিরে আসতে প্রায় তিন শতাব্দী লাগে।

সুতরাং কারা এলিয়েন, কারা নয়, এটা একটা গুরুতর সমস্যা। হিন্দু মুসলিম সম্পর্ক যে কেবল ধর্মভেদের দরুন কণ্টকিত তাই নয়, রাষ্ট্রীয় আনুগত্যের দরুন দ্বিধাজড়িত। খেলাফতের মতো একটা বাইরের ইস্যু নিয়ে যারা দেশসুদ্ধ লোককে সংগ্রামে নামাতে চায় স্বরাজের মতো সর্বভারতীয় ইস্যু সম্বন্ধে তাদের ক'জনের সত্যিকার মাথাব্যথা? শাব বেলা কেবল দরাদরি। হিন্দুরা কী দেবে? কত দেবে? ইংরেজরা যদি তার চেয়ে বেশী দেয় তাহলে কী হবে? গান্ধীজী ধীরে ধীরে উপলব্ধি করেন যে সাম্প্রদায়িকতা-বাদী মুসলমানদের সঙ্গে হাত মিলিয়ে জাতীয়তাবাদী সংগ্রাম নৈব নৈব চ। হাত মেলাতে হবে জাতীয়তাবাদী মুসলমানদের সঙ্গে। অর্থাৎ যাঁদের আনুগত্যে দোটানা নেই। তাঁদের হিন্দু হতে কেউ বলছে না, তাঁদের ধর্মবিশ্বাসে কেউ হস্তক্ষেপ করছে না, কিন্তু তাঁরা আর সকলের মতো ভারতীয়, সুতরাং ভারতের জাতীয় ঐক্যের শরিক।

ন্যাশনালিজম নিয়ে যেমন দোটানা তেমনি ডেমোক্রাসী নিয়েও দোভাগা। চাকরিবাকরির বেলা তো বটেই, নির্বাচনকেন্দ্রের বেলা, নির্বাচিত প্রতিনিধির বেলা ও দায়িত্বশীল মন্ত্রীর বেলাও দুটি পরস্পরবিচ্ছিন্ন ভাগ। মুসলমান দায়ী শুধু মুসলমানের কাছেই। বাদ বাকী দায়ী শুধু বাদবাকীর কাছেই। না ভেবেচিন্তে গান্ধীও এককালে এতে সায় দিয়েছিলেন। মনটা তো পার্লামেন্টারি নয়, বুঝবেন কি করে, কী পরিণাম এর। অসহযোগ স্থগিত রাখার পর স্বরাজীদের উপরোধে পার্লামেন্টারি ঢেঁকি গেলার পর গলায় বাধল যখন তখন বুঝলেন।

গান্ধীজী কোনোরূপ চুক্তিতে বিশ্বাস করতেন না। চুক্তি তো সংগ্রামের জন্যে নয়, পার্লামেন্টারি কর্মপন্থার জন্যে। তেমনতর কর্মপন্থার জন্যে ভারত ইতিহাসে গান্ধীজীর আবির্ভাব ঘটেনি। তাঁর তাতে বিশ্বাসও নেই। সেইজন্যে লখনউ চুক্তির অনুরূপ চুক্তি দ্বিতীয়বার সম্ভব হলো না। জীণাও সে আশা ছেড়ে দিলেন। এরপরে আসে জীণার চৌদ্দ দফা দাবী। কংগ্রেস ওসব শুনতে চায় না। শেষ পর্যন্ত ব্রিটিশ পলিসিই সফল হয়। যেসব মুসলমান একদিন জাতীয়তাবাদী আন্দোলনে গান্ধীজীর পেছনে ভিড়

করেছিলেন তাঁদের অনেকেই পিছু হটতে হটতে অদৃশ্য হয়ে যান। আর তাঁদের দাড়িটি দেখতে পাওয়া যায় না। আসলে তাঁরা স্বরাজের ইস্যুতে লড়তে চাননি। চেয়েছিলেন খেলাফতের ইস্যুতেই লড়তে। দুই ইস্যু জুড়ে না দিলে লড়াই হতো না বলে তাঁরা স্বরাজের জন্যেও লড়েন।

এই গোঁজামিলের জন্যে বহু সমালোচক গান্ধীজীকে দুষেছেন। কিন্তু করতেনই বা তিনি কী, যখন খেলাফতীরা অগ্রণী হয়ে তাঁকে নিমন্ত্রণ করে নিয়ে যান ও খেলাফতের জন্যে সংগ্রামের সেনাপতি হতে অনুরোধ করেন? তাঁর শর্ত হলো অহিংসা। সে শর্তে যখন তাঁরা রাজী তখন তিনি কি রাজী না হয়ে পারেন? তা ছাড়া নিছক স্বরাজের জন্যে সংগ্রাম জোর পেত কী করে, যদি মুসলমানরা ঝাঁকে ঝাঁকে ঝাঁপ না দিতেন? দু'চারটি মুসলমানকে নিয়ে তো জাতীয় সংগ্রাম হয় না। হলে যা হয় তা এত বিরাট নয়।

আমার এক মুসলিম বন্ধু বহুদিন পরে আমাকে বলেছিলেন, সিপাহী বিদ্রোহের সময় হিন্দু মুসলমান একজোট হয়ে লড়েছিল। তার ফল হলো কী? মুসলমানেরই জান গেল, জমিন গেল। হিন্দুরা সেসব জমিন নীলামে কিনে নিয়ে ধনবান হলো। সেই থেকে মুসলমানরা আর হিন্দুদের সঙ্গে একজোট হয়ে লড়তে চায় না। তাতে তাদের লাভ তো কিছু হবেই না। লোকসানই হবে।

সিপাহী বিদ্রোহ যে ইংরেজকে আর মুসলমানদের একশ্রেণীকে বরাবরের জন্যে প্রভাবিত করে গেছে এটা মনে রাখলে অনেক ব্যাপারের অর্থ ভেদ করা যায়। ইংরেজের মনে আতঙ্ক হিন্দু মুসলমান একজোট হলে আবার সেইসব বিভীষিকা ফিরে আসবে। কানপুরে আর দিল্লীতে আর লখনউতে যেসব ঘটনা ঘটেছিল। মুসলমানদের একশ্রেণীর প্রাণে ত্রাস ইংরেজরা তাদের মেরে ঠাণ্ডা করে দেবে আর হিন্দুরাই তাদের সম্পত্তি ভোগ করবে। আগে যেমন করেছিল।

জেল থেকে ফেরার চার-পাঁচ বছর বাদে হাওয়া আবার গান্ধীনেতৃত্বের অনুকূলে যায়। স্বরাজীদের দৌড় দেখে দেশের লোক নারাজীদের দিকে ঝোঁকে। বারদোলিতে একটা ছোট মাপের সত্যাগ্রহ আন্দোলন হয়। তার সর্দার হন বল্লভভাই পটেল। বারদোলির এবারকার সত্যাগ্রহ একটা স্থানীয় ইস্যুতে। খাজনাবৃদ্ধির প্রতিবাদে। এতে বল্লভভাইয়ের উচ্চতা বেড়ে যায়। গান্ধীজীই তাঁকে সেই সুযোগ দেন।

সামনের সারিতে আসার সুযোগ এতদিন প্রো-চেঞ্জাররা পেয়ে আসছিলেন, এবার থেকে নো-চেঞ্জাররা পেলেন। কংগ্রেস সভাপতির পদে দ্বিতীয়বার বৃত হবার প্রস্তাবে অসম্মত হয়ে গান্ধীজী সে মণিহার জবাহরলালের কণ্ঠে পরিয়ে দেন। তখন থেকে

জবাহরও প্রথম সারির নেতা। বলা বাহুল্য তিনিও ছিলেন নো-চেঞ্জার। পরে তিনি সোসিয়ালিস্ট চিন্তাধারা আবাহন করে নিয়ে আসেন। অন্যান্য নো-চেঞ্জারদের ছাড়িয়ে যান। যুবকের দল তার দিকে আর সুভাষচন্দ্রের দিকে তাকান। তবে সবাই জানতেন যে গান্ধীজী যা করবেন তাই হবে। কারণ স্যাঙ্কশনস তো সেই একজনের হাতে।

স্যাঙ্কশনস অর্থাৎ সিভিল ডিসওবিডিয়েন্স একমাত্র গান্ধীজীরই ইচ্ছানির্ভর। কর্তার ইচ্ছায় কর্ম। তিনি যদি নিষ্ক্রিয় হয়ে বসে থাকেন তো আর সকলেও অগত্যা নিষ্কর্মা। তাঁরা লম্ফ-ঝম্ফ যতই করুন। আর গান্ধীজী যে নিষ্ক্রিয় সেটা ঠিক নয়। গঠনের কাজে প্রাণ মন ঢেলে দেওয়াই সত্যাগ্রহের জন্যে দেশকে প্রস্তুত করে তোলা। সত্যাগ্রহ কেবল তাকেই মানায় গঠনের কাজে যার এক মুহূর্ত বিরাম বা বৈরাগ্য নেই। যুদ্ধের যেমন প্যারেড সত্যাগ্রহের তেমনি গঠনকর্ম। গঠনের কাজে অনাগ্রহ থাকলে সত্যাগ্রহ ব্যর্থ হতে বাধ্য।

গঠনকর্মের মর্মকথা কায়িক শ্রম। গঠনকর্ম হচ্ছে শ্রমাগ্রহ। শ্রমই সমাজের প্রধান শক্তি। অধিকাংশ মানুষই শ্রমজীবী। দেশে দেশে শ্রমজীবীদের হাতেই ক্ষমতা চলে যাচ্ছে। তাদের সঙ্গে একাত্ম হতে হলে তাদেরি মতো কায়িক শ্রমে রুচি হওয়া চাই। যাদের একান্তই অরুচি তারা দেশের মূলস্রোতের বাইরে থাকতে পারে। কিন্তু মূলস্রোতের সামিল হবে যারা তাদের কাছে কায়িকশ্রমে যোগদান এমন কিছু অন্যায় প্রত্যাশা নয়। দিনে আধঘণ্টা চরকা কাটা তো ন্যূনতম আশা। তাতেও যারা নারাজ তারা কি কোনদিন দেশের লোকের মন পাবে? ভোটের জোরে দেশ শাসন করতে পারে, কিন্তু তাদের সেই নৈতিক শক্তি কোথায় যে জনগণ তাদের নির্দেশ মান্য করবে?

স্যাঙ্কশনস বলতে বোঝায় সেই নৈতিক শক্তি যা বিদেশী শাসকদের গায়ের জোরকে হটাতে পারে ও তার জায়গায় স্বদেশী লোকপ্রতিনিধিদের হুকুম দেবার ক্ষমতাকে বসাতে পারে। গান্ধীজীর ব্রত তেমন স্যাঙ্কশনস তৈরি করা। কবে একদিন জোয়ার আসবে, তার জন্যে কান পেতে থেকে তিনি অহরহ গঠনের কাজ চালিয়ে যান। দেখতে দেখতে খাদিশিল্প গড়ে ওঠে। বলতে গেলে বিনা মূলধনে। বিনা রাজানুকূল্যে।

গান্ধীজী সরাসরি জনগণের সান্নিধ্যে কতটুকু আসতে পারেন? তাঁর বাণী বহন করে নিয়ে যাবার জন্যে শত সহস্র সহকর্মী চাই। তাঁরাই ভারতের সাত লক্ষ গ্রামে ছড়িয়ে পড়বেন ও জনগণের সঙ্গে প্রত্যক্ষ সম্বন্ধ স্থাপন করবেন। তাঁরা যেমন জনগণের সেবা করবেন তেমনি জনগণও তাঁদের সাংসারিক অভাব মোচন করবেন। সে অভাব যদি গ্রামবাসীর সাধ্যের অতীত না হয়। অধিকাংশ কর্মীই মধ্যবিত্ত শ্রেণীর। চিরাচরিত

স্বাচ্ছন্দ্য-ত্যাগ না করে তাঁরা গ্রামবাসী জনগণের সেবা করতে পারেন না। নয়তো তাঁরা শ্রমজীবী মানুষের পিঠের বোঝা বাড়িয়েই দেবেন। ফলে তাঁদের সঙ্গেই গ্রামের লোকের ঠোকাঠুকি বাধবে।

সৌভাগ্যক্রমে সত্যিকার ত্যাগী কর্মী দলে দলে যোগ দিয়েছিলেন ও নিরলস সাধনার দ্বারা জনগণের চিত্তজয় করেছিলেন। কিন্তু যার জন্যে তাঁরা এতকিছু ছেড়েছিলেন ও এত দুঃখ বরণ করেছিলেন তার নাম স্বরাজ। অর্থাৎ দেশের স্বাধীনতা। তাঁদের প্রেরণার উৎস ছিল দেশপ্রেম। দেশকে না ভালোবাসলে তাঁরা জনগণের জন্যে আবেগ বোধ করতেন না। তাঁদের ভালোবাসা দেশকেন্দ্রিক, জনকেন্দ্রিক নয়।

আর গান্ধীজীর ভালোবাসা দেশের মানুষকে ভালোবাসা। বিশেষ করে যারা দীনহীন, যারা দুর্বল, যারা বিপন্ন, যারা আতুর, যারা অনাথ সেইসব মানুষকে ভালোবাসা। তাঁর ভালোবাসা অহেতুক। তার বিনিময়ে তিনি কিছুই চান না, দেশের স্বাধীনতাও না। দেশের স্বাধীনতার জন্যে তিনি লড়বেন, সেটা তাঁর প্যাশন, কিন্তু স্বাধীনতার পরে যখন লড়বার প্রয়োজন থাকবে না তখন কি তাঁর দেশের জনগণকে কম ভালবাসবেন বা কম সেবা দেবেন? জনগণের সঙ্গে তাঁর সম্পর্ক নৈমিত্তিক নয়, নিত্য। দেশ পরাধীন থাকতেও যা, দেশ স্বাধীন হলেও তাই। তিনি জনগণের লোক। তারা ও তিনি অভিন্ন। তেমনি তিনি অহিংসার পূজারী। অহিংসা ও তিনি অভিন্ন।

তাঁর সহকর্মীদের সকলের মধ্যেই জলন্ত দেশপ্রেম ছিল, কিন্তু জনপ্রেম ছিল অতি বিরলসংখ্যক অনুগামীর মধ্যে। এঁরাই ধরিত্রীর লবণ। এঁরা না থাকলে গান্ধীজীর বাক্যগুলো হয়তো জনগণের কানে পৌঁছত, কিন্তু গান্ধীজীর বাণীর জীবন্ত রূপ তাঁদের চোখে ভাসত না। জনগণকে এঁরা দেশের স্বাধীনতার জন্যে ব্যবহার করতে চাননি, দেশের স্বাধীনতাকেই ব্যবহার করতে চেয়েছেন জনগণের জন্যে। নিজেদের জন্যে এঁদের পরোয়া ছিল না। অতি অল্পেই এঁদের অভাব মিটত। এঁরা ছিলেন প্রকৃত সন্ন্যাসী। জাতীয়তাবাদী এরা নিশ্চয়ই, কেন তার চেয়ে বড়ো কথা এঁরা গান্ধীবাদী। স্বাধীনতার পরেও এঁরা গান্ধীবাদী থাকবেন, স্বাধীনতার সঙ্গে সঙ্গেই এঁদের ত্যাগস্পৃহা ফুরোবে না। এরকম নিষ্ঠাবান কর্মীদের কারো কারো সংস্পর্শে আমি এসেছি। জানি এঁরা কী ধাতুতে গড়া।

দক্ষিণ আফ্রিকা থেকে ফেরবার সময় গান্ধীজী দুই হাতে দুটি দান নিয়ে আসেন, দুই চোখে দুটি ধ্যান। একটি তো সত্যাগ্রহ, অপরটি সর্বোদয়। স্বরাজ কথাটি তাঁর সৃষ্টি নয়। যাঁর সৃষ্টি তিনি যতদূর জানি টিলক। কিন্তু কংগ্রেসের মঞ্চে সর্বপ্রথম উচ্চারণ করেন দাদাভাই নওরোজী। গান্ধীজী অবশ্য পরে ওটিকে আপনার করে

নেন। দক্ষিণ আফ্রিকায় থাকতেই "হিন্দ্ স্বরাজ" লিখে স্বরাজের একটা সংজ্ঞা দেন বা ছবি আঁকেন। তাঁর স্বপ্নের স্বরাজ অন্যান্য জাতীয়তাবাদী নেতাদের কল্পনার স্বরাজ নয়। কেমন করে হবে? তাঁরা তো সত্যাগ্রহ বা সর্বোদয় কোনটার দ্বারা অনুপ্রাণিত হননি। গান্ধীজীর স্বরাজের একটি অপরিহার্য অংশ ছিল সত্যাগ্রহ, আরেকটি অপরিহেয় অঙ্গ সর্বোদয়।

স্বরাজের ইস্যুতে না হোক যে কোনো উপযুক্ত ইস্যুতে সত্যাগ্রহ তিনি করতেনই। জনগনকে নিয়ে না হোক একজনকে নিয়েও তাঁর সত্যাগ্রহ চলত। সত্যাগ্রহেরই অপর নাম অহিংসা। গান্ধী আর অহিংসা অভিন্ন। জগৎকে সত্যাগ্রহের বাণী শোনাবার জন্যেই তাঁর জন্ম। তেমনি সর্বোদয় হচ্ছে তাঁর জীবনদর্শনের লক্ষ্য। কতজনের কতরকম ইউটোপিয়া, গান্ধীজীর ইউটোপিয়া হচ্ছে সর্বোদয়। স্বরাজেই থেমে যাবে না তাঁর চলা। তাঁর অনুগামীদের চলা। সর্বোদয় যদি স্বরাজের অঙ্গপ্রত্যঙ্গে থাকে তবে স্বরাজও ইংরেজবিদায় নামক একদিনের একটা ঘটনা নয়। বহুকাল ধরে গড়ে তোলার মতো একটি সাধনা।

স্বরাজ কথাটি তিনি এক এক পটভূমিকায় এক এক অর্থে ব্যবহার করেছেন। যে স্বরাজ এক বছরেই হতে পারে সে স্বরাজ 'হিন্দ্ স্বরাজ' নয়। এক বছরে হতে পারে ক্ষমতার হস্তান্তর। রাজপ্রতিনিধিদের হাত থেকে লোকপ্রতিনিধিদের হাতে ক্ষমতা আসা। তারপরে যদি ক্ষমতার সদব্যবহার না হয় তবে তো ভারতের স্বাধীনতা হবে ইটালীর স্বাধীনতার মতো একটা বড়লোকী ব্যাপার। যাতে তেমন না হয় সেইজন্যেই তো 'হিন্দ্ স্বরাজ' লেখা। ইটালীর স্বাধীনতা দূরের কথা ব্রিটেনের পার্লামেন্টারি সীস্টেমও গান্ধীজীর চোখে লাগে না। এমন কি গোটা পশ্চিম ভূখণ্ডের আধুনিক সভ্যতাও তাঁর মতে একটা ব্যাধি, যা ব্রিটেনকে দিয়ে ভারতে সংক্রামিত হয়েছে। এককথায় তিনি চান নীতির জগৎ, যেমন সেকালের সাধুসন্তেরা চাইতেন ধর্মের জগৎ। নৈতিককে উপেক্ষা করে বৈষয়িক উন্নতি তাঁর কাছে তুচ্ছ।

তিনি তাঁর সত্যাগ্রহের দ্বারা অনৈতিকের সংক্রমণ হতে স্বদেশকে রক্ষা করবেন, তাঁর সর্বোদয় সাধনার দ্বারা স্বদেশের জনগণকে প্রকৃত সভ্যতার অধিকারী করবেন। দীর্ঘ পথ, তার একটা মধ্যবর্তী স্টেশনের নাম স্বরাজ। টিলকের স্বরাজ, দাদাভাইয়ের স্বরাজ। রাজনৈতিক স্বরাজ। পার্লামেন্টারি সীস্টেমকেও তিনি আর তাচ্ছিল্য করেন না। যদিও পঞ্চায়তী ব্যবস্থাই তাঁর অভীষ্ট।

॥ আট ॥

দক্ষিণ আফ্রিকা থেকে গান্ধীজী যখন স্বদেশে ফিরে আসেন তখন তাঁর বয়স পঁয়তাল্লিশ বছর। যার থেকে প্রায় পঁচিশ বছরই কেটেছে বিদেশে। দক্ষিণ আফ্রিকাকে যদি ইউরোপীয়দের একটি দেশ বলে ধরা হয় তবে পশ্চিমে আর কোনো ভারতীয় মনীষী বা নেতা তাঁর মতো এতকাল ইউরোপের বা ইউরোপীয় উপনিবেশে অতিবাহিত করেননি।

পশ্চিমে প্রায় পঁচিশ বছর ধরে বাস করে তাঁর যা প্রত্যয় হয় তারই উপর নির্ভর করে তিনি লেখেন 'হিন্দ্ স্বরাজ'। তখনো তিনি জানতেন না যে সত্যাগ্রহ দক্ষিণ আফ্রিকায় সফল হলে, সেইসূত্রে ভারতবর্ষে তাঁর নাম হবে, সেখানে পাঁচ বছর বাদে তিনি ফিরবেন, ফেরার চার বছর বাদে রাউলাট আইনের বিরুদ্ধে সত্যাগ্রহে নামবেন। তার এক বছর বাদে ভারতের স্বরাজের ইস্যুতে অসহযোগ পরিচালনা করবেন।

বলতে গেলে 'হিন্দ্ স্বরাজ'ই তাঁর ম্যানিফেস্টো। মার্ক্সের যেমন কমিউনিস্ট ম্যানিফেস্টো। ইশ্তাহারের সারাংশ দিয়ে তাঁর এক স্বদেশবাসী বন্ধুকে তিনি একখানি চিঠি লেখেন। চিঠিতে ছিল—

"এক। পূর্ব ও পশ্চিমের মাঝখানে কোনো অলঙ্ঘ্য ব্যবধান নেই।

দুই। পাশ্চাত্য বা ইউরোপীয় সভ্যতা বলে কোনো পদার্থই নেই। আছে এক আধুনিক সভ্যতা। সেটা পুরোপুরি বস্তুভিত্তিক।

তিন। আধুনিক সভ্যতার ছোঁওয়া লাগার আগে ইউরোপের লোকের সঙ্গে অনেক বিষয়ে মিল ছিল পূর্বমহাদেশের লোকের। অন্ততপক্ষে ভারতবর্ষের লোকের। আজকের দিনেও যেসব ইউরোপীয়ের গায়ে আধুনিক সভ্যতার ছোঁওয়া লাগেনি তারা ভারতীয়দের সঙ্গে আরো ভালো ভাবে মিশতে পারে আধুনিক সভ্যতার সন্তানদের চেয়ে।

চার। ভারতবর্ষ শাসন করছে ব্রিটিশ জাতি নয়, আধুনিক সভ্যতা। তার বাহন হচ্ছে রেলওয়ে, টেলিগ্রাফ, টেলিফোন ইত্যাদি সভ্যতার জয় বলে কথিত যাবতীয় উদ্ভাবন।

পাঁচ। বম্বে, কলকাতা ও অন্যান্য প্রধান ভারতীয় শহরগুলোই হচ্ছে প্রকৃত মহামারীক্ষেত্র।

ছয়। কালকেই যদি ব্রিটিশ শাসনের জায়গা নেয় আধুনিক পদ্ধতির উপর নির্ভর ভারতীয় শাসন তা হলে ভারতের অবস্থা এর চেয়ে ভালো হবে না। তবে যে টাকাটা

ইংলণ্ডে টেনে নেওয়া হচ্ছে তার কিছুটা ভারতে থেকে যাবে। কিন্তু ভারত তখন হবে ইউরোপ অথবা আমেরিকার দ্বিতীয় অথবা পঞ্চম নেশন।

সাত। পূর্ব আর পশ্চিম তখনি সত্যি মিলতে পারবে যখন পশ্চিম ওই আধুনিক সভ্যতাকে প্রায় পুরোপুরি বিসর্জন দেবে। তারা অন্যভাবেও দৃশ্যত মিলতে পারবে, যদি পূর্বমহাদেশও আধুনিক সভ্যতা গ্রহণ করে। কিন্তু সেপ্রকার মিলন হবে সশস্ত্র যুদ্ধবিরতির মতো। যেমন, ধরুন, ইংলণ্ডের সঙ্গে জার্মানীর। উভয় নেশনই মরণশালায় প্রাণধারণ করছে, যাতে এক অপরকে ভক্ষণ না করে।

আট। একজন বা একদল মানুষের পক্ষে সারা দুনিয়ার সংস্কার শুরু করা বা ধ্যান করা নিতান্তই ধৃষ্টতা। অত্যন্ত কৃত্রিম ও বেগবান যানবাহনের দ্বারা এমন কিছু করার চেষ্টাও অসম্ভবকে সম্ভব করার চেষ্টা।

নয়। বস্তুগত স্বাচ্ছন্দ্য বৃদ্ধির দ্বারা নৈতিক বিকাশ হয় না, এটা সাধারণভাবে জাহির করা যেতে পারে।

দশ। চিকিৎসাবিজ্ঞান হচ্ছে ব্ল্যাক ম্যাজিকের ঘনীভূত সারাৎসার। উচুদরের ডাক্তারি দক্ষতা বলে যা চলে তার চেয়ে হাতুড়েগিরি অশেষগুণে শ্রেয়।

এগারো। শয়তান তার রাজত্ব রক্ষা করার জন্যে যেসব হাতিয়ার ব্যবহার করেছে হাসপাতালগুলো হচ্ছে তাই। পাপ, দুর্গতি, অধঃপতন ও প্রকৃত দাসত্বকে চিরন্তন করে তারা। আমি যখন ডাক্তারিতে তালিম হতে চেয়েছিলুম তখন আমি সম্পূর্ণ দিশাহারা হয়েছিলুম। হাসপাতালে যেসব অনাসৃষ্টি ব্যাপার হয় তাতে কোনপ্রকার অংশগ্রহণ করা আমার পক্ষে পাপকর্ম। যৌনব্যাধির জন্যে, এমন কি ক্ষয়রোগের জন্যেও, যদি হাসপাতাল না থাকত তা হলে আমাদের মধ্যে কম ক্ষয়রোগ ও কম যৌনব্যাধি থাকত।

বার। বিগত পঞ্চাশ বছরে ভারত যা শিখেছে তাকে না-শেখাতেই তার পরিত্রাণ। রেলওয়ে, টেলিগ্রাফ, হাসপাতাল, উকিল, ডাক্তার ও সেইরূপ সমস্তকেই যেতে হবে। কৃষকের সরল জীবনই হচ্ছে এমনতর জীবন যাতে সত্যিকারের সুখ, একথা জেনে তথাকথিত উচ্চতর শ্রেণীদের সচেতনভাবে ধর্মোচিত নিষ্ঠার সঙ্গে কৃতসংকল্প হয়ে বাঁচতে শিখতে হবে।

তেরো। ভারতের পক্ষে কলে তৈরী কাপড় পরা অনুচিত, তা সে ইউরোপীয় মিলেরই হোক আর ভারতীয় মিলেরই হোক।

চোদ্দ। ইংলণ্ড ভারতকে এবিষয়ে সাহায্য করতে পারে। তা হলেই ভারতের উপর তার অধিকার অনুমোদনযোগ্য হবে। ইংলণ্ডে আজকাল অনেকে এইমর্মে ভাবেন।

পনেরো। জনগণের বস্তুগত স্বাচ্ছন্দ্যের একটা সীমা বেঁধে দিয়ে সমাজের নিয়ন্ত্রণ করা ছিল প্রাচীন ঋষিদের বিজ্ঞতা। প্রায় পাঁচ হাজার বছরের রুক্ষ লাঙল আজকেও চাষীদের লাঙল। তার মধ্যেই পরিত্রাণ। এই ধরনের অবস্থাতেই মানুষ দীর্ঘকাল বাঁচে। বাঁচে অপেক্ষাকৃত শান্তিতে। তেমনধারা শান্তি ইউরোপ উপভোগ করেনি আধুনিক কার্যকলাপ অবলম্বন করার পর থেকে।...”

উপরোক্ত চিন্তাধারা যে ভারতীয় নয় তা এক আঁচড়ে চেনা যায়। রামমোহন বা বঙ্কিমচন্দ্র, বিবেকানন্দ বা রবীন্দ্রনাথ, গোখলে বা টিলক কেউ সভ্যতার সামনে 'আধুনিক' বলে একটি বিশেষণ বসিয়ে দিয়ে তাকে এককথায় পারিজ করেননি। পূর্ব ও পশ্চিমের বিভিন্ন বা বিপরীত সভ্যতার কথাই তাঁরা ভেবেছেন। কেউ বা চেয়েছেন সমন্বয়, কেউ বা আত্মরক্ষার খাতিরে পাশ্চাত্যকে রোধ করতে বলেছেন।

আসলে ওই চিন্তাধারা ইউরোপেরই ভিন্নমুখী চিন্তাধারা। সবাই যে আধুনিকের পক্ষে তা নয়। বিপক্ষেও বহুলোক। এমন কি সভ্যতা কথাটারও স্বপক্ষে বিপক্ষে বহু ব্যক্তি। প্রকৃতিসম্মত জীবনই সুখ, প্রকৃতির যে যত কাছে সে তত সুখী, এ তত্ত্ব ইউরোপের অষ্টাদশ শতাব্দীর অনেকেই মানতেন। শিল্পবিপ্লবকে ও যন্ত্রপাতিকে ইউরোপের মনীষার একভাগ বরাবর বাধা দিয়েছে। কিছুতেই যখন ঠেকান গেল না, তখন পথ ছেড়ে দিতে হলো।

রাশিয়াতে অপেক্ষাকৃত নতুন বলে টলস্টয় নতুন করে বিরোধিতা করেন। ততদিনে আরো স্পষ্ট হয়েছে যে ক্যাপিটালিজম ফলিত বিজ্ঞানকে লাগিয়েছে আপনার কাজে, সমাজের কাজে নয়। আর ক্যাপিটালিজম নিয়েছে সাম্রাজ্যবাদের রূপ। আর তার দোসর হয়েছে মিলিটারিজম। এমনি করে দেশে দেশে ও শ্রেণীতে শ্রেণীতে যে সংঘাত ধূমায়িত হচ্ছে টলস্টয় বুঝতে পেরেছিলেন যে তার অনিবার্য পরিণাম একদিকে যুদ্ধ ও অপরদিকে বিপ্লব। সময় থাকতে তিনি প্রতিকারচিন্তা করেছিলেন। কিন্তু প্রতিরোধ করতে উদ্যোগী হননি। সে ভারটা পড়ল গান্ধীজীর উপরে।

টলস্টয় একা নন, আরো অনেকের চিন্তাধারা যুদ্ধবিরোধী তথা বিপ্লববিরোধী ছিল। সেইজন্যে আধুনিক সভ্যতাবিরোধী, এমন কি সভ্যতা জিনিসটারই বিরোধী ছিল। কিন্তু চিন্তার উপযোগী কর্মের সন্ধান জানতেন না অনেকেই, যাঁরা জানতেন তাদের কর্মক্ষমতা ছিল না। তাঁদের ভিড় ঠেলে এগিয়ে আসেন গান্ধীজী। তাঁর হাতে সত্যাগ্রহ বলে উপযুক্ত একটি অস্ত্র। আর তাঁর পেছনে অল্পসংখ্যক হলেও একদল সৈনিক।

দক্ষিণ আফ্রিকার সত্যাগ্রহ শুরু হবার দু'বছর পরে ও শেষ হবার পাঁচ বছর আগে 'হিন্দ্ স্বরাজ' পড়ে টলস্টয় আশীর্বাদ করেছিলেন, কিন্তু গোখলে খুশী হননি।

তৎকালীন ভারত সরকার ও বই নিষিদ্ধ করে দেন। গান্ধীজী ভারতে ফিরে এসে নেতৃত্ব নিলে পরে ও বইয়ের উপর নিষেধাজ্ঞা অমান্য করা হয়।

গত শতাব্দীতে ইংরেজী শিক্ষা প্রবর্তনের সময় এক প্রস্থ নতুন মূল্য এসে আমাদের পুরাতন মূল্যগুলিতে ঘা দিয়েছিল। সেটা কাটিয়ে উঠতে না উঠতে আরেক প্রস্থ মূল্য এসে আবার ঘা দিল। এবার নতুন শেখা মূল্যগুলিতে। মহাত্মার দাবী হলো যা শিখেছি তাকে না-শিখতে হবে। স্লেটের লিখন মুছে ফেলতে হবে।

এবারকার অভিযান আধুনিক সভ্যতার বিরুদ্ধে। তার অপরাধ সে বস্তুভিত্তিক। তাতে কেবল বস্তুগত সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যের বৃদ্ধি হতে পারে, কিন্তু নৈতিক বিকাশ হবার নয়। আর মানুষ তো কেবল রুটি খেয়ে বাঁচে না। অন্নের সঙ্গে চাই অমৃত। যাতে তাকে অমৃত করবে না তা নিয়ে সে কী করবে? মৈত্রেয়ীর জিজ্ঞাসা বহুযুগ পরে ঘুরে ফিরে এল।

যীশুর জিজ্ঞাসাও বলতে পারি। তাতে তোমার লাভ কী হবে, যদি তুমি সারা দুনিয়াটা পাও, কিন্তু আপন আত্মাকেই হারাও?

আমাদের যুগেও এ জিজ্ঞাসা বিভিন্ন কণ্ঠে ধ্বনিত হয়েছে। গান্ধীজী স্বয়ং বলেছেন যে 'হিন্দ্ স্বরাজে' প্রকাশিত মতামতগুলি যদিও তাঁর নিজের তবু তিনি বিনম্রভাবে অনুসরণ করতে চেষ্টা করেছেন টলস্টয়, রাস্কিন, থোরো, এমার্সন প্রভৃতি লেখকদের, তা ছাড়া ভারতীয় দর্শনাচার্যদের। বিশেষ করে টলস্টয় বেশ কিছুকাল থেকে তাঁর অন্যতম গুরু।

গান্ধীজীর জিজ্ঞাসাকে মৈত্রেয়ীর বা যীশুর জিজ্ঞাসার মতো একটি বাক্যে সংহত করলে এইরকম দাঁড়ায়—বিজ্ঞানের বরে এত সম্পদ এত বিক্রম নিয়ে তুমি করবে কী, যদি তোমার হৃদয় অসাড় হয়, বিবেক নিষ্ক্রিয় হয়, আত্মা বিকিয়ে যায় ও জীবনযাত্রা হয়ে উঠে যন্ত্রের মতো যান্ত্রিক?

গান্ধীজীর চেয়ে টলস্টয় আরো ভালো করে চিনতেন ইউরোপের আধুনিক সভ্যতাকে। এক জায়গায় তিনি লিখেছেন, এত যে বড়াই করছ তোমার ব্যক্তিস্বাধীনতার, কিন্তু কোথায় থাকে তোমার ব্যক্তিস্বাধীনতা, যখন যুদ্ধের জন্যে তোমাকে ধরে নিয়ে যায়, যখন কনস্‌ক্রিপ্ট হয়ে তুমি মানুষ মারো?

'হিন্দ্ স্বরাজ' রচনার পাঁচ বছর যেতে না যেতেই মহাযুদ্ধ বেধে যায়। রাশিয়া, জার্মানী, ফ্রান্স প্রভৃতি দেশ গোড়া থেকেই কনস্‌ক্রিপশন চালায়। ইংলণ্ড যতদিন সম্ভব এড়ায়, কিন্তু শেষ পর্যন্ত তাকেও তাই করতে হয়। যুদ্ধের প্রয়োজনে ব্যক্তি-স্বাধীনতা বিসর্জন দিতে হয়। গেল তো এমনি করে একটি মূল্য। এমনি করে

আরো কয়েকটি গেল রাশিয়ার দুই বিপ্লবে। তারপর ফাসিস্ট ইটালীতে। তারপরে স্টালিনের রাশিয়ায়। তারপরে হিটলারের জার্মানীতে। তারপরে পারমাণবিক শক্তি-সম্পন্ন আমেরিকায়।

আমার জীবনে গান্ধীজী ও টলস্টয় বলতে গেলে একই সময়ে আসেন। মনে মনে আমি বিষয় বৈরাগী নৈরাজ্যবাদী হয়ে উঠি। জনগণের মধ্যেই দেশের ও নিজের সার্থকতা দেখতে পাই। জীবনের গভীরে তলিয়ে যেতে হলে গ্রামেই যেতে হবে, নগরে নয়। নগরের জীবন বিচিত্র হতে পারে, কিন্তু অগভীর। কারুশিল্প ও কৃষি যা দিতে পারে কলকারখানা কি কখনো পারে? বিত্তের দিক থেকে যা কম পড়বে চিত্তের দিক থেকে পুষিয়ে যাবে।

কোন্‌টা সার কোন্‌টা অসার বেছে নিতে হলে নাগরিক সভ্যতার মায়া কাটাতে হয়। কিন্তু আধুনিক সভ্যতা বলতে কি নাগরিক সভ্যতাই বোঝায়? তার চেয়ে আরো বড়ো কিছু নয়? আধুনিক সভ্যতার সংজ্ঞা কি রেল স্টীমার আদালত হাসপাতাল কলকারখানা শহর? তা যদি হয় তবে সাহিত্য বিজ্ঞান দর্শন চারুশিল্প এরা কোথায় দাঁড়ায়?

বিজ্ঞান যে এতবড়ো আসন জুড়ে বসেছে সে কি শুধু বস্তুগত স্বাচ্ছন্দ্য বহুগুণিত করার জন্যে? না সত্যের সন্ধানে অতন্দ্র থেকে নিত্য নতুন তথ্য ও নিয়ম আবিষ্ক্রিয়ার জন্যে? সাহিত্যিকদেরও চোখে ঘুম নেই। তাঁরাও সজাগ। কিসের জন্যে? সৌন্দর্যের তথা সত্যের অন্বেষণে নয় কি? না কেবল ধনীদের মনোরঞ্জনের জন্যে? চারুকলার সাধকরা যে নব নব পরীক্ষা-নিরীক্ষায় রত তা কি কামিনীর নগ্নতার বিনিময়ে কাঞ্চনের আশায়?

সন্দেহ নেই যে এসব ক্ষেত্রে বিরাট ব্যবসাদারি চলেছে। যেমন ধর্মের ক্ষেত্রে বুজরুকি। কিন্তু গত পাঁচশো বছরের খতিয়ান করলে দেখা যাবে যে মানুষ যদি মধ্যযুগের নিরাপদ বন্দর ছেড়ে অকূলে তরী ভাসিয়ে থাকে তবে তা বস্তুগত সওদাগরির জন্যেই শুধু নয়, অবস্তুগত অচেনা অজানা সত্য ও সৌন্দর্যের অভিনব বন্দরে নতুন করে আশ্রয় নেবার প্রয়োজনেও। আধুনিক সভ্যতা হচ্ছে গতিশীল সভ্যতা। তার বাইরের যানবাহনের গতি হচ্ছে ভিতরের চিন্তাস্রোতের গতি। চেতনাস্রোতের গতি।

গত পাঁচশো বছরের ইতিহাসে অন্ধকারের ভাগ হয়তো বেশী, কিন্তু আলোর ভাগ কি নেহাৎ কম? কী করে আমি আলোর দিক থেকে মুখ ফিরিয়ে কেবল অন্ধকারটাকেই দেখি? আর আলোর মূল্য অস্বীকার করলে কি অন্ধকারের মূল্য বেড়ে যায় না?

অন্তহীন ভাবনার পর যেখানে এসে আমি পৌঁছলুম সেখানে আমি জনগণের পক্ষে,

অহিংসার পক্ষে, গান্ধীজীর পক্ষে, কিন্তু সেইসঙ্গে আধুনিক সভ্যতারও পক্ষে, তার গতিশীলতারও পক্ষে। নিত্য নতুন আইডিয়া, নিত্য নতুন আবিষ্কার, নিত্য নতুন সৃষ্টি না হলে আমি বাঁচব না। ভুলভ্রান্তি করবার যে স্বাধীনতা সে স্বাধীনতা আমার চাই। আধুনিক সভ্যতা এ স্বাধীনতা দিয়েছে। মধ্যযুগের সভ্যতা এ স্বাধীনতা দেয়নি। ধর্মের নামে নীতির নামে কেড়ে নিয়েছে।

ও ছাড়া আর কোনো মীমাংসা আমার পক্ষে—আমার মতো তরুণদের পক্ষে সম্ভব ছিল না। উনবিংশ শতাব্দীতে ইংরেজী শিক্ষা প্রবর্তনের ফলে যে মূল্য পরিবর্তন ঘটেছিল আমরা তার উত্তরাধিকারী। হিসাব করলে আমরা তার চতুর্থ পুরুষ। আমরা আর উজিয়ে যেতে পারতুম না। ইংরেজী স্কুল ছেড়ে দিলেও আমাদের সেই উত্তরাধিকার আমাদের সঙ্গ নিত। জাতীয় বিদ্যালয়েও সে আমাদের সঙ্গে সঙ্গে অনুপ্রবেশ করত।

আমাদের সেই উত্তরাধিকার সূত্রে পাওয়া আধুনিক যুগের তথা পূর্ব-পশ্চিমের মহা-মানবের পরিবর্তিত মূল্যরাজি আমরা কারো কথায় বিসর্জন দিতে পারিনে। রামমোহন থেকে রবীন্দ্রনাথ পর্যন্ত যে ঐতিহ্যে আমরা লালিত হয়েছি তার প্রবাহ কারো কথায় শুকিয়ে যাবার নয়। এ বিষয়ে স্থিরনিশ্চিত হয়ে আমরা গান্ধীজীর প্রবর্তিত আরেক প্রস্থ মূল্য মাথা পেতে নিই। মানুষে মানুষে বিরোধ যদি দেখা দেয় তবে সে বিরোধ অহিংসভাবেই মেটাতে হবে। মেটাতে না পারলে যেটা অনিবার্য হবে সেটা সহিংস সংগ্রাম নয়, অহিংস সংগ্রাম। অহিংসার পেছনে রয়েছে হাজার হাজার বছরের ভারতীয় তথা খ্রীষ্টীয় ঐতিহ্য। প্রাণের প্রতি শ্রদ্ধা থেকে প্রাণীর প্রতি অহিংসা। সত্যও তেমনি মহামূল্যবান। সত্যের পেছনে রয়েছে হাজার হাজার বছরের বিশ্বজনীন ঐতিহ্য। মহাত্মার মধ্যে তারই পরিপূর্ণতা। তিনি দেশের মঙ্গলের জন্যেও অসত্য অবলম্বন করবেন না। তাঁর কার্যকলাপ সকলের সামনে খোলা। সরকারের কাছেও তাঁর গোপনীয় কিছু নেই।

তেমনি জনগণের বঞ্চনার অবসান আমাদেরও কাম্য। স্মরণাতীত কাল থেকে যাদের পায়ের তলায় রাখা হয়েছে তাদের হাত ধরে তুলতে হবে, তুলে পাশে বসাতে হবে, সমান সুযোগ দিতে হবে। সম্ভব হলে সমানের চেয়েও বেশী দিতে হবে, যাতে অতীতের সঞ্চিত অসাম্য দূর হতে পারে। এর জন্য যদি ভাগ্যবান শ্রেণীকে ত্যাগ স্বীকার করতে হয় তো সেটা করতে হবে স্বেচ্ছায় ও সানন্দে। অন্যায় সুবিধে যে যা পেয়েছে তাকে আঁকড়ে ধরে থাকা উচিত নয়। বিপ্লবের দিকে অর্ধেক পথ এগিয়ে যাওয়াই বিপ্লব পরিহারের প্রকৃষ্ট পন্থা। গান্ধীজীরও উদ্দেশ্য তাই। জনগণকে সঙ্গে নিয়ে চললে বিপ্লবের

দরকার হবে না, কারণ বিপ্লব প্রতিবিপ্লবের কাটাকুটির পর যেটুকু শেষপর্যন্ত বাঁচে গান্ধী নেতৃত্ব তার চেয়ে বেশী এনে দেবে।

গান্ধীবাদী রাষ্ট্র যদি নৈরাজ্যের দিকে অর্ধেক পথ যায় তা হলে তো আমাদের কোনো খেদই থাকে না। টলস্টয়ের মতো আমিও ছিলুম রাষ্ট্রমাত্রেরই উপর বিরূপ। স্বাধীনতায় লাভ কী হবে যদি রাষ্ট্র তেমনি থেকে যায়? গান্ধীজীর সঙ্গে আমার মনের মিল অহিংসার জন্যে ততটা নয়, নৈরাজ্যের জন্যে যতটা।

॥ নয় ॥

অথচ এমনি আমার নিয়তি যে আমাকেই কিনা জড়িয়ে পড়তে হলো রাষ্ট্রের সঙ্গে। যে আমি টলস্টয় গান্ধীর প্রভাবে অহিংস নৈরাজ্যবাদী। নিয়তি বোধ হয় আমাকে হাতে কলমে শেখাতে চেয়েছিল যে স্বরাজ্য আর নৈরাজ্য একই মুদ্রার এপিঠ ওপিঠ নয়, স্বরাজ্য হচ্ছে স্বরাষ্ট্র আর স্বরাষ্ট্র যদিও সর্বোদয়ের অভিমুখী তবু তা রাষ্ট্রশূন্যতা নয়।

ইতিমধ্যে আমার শিক্ষানবিশী আমাকে ইংলণ্ডে নিয়ে যায়। সেখানে দু'বছর থাকি ও ছুটি পেলেই ইউরোপের অন্যান্য দেশ ঘুরে আসি। টলস্টয়, রাসকিন প্রভৃতির কথা আমার মনে ছিল। দুঃখের সঙ্গে লক্ষ্য করি যে ইতিহাস তাঁদের শিক্ষা উপেক্ষা করছে, সমুদ্র যেমন উপেক্ষা করছিল রাজা ক্যানিউটের অনুজ্ঞা। প্রথম মহাযুদ্ধের পূর্বে যেমন তাঁদের অনুবর্তীর সংখ্যা অগণ্য ছিল যুদ্ধের দশ বছর পরে তেমন নয়। যুদ্ধ যেন সর্বপ্রকার আদর্শবাদকে অবাস্তব বলে কোণঠাসা করেছে। করেনি কেবল কমিউনিজমকে। কিন্তু কমিউনিজম আদর্শবাদ বলে আপনার পরিচয় দেয় না। কমিউনিজম বলে সে বস্তুবাদ, সে এমন একপ্রকার বস্তুবাদ যা পূর্বনির্ধারিত ঘটনার মতো ইতিহাসে একদিন সম্ভব হবেই।

যন্ত্রের বিরুদ্ধে মানবাত্মার প্রতিবাদ তখনো সাহিত্যের বিষয় ছিল। মানুষ তো একেবারে যন্ত্রদাস বনে যেতে পারে না। যন্ত্রের সঙ্গে জড়িত থেকে যন্ত্র বনতেও তার অনিচ্ছা। সে হবে যন্ত্রী। কিন্তু তেমন সৌভাগ্য আর ক'জনের হয়! ওদিকে আলাদীনের দৈত্যের মতো একালের যন্ত্র চাইবামাত্র যা এনে দিচ্ছে তা কি সেকালের তাঁত চরকার কর্ম! তা ছাড়া এমন সব দরকারী কাজও তো করে দিচ্ছে যা বিনা যন্ত্রে হবার নয়।

প্রাচীনদের জীবনে যেমন তাঁত চরকা কাস্তে হাতুড়ি আধুনিক জীবনে তেমনি বাষ্প বিদ্যুৎ পেট্রল চালিত যন্ত্র। এর হাত থেকে পরিত্রাণের কথা হয়তো একদা বাস্তব ছিল,

এখন অবাস্তব। তাই যন্ত্রের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ অন্তর থেকে উত্থিত হলেও ব্যবহারিক ক্ষেত্রে সকলেই যন্ত্রমুখাপেক্ষী। এমন কি অটোমেটিকেরও যথেষ্ট প্রচলন। তাতে শ্রমিকের দানাপানি বিপন্ন, তবু শ্রমিকরাও তা ব্যবহার করছে। সঙ্গে সঙ্গে সিগারেট বা চকোলেট পাচ্ছে। যন্ত্র ভারতের মাটিতে অপেক্ষাকৃত নতুন ও তার সঙ্গে বিদেশী শাসন শোষণ সংযুক্ত বলে গান্ধীজী তাঁর স্বদেশবাসীর মনে যতটা দাগ কাটতে পেরেছেন টলস্টয় তাঁর স্বদেশবাসীর মনে ততটা নয়। থোরো তো নয়ই। কী ক্যাপিটালিস্ট কী কমিউনিস্ট কী অ্যানার্কিস্ট সবাই এখন যন্ত্রের পক্ষে। যদিও তার বিরুদ্ধে প্রতিবাদও শোনা যায়। ওটা যেন বিশ বছর ঘরসংসার করে সন্তানাদি হওয়ার পর বিবাহের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ।

অথচ কলকারখানার পেছনে কলের মত খেটে ও অবসর সময়ে কলের গান শুনে বা কলের অভিনয় দেখে মানুষের চিত্তবৃত্তি বিকল। একটা যুদ্ধবিগ্রহ পেলে সে যেন বর্তে যায়। কিন্তু সেক্ষেত্রেও কি কলের মতো লড়তে হয় না? মানুষের জীবনযাত্রা গত দুই শতাব্দীর মধ্যে ক্রমে ক্রমে যন্ত্রনির্ভর ও যন্ত্রের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয়েছে। সাধারণত ধনতন্ত্রের আওতায়। কিন্তু সমাজতন্ত্রের আওতায় হলেও মোটামুটি এমনই হতো। সমাজতন্ত্রও নিছক কাস্তে হাতুড়ির ব্যাপার হতো না।

দেখলুম পুরাতন নীতিবোধ আর কাজ দিচ্ছে না। নীতির ক্ষেত্রে এসেছে বিশৃঙ্খলা তেমনি পুরাতন ধর্মবিশ্বাসে সংশয়। সংশয় থেকেও বিশৃঙ্খলা আসে। ইউরোপের সমাজে যে ভাঙন ধরেছে তার জন্যে শিল্পায়ন যথার্থই দায়ী। কৃষি ও কারুশিল্পভিত্তিক সমাজ যদি ধীরে সুস্থে শিল্পায়িত হতো তা হলে হয়তো ভাঙনও হতো ধীর মন্থর। কিন্তু পুঁজিওয়ালাদের লাভের জন্যে বা এক নেশনের সঙ্গে আরেক নেশন পাল্লা দিতে গিয়ে শিল্পায়নের গতি এত দ্রুত হয়েছে যে কৃষি ও কারুশিল্পভিত্তিক সভ্যতার ভিত্তিমূলে আঘাত লেগে তার ভাঙন ত্বরান্বিত হয়েছে। ইংলণ্ডের যেখানে দুই শতক লেগেছে জার্মানী সেখানে দুই শতকের পথ অর্ধ শতকে অতিক্রম করতে গিয়ে অনর্থ ডেকে এনেছে। মহাযুদ্ধের পরেও কি তার শিক্ষা হয়েছে? কারোরই না।

শিল্পায়নের ঘাড়ে কিন্তু সবটা দায়িত্ব চাপানো যায় না। তার পূর্বেই সমাজবিপ্লবের আইডিয়া ফ্রান্সে ও জার্মানীতে বাসা বেঁধেছিল। অর্ধশতকের পূর্বের অর্ধশতক মনোজগতের ঘাতপ্রতিঘাতে মুখর। আরো অর্ধশতক পিছিয়ে গেলে পাওয়া যাবে ফরাসী বিপ্লব। তার আদিতে ছিল অবিমিশ্র রাষ্ট্রবিপ্লবের সংকল্প। ধাপে ধাপে এল সমাজবিপ্লবের চিন্তা। সেটা যদিও তখনকার মতো ব্যর্থ হলো তবু তার বীজ বুনে রেখে গেল ভাবীকালের জন্যে।

বিংশ শতাব্দীর গাছপালার মূল অষ্টাদশ শতাব্দীতে এমন কি ফরাসীবিপ্লবেরও আগে। ইংলণ্ডেরও দান কম নয়। রাজার মুণ্ড তো ওরাই প্রথম কাটে। ফরাসীরা তার দেড় শতক বাদে। রুশরা আরো দেড় শতক পরে। রাজাই হলেন ফিউডাল সমাজের মাথা। তাঁর মাথা নেওয়া মানে ফিউডাল সমাজের মাথা নেওয়া। সে সমাজ তার পরে বাঁচে কি করে? অভিজাতদের প্রাধান্য যায়। বুর্জোয়াদের প্রাধান্য আসে। রুশদেশে তো বুর্জোয়াদেরও প্রাধান্য যায়।

আমি যে সময় ইউরোপে ছিলুম সেটা বাইরের দিক থেকে শান্ত হলেও ভিতরে ভিতরে অশান্ত। নতুন শৃঙ্খলার জন্যে মানুষ উতলা হয়ে উঠেছিল। নতুন শৃঙ্খলা বলতে মধ্যযুগের খ্রীষ্টীয় শৃঙ্খলার পুনরাবর্তন বোঝায় না। নতুন বলতে যা বোঝায় তা পুরানোর রকমফের নয়। সত্যিকার নতুন শৃঙ্খলায় থাকবে রেনেসাঁসের মানবিকতা, ফরাসীবিপ্লবের সাম্য-মৈত্রী স্বাধীনতা, শ্রমবিপ্লবের শিল্পায়ন, রুশবিপ্লবের সামাজিক ন্যায়, ইংলণ্ডের গণতন্ত্র ও আইনের শাসন, আমেরিকার সেকুলারিজম।

কিন্তু মার্স ও ম্যামনের আরাধনা যদি সমানে চলতে থাকে তা হলে আর নতুন শৃঙ্খলা কী হলো! দু'দিন আগেই হোক, পরেই হোক, মানুষ মোহমুক্ত হয়ে আবার তেমনি প্রশ্ন করবে, বিজ্ঞানের বরে এত সম্পদ এত বিক্রম নিয়ে আমরা করব কী, যদি আমাদের হৃদয় হয় অসাড়, বিবেক হয় নিষ্ক্রিয়, আত্মা বিকিয়ে যায় ও জীবনযাত্রা হয়ে হয়ে ওঠে যন্ত্রের মতো যান্ত্রিক? কী করতে এ জগতে আসা, কেনই বা অপঘাতে মরা, অমরত্ব কি নিশ্চিত, না এখানেই সব শেষ? ঈশ্বর কি আছেন, না শয়তান আমাদের রাজত্ব দিয়ে ভোলাচ্ছে, যেমন ভোলাতে চেয়েছিল যীশুকে? প্রগতি যাকে বলছি তা কি গতিতেই নিবদ্ধ, না তার আছে একটা অন্তিম লক্ষ্য? অন্তহীন প্রগতি কি একটা মীনস, না একটা এণ্ড?

টলস্টয় তাঁর জীবনে সাফল্যের উচ্চতম শিখরে আরোহণ করে দেখেন সব অন্তঃসার-শূন্য, সব ঝুটা। খ্রীষ্টের জীবনই তাঁকে বাঁচার প্রেরণা জোগায়, নইলে আত্মহত্যা করতেন। সেই সঙ্গে বুদ্ধের শিক্ষা। অহিংসা ও প্রেমই তাঁকে শান্তি দেয়। জীবনযাত্রাকে সরল করে এনেই তিনি জীবনের তাৎপর্য পান। তাঁর মৃত্যুর পূর্বে তিনি গান্ধীকে যে শেষ চিঠি লেখেন সে চিঠি যেন তাঁর শেষ টেস্টামেন্ট। ওইভাবে গান্ধীকেই যেন তিনি দিয়ে যান তাঁর জীবনের ব্রত, তাঁর নৈতিক ও আধ্যাত্মিক উত্তরাধিকার। তাতে ছিল—

"The longer I live, and especially now, when I vividly feel the nearness of death, I want to tell others what I feel so particularly

clearly and what to my mind is of great importance, namely, that which is called 'passive resistance,' but which is in reality nothing else than the teaching of love uncorrupted by false interpretations. That love, which is the striving for the union of human souls and the activity derived from it, is the highest and only law of human life, and in the depth of his soul every human being—as we most clearly see in childern—feels and knows this; he knows this until he is entangled by the false teachings of the world. This law was proclaimed by all—by the Indian as by the Chinese, Hebrew, Greek and Roman sages of the world. I think this law was most clearly expressed by Christ, who plainly said, 'In love alone is all the law and the prophets'...

'He knew, as every sensible man must know, that the use of force is incompatible with love as the fundamental law of life, that as soon as violence is permitted, in whichever case it may be, the insufficiency of the law of love is acknowledged, and by this the very law of love is denied. The whole Christian civilization, so brillinat outwardly, grew up on this self-evident and strange misunderstanding and contradiction, sometimes conscious but mostly unconscious."

টলস্টয়ের আশী বছরের অভিজ্ঞতা ও চিন্তার শেষ পরিণতি সেই চিঠিতে ছিল এই ভবিষ্যবাণী—

"In acknowledging Christianity even in that corrupt form in which it is professed among the Christian nations, and at the same time in acknowledging the necessity of armies and armament for killing on the greatest scale in wars, there is such a clear clamouring contradiction that it must sooner or later, possibly very soon, inevitably reveal itself and annihilate either the professing of the Christian religion, which is indispensable is keeping up these forces, or the existence of armies and the violence kept up by them, which is not less necessary for power..."

টলস্টয়ের নিজের দেশ তাঁর মৃত্যুর সাত বছর বাদে এই দোটানার অবসান ঘটায় খ্রীষ্টধর্মকে—ধর্ম জিনিসটাকেই—জনগণের মাদক বলে বিসর্জন দিয়ে। সেই সঙ্গে ঈশ্বর-বিশ্বাসকেও। সোভিয়েট রাশিয়া সোজাসুজি নাস্তিক বনে যায়। সে আর প্রেমের নিয়মে বিশ্বাস করে না। বিশ্বাস করে হিংসার নিয়মে। ফলে একদিক থেকে সে ভারমুক্ত হয়েছে। বিবেকভারমুক্ত। হৃদয়ভারমুক্ত। তাকে আর ঈশ্বরের কাছে বা প্রেমাবতারের কাছে জবাবদিহি করতে হয় না। কেউ বলতে পারে না যে তার কথায় ও কাজে অসঙ্গতি আছে বা সে ভণ্ড। সমস্তক্ষণ একটা দোটানায় পড়ে তার মানসিক স্বাস্থ্য নষ্ট হচ্ছে না। সে দেহে মনে সুস্থ।

পশ্চিম ইউরোপের দেশগুলির সম্পর্কে একথা বলা চলে না। এরা না পারে খ্রীষ্টে বা ঈশ্বরের বিশ্বাস হারাতে, না পারে মার্স বা ম্যামনের আরাধনায় বিরত হতে। কিন্তু ইতিমধ্যে এদের বিস্তর লোক কায়মনে পেগান হয়ে গেছে। যেমন ইটালীর ফাসিস্টরা, জার্মানীর নাৎসীরা। তারা এখন রোমান বা টিউটন পূর্বপুরুষদের মতো প্রাক্খ্রীষ্টান ঐতিহ্যে বিশ্বাসী। খ্রীষ্টের কাছে বা ঈশ্বরের কাছে তাদের কোনো জবাবদিহি নেই। তারা নির্বিবেকে নরহত্যা করতে পারে। রক্তেই তাদের উল্লাস। টলস্টয় বোধহয় স্বপ্নেও ভাবতেও পারেননি যে দোটানার এটাও একটা সমাধান। আর এ সমাধান কমিউনিজমেরই প্রতিক্রিয়া। ইউরোপের একপ্রান্তের খ্রীষ্টান যদি কমিউনিস্ট হয় অপর প্রান্তের খ্রীষ্টান ফাসিস্ট বা নাৎসী হবে। অমনি করে খ্রীষ্টের তথা ঈশ্বরের টান কাটাবে। তখন একমাত্র টান হিংসার।

এদের বাদ দিলে যারা থাকে তারা এখনো এরকম কোনো সমাধানে সম্মত নয়। তারা শ্যামও রাখবে, কুলও রাখবে। তাই তারা জীবনদর্শনে অতৃপ্ত, জীবনযাত্রায় অসুখী, জীবনের আভ্যন্তরিক স্ববিরোধে ও অর্থহীনতায় অসুস্থ। এমন অবস্থার অন্য নাম malaise বা জীবনজোড়া অস্বস্তি। বৃত্তি কাজ করছে, বুদ্ধি কাজ করছে, কিন্তু সত্তায় অবসাদ।

টলস্টয়ের সেই চিঠিতে আরো একপ্রকার ভবিষ্যদ্বাণী ছিল। যদিও অতটা স্পষ্ট নয়। গান্ধীই বুঝতে পেরেছিলেন তার মর্ম। লিখেছিলেন ঋষি—

"Therefore, your activity in the Transvaal, as it seems to us, at this end of the world, is the most essential work, the most important of all the work now being done in the world, wherein not only the nations of the Christian, but of all the world, will unavoidably take part."

clearly and what to my mind is of great importance, namely, that which is called 'passive resistance,' but which is in reality nothing else than the teaching of love uncorrupted by false interpretations. That love, which is the striving for the union of human souls and the activity derived from it, is the highest and only law of human life, and in the depth of his soul every human being—as we most clearly see in childern—feels and knows this ; he knows this until he is entangled by the false teachings of the world. This law was proclaimed by all—by the Indian as by the Chinese, Hebrew, Greek and Roman sages of the world. I think this law was most clearly expressed by Christ, who plainly said, 'In love alone is all the law and the prophets'···

'He knew, as every sensible man must know, that the use of force is incompatible with love as the fundamental law of life , that as soon as violence is permitted, in whichever case it may be, the iusufficiency of the law of love is acknowledged, and by this the very law of love is denied. The whole Christian civilization, so brillinat outwardly, grew up on this self-evident and strange misunderstanding and contradiction, sometimes conscious but mostly unconscious."

টলস্টয়ের আশী বছরের অভিজ্ঞতা ও চিন্তার শেষ পরিণতি সেই চিঠিতে ছিল এই ভবিষ্যদ্বাণী—

"In acknowledging Christianity even in that corrupt form in which it is professed among the Christian nations, and at the same time in acknowledging the necessity of armies and armament for killing on the greatest scale in wars, there is such a clear clamouring contradiction that it must sooner or later, possibly very soon, inevitably reveal itself and annihilate either the professing of the Christian religion, which is indispensable is keeping up these forces, or the existence of armies and the violence kept up by them, which is not less necessary for power···"

টলস্টয়ের নিজের দেশ তাঁর মৃত্যুর সাত বছর বাদে এই দোটানার অবসান ঘটায় খ্রীষ্টধর্মকে—ধর্ম জিনিসটাকেই—জনগণের মাদক বলে বিসর্জন দিয়ে। সেই সঙ্গে ঈশ্বর-বিশ্বাসকেও। সোভিয়েট রাশিয়া সোজাসুজি নাস্তিক বনে যায়। সে আর প্রেমের নিয়মে বিশ্বাস করে না। বিশ্বাস করে হিংসার নিয়মে। ফলে একদিক থেকে সে ভারমুক্ত হয়েছে। বিবেকভারমুক্ত। হৃদয়ভারমুক্ত। তাকে আর ঈশ্বরের কাছে বা প্রেমাবতারের কাছে জবাবদিহি করতে হয় না। কেউ বলতে পারে না যে তার কথায় ও কাজে অসঙ্গতি আছে বা সে ভণ্ড। সমস্তক্ষণ একটা দোটানায় পড়ে তার মানসিক স্বাস্থ্য নষ্ট হচ্ছে না। সে দেহে মনে সুস্থ।

পশ্চিম ইউরোপের দেশগুলির সম্পর্কে একথা বলা চলে না। এরা না পারে খ্রীষ্টে বা ঈশ্বরের বিশ্বাস হারাতে, না পারে মার্স বা ম্যামনের আরাধনায় বিরত হতে। কিন্তু ইতিমধ্যে এদের বিস্তর লোক কায়মনে পেগান হয়ে গেছে। যেমন ইটালীর ফাসিস্টরা, জার্মানীর নাৎসীরা। তারা এখন রোমান বা টিউটন পূর্বপুরুষদের মতো প্রাক্‌খ্রীষ্টান ঐতিহ্যে বিশ্বাসী। খ্রীষ্টের কাছে বা ঈশ্বরের কাছে তাদের কোনো জবাবদিহি নেই। তারা নির্বিবেকে নরহত্যা করতে পারে। রক্তেই তাদের উল্লাস। টলস্টয় বোধহয় স্বপ্নেও ভাবতেও পারেননি যে দোটানার এটাও একটা সমাধান। আর এ সমাধান কমিউনিজমেরই প্রতিক্রিয়া। ইউরোপের একপ্রান্তের খ্রীষ্টান যদি কমিউনিস্ট হয় অপর প্রান্তের খ্রীষ্টান ফাসিস্ট বা নাৎসী হবে। অমনি করে খ্রীষ্টের তথা ঈশ্বরের টান কাটাবে। তখন একমাত্র টান হিংসার।

এদের বাদ দিলে যারা থাকে তারা এখনো এরকম কোনো সমাধানে সম্মত নয়। তারা শ্যামও রাখবে, কুলও রাখবে। তাই তারা জীবনদর্শনে অতৃপ্ত, জীবনযাত্রায় অসুখী, জীবনের আভ্যন্তরিক স্ববিরোধে ও অর্থহীনতায় অসুস্থ। এমন অবস্থার অন্য নাম malaise বা জীবনজোড়া অস্বস্তি। বৃত্তি কাজ করছে, বুদ্ধি কাজ করছে, কিন্তু সত্তায় অবসাদ।

টলস্টয়ের সেই চিঠিতে আরো একপ্রকার ভবিষ্যদ্বাণী ছিল। যদিও অতটা স্পষ্ট নয়। গান্ধীই বুঝতে পেরেছিলেন তার মর্ম। লিখেছিলেন ঋষি—

"Therefore, your activity in the Transvaal, as it seems to us, at this end of the world, is the most essential work, the most important of all the work now being done in the world, wherein not only the nations of the Christian, but of all the world, will unavoidably take part."

দক্ষিণ আফ্রিকার সত্যাগ্রহ তখনো বেশীদূর এগোয়নি। তার সিদ্ধি তখনো সুদূর ও অনিশ্চিত। তথাপি টলস্টয়ের শ্যেন দৃষ্টিতে ধরা পড়েছিল যে গান্ধীজীর কাজই পৃথিবীর সব চেয়ে সারবান, সব চেয়ে গুরুত্বপূর্ণ কাজ, যাতে একদিন খ্রীষ্টান নেশনগুলি কেবল নয়, সারা জগতের নেশন সমূহ অপরিহার্যরূপে অংশ নেবে।

ইউরোপে সেদিন আমি তেমন কোনো লক্ষণ দেখিনি। তবে অনেকের সঙ্গে আলাপ করে বুঝেছি তাঁরা হিংসা প্রতিহিংসায় ক্লান্ত। তাঁরা চান চিরতরে শান্তি। কিন্তু শান্তি চাইলেও তো আর অমনি মেলে না। তার জন্য জীবনযাত্রাকে ঢেলে সাজাতে হয়। ধনদেবের উপাসনা করলে রণদেবও আপনি এসে উপস্থিত হন। তিনিও উপাসনা দাবী করেন। ধনতন্ত্রকে অক্ষুণ্ণ রেখে যুদ্ধ এড়ানো যায় কি?

আধুনিক সভ্যতা না বলে আধুনিক ধনতন্ত্র বললে গান্ধীজীর নিদাননির্ণয় আরো যথার্থ হতো। ব্রিটেনকে যে ব্যাধিতে ধরেছে, যে ব্যাধি সে ভারতে সংক্রামিত করেছে তার নাম আধুনিক ধনতন্ত্রবাদ। মাঝে মাঝে ব্যাধিগ্রস্তের সাংঘাতিক অবস্থা হয়। তাকে বলা হয় অর্থনৈতিক মন্দা। ও জিনিস যুদ্ধবিগ্রহের চেয়ে কম দুঃসহ নয়। মন্দায় আক্রান্ত দেশ বরং যুদ্ধকেই কম মন্দ বলে বরণ করবে, তবু অর্থনীতিকে ঢেলে সাজবে না। রেখে দাও তোমার রাস্‌কিন ও তাঁর 'আণ্টু দিস লাস্ট'। যার গুজরাতি তর্জমার নাম 'সর্বোদয়'। যুদ্ধপ্রস্তুতি যতদিন চলে ততদিন মন্দার প্রকোপ থাকে না। তাই ধনতন্ত্রের সঙ্কটে রণতন্ত্রই ভরসা। তার উপর যদি একটা যুদ্ধ বেধে যায় তো কোথায় মন্দা! ধনতন্ত্র আর রণতন্ত্র তখন দক্ষিণ হস্ত আর বাম হস্তের মতো পরস্পরকে সাহায্য করে।

এই যে জুটি এ জুটি ভাঙবে কে? মার্কস ভবিষ্যদ্বাণী করে রেখেছিলেন, এ জুটি ভাঙিবে যে গোকুলে বাড়িছে সে। তার নাম সমাজবিপ্লব। তাঁর সে ভবিষ্যদ্বাণী রাশিয়ার মতো এক সামরিকবাদী বিরাট দেশে ফলে যায়। তার থেকে ধারণা জন্মায় যে সর্বত্র ফলবে। তার দেখাদেখি আরো কয়েকটি দেশে বিপ্লবের চেষ্টা হয়। ব্যর্থ চেষ্টা। কিন্তু ধারণাটা কায়েমী হয়। তাই ইউরোপের বহু দেশে প্রতিবিপ্লবী ধারণাও শক্তি সঞ্চয় করে।

তবে ইংলণ্ডের মতো যেদেশে পার্লামেন্টারি ঐতিহ্য অতি গভীর সেদেশে বিপ্লব বা তার বিরোধী শক্তি কোনোটাই পার্লামেন্টের বাইরে গিয়ে বল কষাকষি করার ছল পায় না। পার্লামেন্টই তাদের ভিতরে ডেকে এনে বলপরীক্ষার সুযোগ দেয়। আমার দেশে ফিরে আসার মাসকয়েক আগে এই দৃশ্য প্রত্যক্ষ করি ইংলণ্ডের সাধারণ নির্বাচনের সময়। আমাকে অবাক করে দিয়ে লেবার পার্টি জয়লাভ করে। আরো অবাক হই যখন দেখি যে বুর্জোয়ারা তাতে সুখী না হলেও খেলোয়াড়ের মতো পরাজয় মেনে নিয়েছে। শ্রমিক

মন্ত্রীদের মনে সন্দেহ ছিল সিভিল সার্ভিস সহযোগিতা করবে কি না। সন্দেহ অচিরেই দূর হলো।

দেশে যখন ফিরি তখন ইংলণ্ড আর তার পার্লামেণ্টারি ঐতিহ্য আর তার সিভিল সার্ভিস সম্বন্ধে উচ্চ ধারণা নিয়েই ফিরি। ভারতে কি ওসব ভদ্রভাবে প্রবর্তন করা যায় না? সংগ্রাম বিনা কি গতি নেই? দুই শতাব্দী ধরে পরিচয় কি দুই পক্ষকে সন্ধির জন্যে প্রস্তুত করেনি? পার্লামেন্টের বাইরে গিয়ে বিপ্লব বা বিদ্রোহ বা সত্যাগ্রহ একটা না একটা কিছু না করলেই নয়?

দেশের নেতারাও ইংলণ্ডকে পরখ করে দেখতে চান। তার আগে কিছু করবেন না। তাঁরা সাইমন কমিশনের সঙ্গে সম্মানের সঙ্গে সহযোগিতার পথ না পেয়ে অসহযোগ করেছেন। তারপরে নিজেরাই মিলেমিশে নিজেদের দেশের জন্যে একটা পার্লামেণ্টারি সংবিধান রচনা করেছেন। তাতে ইংলণ্ডের মুখ চেয়ে ডোমিনিয়ন স্টেটাস অঙ্গীকৃত করেছেন। কিন্তু তার জন্যে মেয়াদ নির্দেশ করেছেন একটি বছর। একবছর পূর্ণ হতে আর মাস তিনেক দেরি। এর মধ্যে যদি মোতিলাল নেহেরু রিপোর্ট ব্রিটিশ পার্লামেণ্ট গ্রহণ করে তো ভারত হবে একটি স্বশাসিত ডোমিনিয়ন। আর নয়তো পরের বছর থেকে পূর্ণ স্বাধীনতার দাবীতে জাতীয় সংগ্রাম শুরু হবে।

কিন্তু লক্ষণ তেমন সুবিধের নয়। আর সব দল একমত হলেও মুসলমানদের একটি প্রভাবশালী দল পরিষ্কার জানিয়ে দিয়েছে যে স্বতন্ত্র নির্বাচন পদ্ধতি মুসলমানরা কিছুতেই ছাড়বে না, তারা নাছোড়বান্দা। আর তারা চায় ফেডারেশন, সর্বময় কর্তৃত্ব যাতে কেন্দ্রীয় সরকারের হাতে না পড়ে, হিন্দুপ্রধান কেন্দ্র যাতে মুসলিম প্রধান প্রদেশগুলোর উপর একচ্ছত্র না হয়। এখন ব্রিটিশ পার্লামেণ্ট কার কথা শুনবে? মুসলমানদের সম্মতি না নিয়ে কি নতুন সংবিধান প্রবর্তন করা যায়?

বড়লাট লর্ড আরউইন ব্রিটিশ সরকারের মন জেনে এসে ঘোষণা করেন যে, ভারতবর্ষের শাসনতান্ত্রিক প্রগতির চরম লক্ষ্য ডোমিনিয়ন স্টেটাস। সে বিষয়ে আলাপ আলোচনার উদ্দেশ্যে লণ্ডনে গোল টেবিল বৈঠক বসবে। ভারতের নেতাদের নিমন্ত্রণ করা হবে। বড়লাট কিন্তু ঠিক করে বলতে পারলেন না কবে ডোমিনিয়ন স্টেটাস ভূমিষ্ঠ হবে। কতকাল পরে।

বর্ষশেষ ও নববর্ষের মধ্যবর্তী মধ্যরাত্রে লাহোর কংগ্রেস ডোমিনিয়ন স্টেটাসকে রাভী নদীর জলে ভাসিয়ে দিয়ে পূর্ণ স্বরাজের প্রস্তাব গ্রহণ করে ও সংগ্রামের নেতৃত্ব দেয় গান্ধীজীকে।

॥ উনিশ ॥

দক্ষিণ আফ্রিকায় গান্ধীজীর সত্যাগ্রহ সমাপ্ত হলে অধ্যাপক গিলবার্ট মারে তাঁর সম্বন্ধে হিবার্ট জর্নাল নামক দার্শনিক পত্রে লেখেন ১৯১৪ সালে—

"Persons in power should be very careful how they deal with a man who cares nothing for sensual pleasure, nothing for riches, nothing for comfort or praise or promotion, but is simply determined to do what he believes to be right. He is a dangerous and uncomfortable enemy, because his body which you can always couquer, gives you so little purchase upon his soul."

এই বিপজ্জনক ও আরামনাশা শত্রুটির সঙ্গে লড়াই করা বড়ো বড়ো সেনাপতিদের কর্ম নয়। এঁকে ধরে নিয়ে জেলে পুরে দিলে তো এঁরই ইচ্ছামতো কাজ হয়। দেশের লোক তাতে ভয় পেয়ে যায় না। বরং ভয় কাটিয়ে ওঠে। তাদের ভয় যতই কমে সরকারের অথরিটিও ততই কমে। সঙ্গে সঙ্গে মহাত্মার অথরিটি বেড়ে যায়।

গান্ধীজীর স্ট্র্যাটেজি ছিল একই, ট্যাকটিক্স এক এক সময় এক এক রকম। তিনি চেয়েছিলেন লোকের রাজভয় ভেঙে যায়। লোকে শুধু হাতে সরকারী অথরিটির মুখোমুখি হতে পারে। নির্ভয়ে 'না' বলতে পারে। অকাতরে শাস্তি বরণ করতে পারে। অথচ মারের বদলে মার না দেয়। ক্ষতির বদলে ক্ষতি না করে। সরকারকে অমান্য করতে গিয়ে গান্ধীজীকে—তাঁর নির্দেশকে—অমান্য না করে। তাঁর নির্দেশ অহিংসা রক্ষা করা।

সরকারকে অমান্য করতে গিয়ে গান্ধীজীকে অমান্য করা মানে তাঁর অথরিটি না মানা। সেটাই তাঁর পক্ষে সব চেয়ে পীড়াকর। না সরকারের অথরিটি, না লোকনায়কের অথরিটি কোনো অথরিটিই যদি কেউ না মানে তবে তো তার নাম স্বরাজ নয়, তার নাম অরাজকতা। অরাজকতা তাঁর অভিপ্রেত নয়। যদিও পরাধীনতার চেয়ে অরাজকতাও ভালো। কিন্তু তার জন্যে গান্ধীনেতৃত্বের কী প্রয়োজন? গুণ্ডানেতৃত্বই যথেষ্ট।

চৌরিচৌরা গান্ধীজীকে নিদারুণ পীড়া দিয়েছিল। তাঁর অথরিটির কানাকড়ি মূল্য নেই দেখে তিনি তাঁর চাল ফিরিয়ে নিতে বাধ্য হন। তা বলে কি তিনি বার বার চাল

ফিরিয়ে নেবেন নাকি ? এত বড়ো দেশে দুটো একটা চৌরিচৌরা এমন কিছু অস্বাভাবিক ব্যাপার নয়। তা ছাড়া প্ররোচক চররাও তো তেমন কিছু বাধিয়ে দিতে পারে। যাতে গান্ধী তাঁর আন্দোলন প্রত্যাহার করতে বাধ্য হন।

পূর্ণ স্বাধীনতা প্রস্তাব তো পাশ হয়ে গেল। এবার গান্ধীজী কী করবেন ? আর বারের মতো বারদোলি তহশিল থেকে আরম্ভ করে ভারতের সব ক'টা তহশিলকে একে একে শাসনমুক্ত করা ? গান্ধীজী কাউকে কিছু জানতে দেন না। এবার তিনি কী করবেন তা তিনিও কি জানেন ?

তিনি সহিংস বিপ্লবীদের কাছে আবেদন করেন যে তাঁরা যেন তাঁদের কার্যকলাপ স্থগিত রাখেন ও তাঁকে একটা সুযোগ দেন। তাঁর অহিংস কার্যকলাপে তাঁদের সহিংস কার্যকলাপ যে ব্যাহত হয় সেটা ঠিক, কিন্তু তাঁদের সহিংস কার্যকলাপে তাঁর অহিংস কার্যকলাপ আরো বেশী ব্যাহত হয়। সেইজন্যে লর্ড আরউইনের রোষের চেয়ে তিনি সহিংস বিপ্লবীদের ভয় করেন বেশী।

চৌরিচৌরার চেয়ে শতগুণ গুরুত্বপূর্ণ চট্টগ্রাম অস্ত্রাগার লুণ্ঠন। কিন্তু সেটা যেদিন ঘটে তার আগেই গান্ধীজী তার দাণ্ডী অভিযান শুরু করে দিয়েছেন ও অভিযানের অন্তে সমুদ্রের তীরে একমুঠো প্রাকৃতিক লবণ তুলে নিয়ে লবণ আইন ভঙ্গ করেছেন। সারা ভারত যেন এই সঙ্কেতটির জন্যে অপেক্ষা করছিল। সর্বত্র লবণ তৈরি করে আইন ভঙ্গ করা চলল। চট্টগ্রামের অস্ত্রাগার লুণ্ঠন ঘটে আঠারোই এপ্রিল। ততদিনে অহিংস সংগ্রাম ভারতময় ছড়িয়ে গেছে ও তাকে প্রত্যাহার করা কারো সাধ্য নয়। তেমন ইচ্ছাও নেই কারো।

গান্ধীজীকে তখনো গ্রেপ্তার করা হয়নি বোধহয় এই আশায় যে তিনি আরো বড়ো অনর্থের আশঙ্কায় তার সত্যাগ্রহ থেকে নিবৃত্ত হবেন, কিন্তু তিনি এযাত্রা প্রতিজ্ঞা করে বেরিয়েছেন যে, "হয় আমি যা চাই তা নিয়ে ফিরব, নয় আমার মৃতদেহ সমুদ্রের জলে ভাসবে।"

নুন যে সমুদ্রকূল ছাড়া আরো অনেক জায়গায় তৈরি করা যায় আমরা কেউ অত জানতুম না। জলা জমি, লোনা জমি দেশের সব জেলায় কিছু কিছু মেলে। সত্যা-গ্রহীরা খুঁজে পেতে সেসব জায়গায় গিয়ে জোটে। নুন হয়তো নয়, তবু নোনতা লাগে জিবে। আর যায় কোথা ? অমনি গ্রেপ্তার। ওরাও তো তাই চায়। যাতে জেল গুলজার হয়। মেয়েরাও দলে দলে জেলপথের যাত্রী হয়। কর্তাদের পক্ষে মহাসমস্যা।

সঙ্গে সঙ্গে চলে বিদেশী কাপড় বয়কট আর মদের দোকানে পিকেটিং। এত দূর গড়ায় যে, বস্ত্রের দোকানদাররা কংগ্রেসের কথায় ওঠে বসে, সরকারের কথায় নয়।

কংগ্রেসের অথরিটি বাড়ে, সরকারের অথরিটি কমে। গান্ধীজী যেমনটি চেয়েছিলেন। সবাইকে অবাক করে দেয় উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশের পাঠানরা। তাদের ত্যাগ-স্বীকার দেখে গড়ওয়ালী ফৌজ গুলী করতে অস্বীকার করে। পেশোয়ার কিছুদিনের জন্যে ব্রিটিশ শাসনের বাইরে চলে যায়। খান আবদুল গফর খান্ সীমান্ত গান্ধী বলে প্রখ্যাত হন। মুসলমানরা গান্ধীর সঙ্গে নেই, এই প্রচারকার্যের বুকে শেল বেঁধে আর হিন্দুরা মুসলমানদের জাত শত্রু এই অপপ্রচারের আঁতে ঘা লাগে।

ধরাসনার নিমক গোলায় অহিংস হানাদারদের উপর যে অমানুষিক লোহাবসানো লাঠি চার্জ হয় ও তারাও যে বীরোচিতভাবে তার সম্মুখীন হয় তার প্রত্যক্ষদর্শী ছিলেন প্রসিদ্ধ মার্কিন সাংবাদিক ওয়েব মিলার। ভারত সরকারের সেন্সরশিপ এড়ানোর জন্যে আমার যতদূর মনে পড়ে তিনি ইরানে যান ও সেখান থেকে যেসব রোমহর্ষক সংবাদ পরিবেশন করেন তা দুনিয়া জুড়ে তেরশো পঞ্চাশখানা সংবাদপত্রে প্রকাশিত হয়। ওয়েব মিলার তাঁর আঠারো বছরের সাংবাদিক অভিজ্ঞতায় বিশটি দেশে শত শত দাঙ্গা-হাঙ্গামা রাস্তায় রাস্তায় লড়াই বিদ্রোহ ইত্যাদি দেখেছেন, কিন্তু এমন হৃদয়বিদারক দৃশ্য দেখেননি।

মেদিনীপুরের কাহিনী আমরা জানি। বারদোলি ও অন্যান্য অঞ্চলে যে খাজনা বন্ধ আন্দোলন হয় তার ফলে বহু কৃষক সর্বস্বান্ত হয়ে ঘরবাড়ি ছেড়ে বড়োদা রাজ্যে চলে যায়। খাজনা বন্ধ আন্দোলন যুক্তপ্রদেশে ও অন্যান্য এলাকায় ছড়িয়ে যায়। এমনি করে হয় কৃষক জাগরণ। শ্রমিক জাগরণও সঙ্গে সঙ্গে চলছিল। সবসুদ্ধ এক লাখ সত্যাগ্রহী কারাবরণ করে। তাদের মধ্যে বহু নারী। কারো কারো কোলে শিশু।

লবণ সত্যাগ্রহ একবছরেরও কম সময় নিয়েছিল। এই অল্প সময়ের মধ্যে যে আলোড়ন ঘটে গেল তা দেখে রামানন্দ চট্টোপাধ্যায়ের মতো স্থিতধী সমালোচক মন্তব্য করেন যে এই আন্দোলনের ফলে ভারতীয়মাত্রেরই উচ্চতা বেড়ে গেছে। আমিও সেটা অনুভব করি। দেশের লোক স্বাধীন না হোক নির্ভীক হয়েছে। দুর্ভোগ বহন করতে এগিয়ে এসেছে। নেতার আদেশ মান্য করতে ও আসমুদ্র হিমাচল একসঙ্গে পা ফেলতে শিখেছে।

এদেশের ইউরোপীয়রা এই নবজাত চেতনা সহ্য করতে না পেরে আবদার ধরে যে আরো কড়া হাতে দমন করতে হবে। এর উত্তরে বড়লাট আরউইন বলেন,

"However emphatically we may condemn the civil disobedience movement, we should, I am satisfied, make a profound mistake, if we under-estimate the genuine and powerful meaning of nationa-

lism that is to-day animating much of Indian thought and for this no complete or permanent cure had ever been or ever will be found in strong action by the Government."

এই সাধুপ্রকৃতির খ্রীষ্টান যে সে-সময় ভারতের রাজপ্রতিনিধি ছিলেন এটা ভাগ্যের কথা। গান্ধীজীকে তিনি চিনতে পেরেছিলেন। কিন্তু মহাত্মা যা করতে চান তাঁকে তা করতে দিলে আইনের শাসন চলে না, ব্রিটিশ-রাজত্বও থাকে না। বড়লাটের পরামর্শদাতারা তাঁকে শক্ত হতেই পরামর্শ দেন। তিনি চান দ্বিপাক্ষিক বোঝাপড়া।

এমনিতেই ইংলণ্ড তখন অর্থনৈতিক মন্দায় ভুগছিল। বয়কটের ফলে বিলিতী কাপড়ের চাহিদা পড়ে যায়। যত কাপড় আমদানী হচ্ছিল তার সিকিভাগ বা সেইরকম আমদানী হয়। বম্বেতে ইউরোপীয়দের ষোলটা মিল বন্ধ হয়ে যায়। যেসব ভারতীয় মিল খাদির সঙ্গে প্রতিযোগিতা করবে না বলে অঙ্গীকার দিয়েছিল তারা দুই শিফটে কাজ করে। খাদির চাহিদা এত বেড়ে যায় যে খাদির উৎপাদন শতকরা সত্তর ভাগ বৃদ্ধি পাওয়া সত্ত্বেও সমস্ত খাদির ভাণ্ডার খালি হয়ে যায়। খাদি বলে একটা বিকল্প না থাকলে মিল একাই পারত না বিলিতী কাপড়ের অভাব মেটাতে। বয়কট ব্যর্থ হতো। এইজন্যেই মহাত্মা খাদির উপর এত জোর দিয়েছিলেন।

আন্দোলনটা ছিল সাড়ে পনেরো আনা স্বতঃস্ফূর্ত। নেতাদের ধরে ধরে জেলে পুরলে জনতা নিজের হাতেই আইনভঙ্গের দায়িত্ব নেয়। তেমন পরিস্থিতিতে যা হবার তা হবেই। লোকেও বাড়াবাড়ি করবে, পুলিশও মাত্রা ছাড়িয়ে যাবে। এমন একটা পরিস্থিতি কেমন করে সামলাতে হয় সে শিক্ষা তো কারো ছিল না। ম্যাজিস্ট্রেটরা কি এমন বেপরোয়া ও এমন ব্যাপক আইনভঙ্গ এর আগে কখনো দেখেছেন ? অসহযোগ ছিল এর তুলনায় অনেক সংযত। স্বয়ং গান্ধীজী বাইরে ছিলেন পরিচালনা করতে। এবারেও তাঁকে বেশ কিছুদিন বাইরে থাকতে দেওয়া হয়েছিল। মোতিলাল নেহরু প্রমুখ নেতাদেরও। কিন্তু পরে সে পলিসি পরিবর্তন করতে হয় আন্দোলনের তোড় দেখে। তাঁরাও কি বাইরে থাকলে সরকারকে শান্তি দিতেন ?

গণসত্যাগ্রহ একপ্রকার যুদ্ধ, কেননা সেটা রাজায় প্রজায় বলপরীক্ষা। একপ্রকার বিপ্লবও বটে, কেননা সমাজের নিম্নতম স্তর তার বিপুলতম সামর্থ্য নিয়ে অঙ্গনে ঝাঁপ দেয়। কোনোপক্ষ কি কোনোপক্ষকে শান্তি দিতে পারে ? হারজিতের প্রশ্ন আছে। জীবনমরণ প্রশ্ন। কেউ কারো খাতিরে নিজের জেদ ছাড়বে না। এ সংগ্রাম অনন্তকাল চললেও না।

ইতিমধ্যে লণ্ডনে গোল টেবিল বৈঠক বসতে শুরু করে। গান্ধী বা কংগ্রেসের জন্যে

সবুর করে না। কিন্তু কিছুদূর গিয়ে দেখা গেল বৈঠকের আলোচনা অবাস্তব। ভাবী সংবিধান যদি উপর থেকে চাপানোর অভিপ্রায় না থাকে তবে গান্ধী ও কংগ্রেসের অভিমত জানা দরকার। তাঁরাই যখন ভারতীয়দের মধ্যে প্রধান পক্ষ। তাঁরা আসুন, এসে অন্যান্য পক্ষের সঙ্গে মোকাবিলা করুন। তারপর ভারতীয়রা একজোট হয়ে ব্রিটিশ সরকারের সঙ্গে মোকাবিলা করবেন। গোল টেবিল বৈঠক তাঁদের মুখ চেয়ে মুলতুবি রাখা হয়।

তাছাড়া বড়লাট আরউইনের কার্যকাল ফুরিয়ে এসেছিল। ভারত থেকে বিদায়ের পূর্বে তাঁর আন্তরিক কামনা গান্ধীজীর সঙ্গে বোঝাপড়া। এত বড়ো একটা অশান্তি তিনি পেছনে রেখে যেতে চান না। তাই তিনি সাপ্রু ও জয়াকরের শান্তিপ্রচেষ্টায় সায় দেন। তাঁদের মধ্যস্থতায় কথাবার্তা চলতে থাকে। অবশেষে গান্ধী ও তাঁর সহকর্মীদের বিনাশর্তে মুক্তি দেওয়া হয়।

গান্ধীজী তাঁর গণসত্যাগ্রহ সহজে থামাতে চাননি। বড়লাটের সঙ্গে তাঁর অনেকদিন ধরে বিভিন্ন বিষয়ে কথাবার্তা হয়। কথাবার্তায় কোনোপক্ষেরই ষোল আনা বক্তব্য বজায় থাকে না। উভয়পক্ষকেই কিছু না কিছু ছেড়ে দিতে হয়। উভয়ের মধ্যে যে চুক্তি হয় তার ফলে লবণ আইন উঠে না গেলেও যেখানে যেখানে সম্ভব সেখানে সেখানে নিজেদের জন্যে নুন তৈরির ও স্বগ্রামের লোকের কাছে বিক্রীর স্বাধীনতা মেনে নেওয়া হয়। শ্রমিক ও কৃষক যারা ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছিল তাদের ক্ষতিপূরণ দেওয়া হয় না, কিন্তু বাজেয়াপ্ত জমি ফেরত দেবার ব্যবস্থা হয়, যদিও শর্তসাপেক্ষভাবে। পদত্যাগী কর্মচারীদের পুনরায় বহাল করার সম্বন্ধে প্রাদেশিক সরকারদের উদার হতে বলা হয়। কিন্তু পুলিশের গায়ে হাত দিতে বড়লাট নারাজ।

গান্ধীজী সব দিক বিবেচনা করে গণসত্যাগ্রহ রহিত করেন। সঙ্গে সঙ্গে সত্যাগ্রহী বন্দীদের মুক্তির আদেশ দেওয়া হয়, কিন্তু হিংসার সঙ্গে সংশ্লিষ্ট যাঁরা তাঁদের নয়। এই নিয়ে গান্ধীজীকে অনেক কথা শুনতে হয়। বিশেষতঃ ভগৎ সিংহের ফাঁসির পরে।

আন্দোলনটা যদি পূর্ণ স্বাধীনতার জন্যে হয়ে থাকে তবে পূর্ণ স্বাধীনতা হলো কোথায় যে এত লোকের এত দুঃখ ও এত ত্যাগ সার্থক হবে? অমন করে অসময়ে ওটা থামিয়ে দেবার দরকারটাই বা কী ছিল? কংগ্রেসের ভিতরেই অনেকে বলতে আরম্ভ করেন যে গান্ধীজী ভুল করেছেন। তাঁদের বিশ্বাস গণসত্যাগ্রহ ক্রমেই আরো বিশাল আকার ধারণ করত ও তাকে দমন করা সরকারের সাধ্যাতীত হলে সরকার একদিন আত্মসমর্পণ করত। রাশিয়ার কেরেন্স্কি বিপ্লবের অনুরূপ ব্যাপার আর কী। যেন পরিস্থিতিটা যুদ্ধকালীন ও সরকার যুদ্ধে হারতে বসেছে।

বস্তুতঃ এই আন্দোলনের পটভূমিকা ছিল আন্তর্জাতিক মন্দা। সে পটভূমিকায় আন্দোলন খুব বেশীদূর যেতে পারে না। জেলগামীদের সংখ্যা মাত্র একলাখ। দেশের মোট জনসংখ্যার তিনশো ভাগের একভাগ। অন্যভাবে যারা জড়িত হয়েছে তাদের সংখ্যা বড়জোর আরো একলাখ। সেও ভারতের মোট জনসংখ্যার তিনশো ভাগের একভাগ। সুতরাং বিপ্লবের পক্ষে যথেষ্ট নয়। যুদ্ধের পক্ষে তো নয়ই।

আসলে তাঁর দক্ষিণ আফ্রিকার অভিজ্ঞতার সঙ্গে তাঁর সমালোচকদের প্রত্যক্ষ পরিচয় ছিল না। তাঁরা যদি মনে রাখতেন যে গান্ধীজী তৈরি হয়েছিলেন দক্ষিণ আফ্রিকায় তা হলে সেখানকার সঙ্গে মিলিয়ে দেখতেন ও মিলিয়ে দেখলেই বুঝতে পারতেন যে তাঁর কর্মপদ্ধতি দক্ষিণ আফ্রিকার অভিজ্ঞতার দ্বারা প্রভাবিত। এখানকার সত্যাগ্রহ ছিল সেখানকার সত্যাগ্রহেরই ক্রমবিকাশ। এমন কি ওই যে দাণ্ডী অভিযান ওটাও ট্রান্সভাল মার্চের পূর্বানুবৃত্তি।

পূর্বানুবৃত্তি বললুম। পুনরাবৃত্তি নয়। গান্ধীজী কখনো পুনরাবৃত্তি করতেন না। কিন্তু যেই যেখানে ছাড়তেন সেখান থেকেই আবার তুলে নিতেন। দক্ষিণ আফ্রিকার সেই বিখ্যাত মার্চ যেখানে এসে থেমেছিল সেখান থেকে তাকে দাণ্ডীর সমুদ্রকূল অবধি সম্প্রসারিত করা গেল।

দক্ষিণ আফ্রিকায় গান্ধীজী স্বচক্ষে দেখেছিলেন যে ব্রিটিশ কর্তারা বুয়র যুদ্ধে জিতলেও কিছুদিন বাদে তাঁদের অন্তঃপরিবর্তন হয়। তাঁরা মিটমাটের জন্যে হাত বাড়িয়ে দেন। তখন দক্ষিণ আফ্রিকানরা যে সংবিধান রচনা করে ব্রিটিশ পার্লামেণ্ট তাই পাশ করে দেয়, তার একটি কমাও রদবদল করে না। গান্ধীজী বিশ্বাস করতেন যে বুয়র যুদ্ধের বিকল্প গণসত্যাগ্রহ। আপাতত ইংরেজরা সে আন্দোলন দমন করলেও আখেরে ভারতের অনমনীয় সংকল্প ও অদমনীয় বীরত্ব তাদের অন্তর স্পর্শ করবে। তাদের অন্তঃপরিবর্তন ঘটবে। তারা মিটমাটের জন্যে উদগ্রীব হবে। তখন ভারতীয়রা যে সংবিধান রচনা করবে ব্রিটিশ পার্লামেণ্ট সেই সংবিধানই পাশ করবে, তার একটি কমাও রদবদল করবে না। ভারতও ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদের অধীনতা থেকে মুক্ত হবার পর ব্রিটেনের সঙ্গে সমান স্বাধীন দেশ হিসাবে যুক্ত থাকতে রাজী হবে।

এই যখন তাঁর বিশ্বাস তখন ব্রিটিশ রাজপ্রতিনিধির সঙ্গে সমান মর্যাদার সঙ্গে কথাবার্তা বলা ও স্বাধীনতা বিকিয়ে না দিয়ে চুক্তি করা তাঁর দিক থেকে ভুল হয়নি, ঠিকই হয়েছে। পূর্ণ স্বাধীনতার দুয়ার তো খোলাই রইল, তার উপায় যে গণসত্যাগ্রহ তার দুয়ারও বন্ধ হয়ে গেল না। গোল টেবিল বৈঠকে যদি পূর্ণ স্বাধীনতা না মেলে, যদি তাঁকে সেখান থেকে খালি হাতে ফিরে আসতে হয়, তবে গণসত্যাগ্রহ পুনরারম্ভ করতে

বাধা কী ? অবশ্য একবার একটা ছেদ পড়লে আন্দোলনের মোমেন্টাম নষ্ট হয়, গতিবেগ নতুন করে সঞ্চার করা তত সহজ নয়। সেদিক থেকে বিচার করলে ভুল বই কি। গান্ধীজী ঈশ্বরবাদী মানুষ। ভবিষ্যতের ভাবনা ভবিষ্যতের উপর ছেড়ে দিয়ে বর্তমান যেটা কর্তব্য সেইটেই করেন। বর্তমান কর্তব্য লর্ড আরউইনের বন্ধুতার কর গ্রহণ ও ব্রিটিশ সরকারের আমন্ত্রণ স্বীকার।

বড়লাটের সঙ্গে আলোচনা করতে করতে চায়ের সময় হলো। বড়লাট গান্ধীজীকেও এক পেয়ালা খেতে বলেন। অমনিভাবে পরস্পরের স্বাস্থ্যের জন্যে টোস্ট করা যাবে। গান্ধীজী চায়ের বদলে চেয়ে নিলেন লেবুর রস। তাঁর সঙ্গে ছিল এক পুরিয়া বেআইনী নুন। তারই এক রত্তি বড়লাটকে দেখিয়ে লেবুর রসে ফেলে বলেন, "ইওর এক্সেলেন্সী, আমার মনে পড়ছে বোস্টন টী পার্টি।" বড়লাট তাঁর রসিকতায় মুগ্ধ হয়েছিলেন কি না বলা যায় না, তবে তিনিও তামাশা করতে ছাড়েন না, যখন দেখেন যে গান্ধীজী তাঁর চাদর ফেলে যাচ্ছেন। বড়লাট ওটি তুলে নিয়ে বললেন, "গান্ধী, আপনার পরণে এমন কিছু নেই, আপনি জানেন, যে এটি ফেলে গেলেও চলে।"

ওদিকে তর্জন গর্জন করছিলেন উইনস্টন চার্চিল। রাজপ্রতিনিধি ভবনের সোপান বেয়ে দৃপ্তপদে চলেছে এক অর্ধ উলঙ্গ ফকির!

দৃশ্যটা কেবল চার্চিলের নয়, আরো অনেকের অন্তর্দাহ ঘটায়। এইজন্যে যে গান্ধীকে যে-মর্যাদা দেওয়া হলো তা সমকক্ষের মর্যাদা। ভারতীয়দের আর কাউকে তা দেওয়া হয়নি।

॥ এগারো ॥

সেই একদিন আর এই একদিন।

দক্ষিণ আফ্রিকায় সদ্য উপনীত ব্যারিস্টার মোহনদাস করমচাঁদ গান্ধী কর্ম উপলক্ষে ডারবান থেকে প্রিটোরিয়া যাচ্ছেন। রেলের ফার্স্ট ক্লাসে তিনিই প্রথম কালা আদমি। মারিৎসবুর্গে এক গোরা আদমি ওঠেন। কালা আদমির সঙ্গে এক কামরায় ভ্রমণ করতে হবে তা কি কখনো হয়? সাহেব তৎক্ষণাৎ গিয়ে রেল কর্মচারীকে ডেকে আনেন। যাত্রীর হাতে ফার্স্ট ক্লাসের টিকিট দেখেও হুকুম দেওয়া হয় ভ্যানে সরে যেতে। গান্ধী সে হুকুম অমান্য করেন। তখন তাঁকে মালসমেত নামিয়ে দিয়ে ট্রেন চলে যায়। স্টেশনের

ওয়েটিং রুমে সারা রাত প্রখর শীতে হি হি করে কাঁপতে কাঁপতে গান্ধীজী ভাবতে থাকেন কী তাঁর কর্তব্য। দেশে ফিরে যাবেন, না এই অন্যায়ের শেষ দেখবেন। সেদিন সেই যে উত্তর তিনি অন্তরে অনুভব করেন সে উত্তর কেবল একটি ব্যক্তির নয়, একটি জাতিরও উত্তর। আর কেবল দক্ষিণ আফ্রিকার ভারতীয়দের নয়, ভারতের ভারতীয়দেরও উত্তর।

দক্ষিণ আফ্রিকার অহিংস সংগ্রামের ক্রমান্বয় ভারতের অহিংস সংগ্রাম। গান্ধী স্মাটস চুক্তির ক্রমবিকাশ গান্ধী আরউইন চুক্তি। এটা আরো মর্যাদাযুক্ত। স্মাটস যদিও সরকারের শীর্ষ তবু আরউইনের মতো রাষ্ট্রের শীর্ষ নন। প্রধানমন্ত্রী, রাজপ্রতিভূ নন। রাজার সঙ্গে সমান হয়ে কথাবার্তা বলবে, স্বাক্ষর করবে, এত বড়ো স্পর্ধা কোন্ প্রজার? তাহলে রাজার মর্যাদা থাকে কোথায়? চার্চিল তো মাথার চুল ছিঁড়বেনই। ওদেশের রক্ষণশীল দলের এক দুর্মর অংশ, এদেশের সাহেব মহলের এক ঝাহু অংশ, এ জ্বালা ভুলতে অপারগ। তা ছাড়া তাঁদের এখানকার আমীর ওমরাহ কি ভুলতে পারেন যে তাঁদের ভাগ্যে যা জোটেনি গান্ধীর ভাগ্যে তাই জুটবে?

ব্রিটিশ সরকারের চিরকেলে পলিসি আগে হিন্দুমুসলমানের বোঝাপড়া হবে, পরে হিন্দুমুসলমানের যোগফল যে ভারত সেই ভারতের সঙ্গে ব্রিটেনের বোঝাপড়া হবে। সেই উদ্দেশ্য নিয়েই লণ্ডনে গোল টেবিল বৈঠক ডাকা। তাতে এবার আর একটা নতুন অঙ্গ জুড়ে দেওয়া হয়। দেশীয় রাজন্য। তাঁদের সঙ্গেও অগ্রিম বোঝাপড়া চাই। ইতিমধ্যে বৈঠকের প্রথম অধিবেশন হয়ে গেছে। তাতে কংগ্রেস উপস্থিত না থাকায় কংগ্রেসের অনুপস্থিতিতে কোনো গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত নিতে পারা যায়নি। দ্বিতীয় অধিবেশনও কি তেমনি অপূর্ণাঙ্গ হবে? যাতে পূর্ণাঙ্গ হয় তার জন্যে আরউইনের উপর ভার পড়ে কংগ্রেসকে বৈঠকে যোগ দেওয়াতে হবে। তারই পরিণতি গান্ধী আরউইন চুক্তি। গোল টেবিল বৈঠকের পটভূমিকা না থাকলেও তেমন অঘটন ঘটবার কথা নয়। ব্রিটিশ পলিসির দিক থেকে ওটা প্রক্ষিপ্ত। তার জন্যে সাধুবাদ দিতে হয় সাধুপ্রকৃতির বড়লাট আরউইনকে, যাঁর চোখে প্রেস্টিজের প্রশ্নটাই চূড়ান্ত নয়। আর তখনকার লেবার পার্টির গবর্নমেণ্টকে, যাঁরা নিজেরা নিচের থেকে উঠেছেন বলে সাম্যবাদী।

গান্ধীজী গোল টেবিলে যোগ দেবার পূর্বেই শ্রমিক সরকার হঠাৎ পদত্যাগ করেন। যদিও তাঁদেরি মেজরিটি। সেটাও একটা অঘটন। অর্থনৈতিক মন্দা এসে এমন এক পরিস্থিতি সৃষ্টি করেছিল যে ব্যাঙ্কগুলোর গায়ে হাত না দিলেই নয়। সে সাহস শ্রমিক সরকারের ছিল না। কারণ তাঁদের পেছনে সে স্যাংশন ছিল না। ভোটের জোরে ক্ষমতার আসনে বসলেই তো সংঘবদ্ধ কায়েমী স্বার্থের অঙ্গে অঙ্কুশ-প্রয়োগ করা চলে না।

হাতও ক্ষেপে গিয়ে মাহুতকে ফেলে দিতে পারে। শ্রমিক সরকার মাঝে মাঝে গদী ছেড়ে দেন। ক্ষমতায় যাঁরা আসেন তাঁরা বুর্জোয়া শ্রেণীর রক্ষণশীল ও উদারনৈতিক দলের লোক, কিন্তু তাঁদেরও সর্দার সেই র্যামজে ম্যাকডোনাল্ড।

গান্ধীজীকে প্রভূত সম্মান ও শ্রদ্ধা দেখানো হয়। গোল টেবিলের সভাপতি লর্ড স্যাঙ্কি তাঁকে মহাত্মা বলে আপনার বাম পার্শ্বের আসনে বসান। বিলিতী কেতায় সেটিই সেরা আসন। ম্যাকডোনাল্ডও তাঁকে মহাত্মা বলেন। বলড়ুইন ও হোর তাঁর সঙ্গে ভাব করেন। গোল টেবিলের তাৎপর্য এই যে উপস্থিত সকলেরই সমান মর্যাদা। ব্রিটেন যে গোল টেবিলে রাজী হয়েছে এটা নিশ্চয়ই একটা অগ্রগামী পদক্ষেপ। সকলেই গোড়ার দিকে আশাবাদী ছিলেন যে এইবার ভারতের সংবিধানগত সমস্যার আপসে মিটমাট হবে।

কিন্তু দু'দিন যেতে না যেতেই দেখা গেল যে যার জায়গায় অটল। সৌজন্যের অভাব নেই, অভাব সমঝোতার। গান্ধীকে কোণঠাসা করা হলো, করলেন মাইনরিটিরা। ব্রিটিশ সরকারের সঙ্গে তাঁদের যোগসাজস ছিল। আর গান্ধীও যে লাইন নিলেন সেটাও তাঁকে কোণঠাসা করল। তারপর ব্রিটিশ সরকার তাঁদের ঘরোয়া অর্থনৈতিক সঙ্কটে অন্যমনস্ক থাকায় ভারতকে কী দেবেন না দেবেন খুলে বলতে পারছিলেন না। ব্রিটেন কী দিচ্ছে জানলে তবে তো ভাগাভাগি হবে।

মোটামুটি এইরকম আভাস পাওয়া গেল যে সাইমন কমিশন যা দিতে বলেছেন ব্রিটিশ সরকার ভারতীয় জনমতকে সন্তুষ্ট করবার জন্যে তার চেয়ে বেশী দিতে রাজী আছেন। পূর্ণাঙ্গ প্রাদেশিক স্বায়ত্তশাসনের অধিক অপূর্ণাঙ্গ কেন্দ্রীয় স্বায়ত্ত শাসন। কেন্দ্রেও ভারতীয়রা মন্ত্রিত্ব করবেন। কিন্তু তাঁরা দেশরক্ষা ও পররাষ্ট্রনীতির ভার পাবেন না। আর তাঁদের দায়িত্ব যার কাছে সেই আইনসভার সবাই যে নির্বাচিত প্রতিনিধি হবেন তাও নয়। আর নির্বাচিত প্রতিনিধি যাঁরা তাঁরা যে প্রাপ্তবয়স্ক মাত্রের দ্বারা নির্বাচিত হবেন তাও নয়। আর নির্বাচকমণ্ডলী যে ধর্মনির্বিশেষে বর্ণনির্বিশেষ যৌথনির্বাচকমণ্ডলী হবে তাও নয়। আর বড়লাট যে মন্ত্রীদের সিদ্ধান্তে আদৌ হস্তক্ষেপ করবেন না তাও নয়। সিভিল সার্ভিস যে বিদায় নেবে তাও নয়।

গান্ধীজী বিদেশী বণিক স্বার্থের বিপক্ষে—এমন কি দেশীয় বণিক স্বার্থের বিপক্ষেও—বলেন, যদি তা স্বদেশের—বিশেষ করে স্বদেশের দরিদ্রদের—স্বার্থের বিরোধী হয়। তেমনি মনোনয়ন প্রথার বিপক্ষে বলেন, বিশেষতঃ দেশীয় রাজ্যের প্রতিনিধি হয়ে আসবেন যাঁরা তাঁদের মনোনয়নের। তেমনি প্রাপ্তবয়স্কদের ভোটদানের অধিকার স্বীকার করতে বলেন, যাতে ভোট দিতে গরিব লোকেরাও পারে। তেমনি দেশরক্ষা ও পররাষ্ট্রনীতি

ভারতীয়দের হাতে ছেড়ে দিতে বলেন, যাতে ভারতের কেন্দ্রীয় সরকার স্বাধীন সরকারের মতো কাজ করতে পারেন। এমনি আরো অনেক বিষয়েই তিনি স্পষ্ট কথা বলেন।

কিন্তু সেসব কথা কার কথা? তাঁর নিজের, না তিনি যাদের প্রতিনিধি হয়ে এসেছেন তাদের? কাদের প্রতিনিধি হয়ে এসেছেন তিনি?

এই নিয়েই বেধে যায় গোল। গান্ধীজীর মতে তিনি কংগ্রেসের প্রতিনিধি। আর কংগ্রেস হচ্ছে ভারতের সর্বজনের প্রতিনিধি। হিন্দু মুসলমান শিখ খ্রীষ্টান পার্শী ইত্যাদি সকলের। কংগ্রেস লড়াই করছে সকলের হয়ে। একমাত্র কংগ্রেসই লড়াই করছে। সন্ধির সময় যখন আসবে তখন সন্ধি হবে কংগ্রেসে ব্রিটিশে। কংগ্রেসই ভারত, সুতরাং ভারতে ব্রিটেনে। কংগ্রেস অন্যান্য দলের অস্তিত্ব স্বীকার করে। তাদের সঙ্গেও মিটমাট করবে। কিন্তু তারা এক একটা অংশের প্রতিনিধি। সমগ্রের নয়। কংগ্রেসই সমগ্রের প্রতিনিধি।

তিনি যে কংগ্রেসের একমাত্র প্রতিনিধি এটা মেনে নিতে কারো আপত্তি ছিল না। কিন্তু কংগ্রেস যে ভারতের সর্বজনের একমাত্র প্রতিনিধি, কংগ্রেসই যে ভারত এবং ভারতের হয়ে ব্রিটেনের সঙ্গে সেটেলমেন্টের অধিকারী এতে আপত্তি ছিল মাইনরিটিদের তথা দেশীয় রাজাদের তথা সরকারী বেসরকারী ইংরেজদের।

ইতিমধ্যেই এমনভাবে জোট পাকানো হয়েছিল যাতে ভাবী সংবিধানে কেন্দ্রীয় সরকারে কংগ্রেসকে ব্যালান্স করার জন্যে দুটি ব্লক থাকে। একটি প্রাক্তন অফিসিয়াল ব্লকের পরিবর্তে দেশীয় রাজ্যের মনোনীত প্রতিনিধিদের ব্লক। অপরটি যাবতীয় মাইনরিটিকে স্বতন্ত্র নির্বাচন তথা ওয়েটেজ সহযোগে ফুলিয়ে ফাঁপিয়ে তাদের সম্মিলিত ব্লক। এই দুটি ব্লক-থাকতে কংগ্রেস কিছুতেই একক মেজরিটি পাবে না। তাকে বাধ্য হয়ে কোয়ালিশন করতে হবে।

ভারতের ভাবী সরকার ফেডারল সরকার হবে আর সেই সরকারের স্বরূপ হবে কোয়ালিশন এ বিষয়ে নিঃসংশয় হবার জন্যেই মাইনরিটি প্রতিনিধিরা নিজেদের মধ্যে একটি চুক্তি করেন। তাঁদের সঙ্গে বিদেশী বণিকরাও ছিলেন। তেমনি দেশীয় রাজারাও নিজেদের মধ্যে সেইরূপ বন্দোবস্ত করেন। তাঁদের শর্ত তাঁদের রাজ্যের প্রতিনিধিরা তাঁদেরি মনোনীত পাত্রমিত্র হবেন, প্রজাদের মনোনীত প্রতিনিধি হবেন না।

এখন সব চেয়ে অদ্ভুত ব্যাপার হলো মাইনরিটিদের দলে হিন্দুসমাজের একটি অবিভাজ্য অঙ্গ অবনমিত শ্রেণী। একে তো মাইনরিটিদের স্বতন্ত্র নির্বাচনের ও তার উপরে ওয়েটেজের দাবী মেনে নিলে জাতীয়তাবাদ ও গণতন্ত্র দুই ক্ষুণ্ণ হয়। ঐতিহাসিক

কারণে মুসলমান ও শিখদের বেলা সেটা না হয় সহ্য করা গেল। কিন্তু হিন্দুসমাজের একটি অঙ্গের বেলা তেমন দাবী মেনে নিলে কেবল জাতীয়তাবাদ ও গণতন্ত্র নয়, সামাজিক সংহতিও ক্ষুণ্ণ হয়। তা ছাড়া সংবিধানের যদি অস্পৃশ্যতা কায়েম হয় তো সমাজেও আইনত কায়েম হবে। কতকগুলি মানুষকে চিরকাল অস্পৃশ্য করে রাখা কি তাদের পক্ষে বা সমাজের পক্ষে বা দেশের পক্ষে ভালো হবে?

গান্ধীজী কোনো মতেই হরিজনদের স্বতন্ত্র নির্বাচন ব্যবস্থা মেনে নেবেন না, জীবন দিয়ে প্রতিরোধ করবেন এটা ধ্রুব। ইতিমধ্যে অনেকে প্রস্তাব করেছিলেন যে সাম্প্রদায়িক সমস্যা নিয়ে যখন গুরুতর মতভেদ দেখা দিয়েছে তখন সমস্যাটার সমাধান ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রীর উপরেই ছেড়ে দেওয়া যাক। তিনি সালিশী করবেন। প্রধানমন্ত্রীর উপর ছেড়ে দেওয়া মানে তাঁর রোয়েদাদ চোখ বুজে মেনে নিতে রাজী হওয়া। সেইজন্যে গান্ধীজী তেমন প্রস্তাবে সায় দেন না। তবে প্রধানমন্ত্রী যদি কোনো রোয়েদাদ দেন তিনি ও কংগ্রেস তা গ্রহণ করবেন কি না বিবেচনা করবেন। কিন্তু সে রোয়েদাদে যদি হরিজনদের স্বতন্ত্র নির্বাচন স্বীকৃত হয়ে থাকে তবে তিনি সে অংশটা প্রাণ দিয়ে প্রতিরোধ করবেন। ম্যাকডোনাল্ডকে তিনি সতর্ক করে দেন।

ব্রিটেন ভারতকে যতবার শাসনসংস্কার দিয়েছে ততবার নিজের হাতে কিছু রেখেছে, ভারতের হাতে কিছু দিয়েছে। আর ভারতের হাতে যা দিয়েছে তাকে দু'ভাগ করে একভাগ দিয়েছে জাতীয়তাবাদীদের, একভাগ মাইনরিটিদের। মর্লি মিণ্টো শাসন-সংস্কারের সময় থেকে এইরকম চলে আসছে। ভারতীয়দের যা দেবার তা দু'ভাগ করে দেবার আগে তাদের সঙ্গে পরামর্শ করাও ব্রিটিশ রীতি। তারা যদি একমত হয় তবে তারাই ভাগাভাগি করার দায়িত্ব নেয়। পরে ব্রিটেন সেটাকে শাসনসংস্কারের সামিল করে আইনের স্বীকৃতি দেয়। তারা যদি একমত হতে না পারে তবে ব্রিটেনই নিজের দায়িত্বে ভাগাভাগি করে ও সেটা শাসনসংস্কারের সামিল হয়। তখন সেটাকে মেনে নেওয়া ছাড়া গত্যন্তর থাকে না। সেটাকে অগ্রাহ্য করলে শাসনসংস্কারটাকেও অগ্রাহ্য করা হয়। ততদূর যেতে কতক লোক রাজী হলেও কতক লোক রাজী নয়।

মণ্টেগু চেমসফোর্ড শাসনসংস্কারের প্রাক্কালে কংগ্রেস ও লীগ একমত হয়ে যে ভাগাভাগি করে সেটার নাম লখ্নউ চুক্তি। সেটাতে জীণার হাত ছিল। শোনা যায় টিলকেরও হাত। তিনি ইঙ্গ ভারতীয় সংগ্রামের পাশাপাশি হিন্দুমুসলিম সংগ্রাম জিইয়ে রাখতে চাননি। তাই বাইরের সংগ্রামে সবটা জোর দেবার আশায় ভিতরের সংগ্রাম মিটিয়ে ফেলতে উদ্যোগী হয়েছিলেন। লখ্নউতে কংগ্রেস মুসলমানদের জন্যে স্বতন্ত্র নির্বাচন তো স্বীকার করেই, যেসব প্রদেশে মুসলমানরা সংখ্যালঘু সেসব

প্রদেশে উপরন্তু ওয়েটেজ বা অতিরিক্ত আসন কবুল করে। পরিবর্তে লীগও কবুল করে যেসব প্রদেশে অমুসলমানরা সংখ্যালঘু সেসব প্রদেশে অমুসলমানদের জন্যে ওয়েটেজ বা অতিরিক্ত আসন। পরে দেখা গেল যে মুসলমানদের জন্যে স্বতন্ত্র নির্বাচন মানে অমুসলমানদের জন্যেও স্বতন্ত্র নির্বাচন। মুসলমানরা যেমন শুধু মুসলমানদের ভোটেই নির্বাচিত হয় তেমনি অমুসলমানরাও কেবল অমুসলমানদের ভোটেই নির্বাচিত হয়। অপর সম্প্রদায়ের কাছে জবাবদিহির দায় থাকে না বলে মুসলমানরাও যেমন সাম্প্রদায়িক ভাবাপন্ন হয়ে ওঠে অমুসলমানরাও তেমনি। সবাই যদি সমান সাম্প্রদায়িক ভাবাপন্ন হয় তবে সাম্প্রদায়িক ঘাতপ্রতিঘাত লেগেই থাকে। জাতীয় সংগ্রামের জন্যে একাগ্রতা ও একতা কোথায়?

সেইজন্যে মোতিলাল নেহরু কমিটির পরিকল্পিত সংবিধানে সাম্প্রদায়িক নির্বাচন-পদ্ধতি পরিত্যক্ত হয়। সেইসঙ্গে ওয়েটেজ। তবে যেসব প্রদেশে মুসলমানরা সংখ্যালঘু সেসব প্রদেশে তাদের জন্যে আসন সংরক্ষণ বিহিত হয়, কিন্তু অনুপাতের অতিরিক্ত আসন নয়। এটা কতক মুসলমানের সমর্থন পেলেও প্রভাবশালী মুসলমানদের সম্মতি পায় না। এঁদের কাছে স্বতন্ত্র নির্বাচন তথা ওয়েটেজ যেন একপ্রকার সাম্প্রদায়িক রক্ষাকবচ। গোল টেবিল বৈঠকে এঁদের সদলবলে নিমন্ত্রণ করা হয়েছিল। অন্যমতের প্রতিনিধি ছিলেন একমাত্র সার আলী ইমাম, কিন্তু তাঁকে মুখ খুলতে দেওয়া হলো না। মুসলমানদের জন্যে স্বতন্ত্র নির্বাচন তথা ওয়েটেজ কেবল নয়, প্রত্যেকটি মাইনরিটির জন্যও তাই। এমন কি হিন্দুসমাজভুক্ত অবদমিত শ্রেণীর জন্যেও। সবাই মিলে এই মর্মে একটা চুক্তি করেন, তাকে বলে মাইনরিটিজ প্যাকট। তাতে মাইনরিটি বলে গণ্য হন ইউরোপীয় বণিকরাও।

এঁদের দাবী মেনে নিলে এঁরা যে পরিবর্তে অন্যপক্ষের দাবী মেনে নেবেন তা নয়। হিন্দুরা—এখন থেকে বর্ণহিন্দুরা—যেখানে সংখ্যালঘু সেখানেও পূর্বের মতো ওয়েটেজ পাবে না। মাঝখান থেকে কেন্দ্রে সংখ্যাগুরুত্ব থেকে বঞ্চিত হবে। লখ্‌নউ চুক্তি ছিল একটা বারগেন, তাতে দু'পক্ষের লাভক্ষতি সমান সমান। তার পেছনে ছিল একটা দেওয়া-নেওয়ার মনোভাব। গোল টেবিলের মাইনরিটিরা চান একতরফা লাভ। ক্ষতির বোঝাটা চাপিয়ে দেবেন অন্য তরফের উপর। যেমন করে বিজেতারা চাপিয়ে দেয় বিজিতের উপরে। গান্ধী যদি মেনে নেন তাহলে যে পূর্ণ স্বাধীনতা সুগম হবে তা নয়। ব্রিটিশ সরকারের সঙ্গে সংগ্রাম নিষ্প্রয়োজন হবে তাও নয়। সংগ্রামে সাম্প্রদায়িকতা-বাদীদের সহযোগিতা পাবেন তাও নয়। সাম্প্রদায়িক তাণ্ডব বরাবরের জন্যে থেমে যাবে তাও নয়। তিনি মেনে নিন, আর নাই নিন মাইনরিটি প্যাক্টওয়ালারা ব্রিটিশ

সরকারের উপরেই শেষ ভরসা রাখেন, তাঁর উপরে নয়। তিনি যদি মেনে নেন তা হলে ব্রিটিশ সরকারকে দিয়ে ওটা মঞ্জুর করিয়ে নেওয়া হবে। যদি মেনে না নেন তা হলে তো ব্রিটিশ সরকারের কাছে গিয়ে বলা হবে রক্ষাকবচ দিতে।

তিনি ও ফাঁদে পা দেন না। ব্রিটিশ সরকার যদি রক্ষাকবচ দিতে চান নিজেদের দায়িত্বে দেবেন। কিন্তু হিন্দুসমাজের একভাগ যে অবদমিত শ্রেণী তাকে যা দেবার তা হিন্দুরাই দেবে, ব্রিটিশ সরকার না। অপরাপর সম্প্রদায় না। স্বতন্ত্র নির্বাচন যদিও সকলের পক্ষেই খারাপ তবু হরিজনদের পক্ষে আরো বেশী খারাপ। শিখ চিরকাল শিখ থাকতে পারে, কিন্তু অস্পৃশ্য চিরকাল অস্পৃশ্য থাকতে পারে না, থাকা অন্যায়। হিন্দু সংস্কারকরা ব্যর্থ হবেন, যদি সরকার ওভাবে অস্পৃশ্যতাকে কায়েমী হতে দেন। তা ছাড়া আবার এক সাম্প্রদায়িক বিবাদ শুরু হবে। বর্ণহিন্দু বনাম হরিজন। সমাজ দুর্বল হবে, রাষ্ট্র দুর্বল হবে।

গোল টেবিল বৈঠকে ঝীণা সাহেবও ছিলেন। তখনো তিনি পুরোদস্তুর সাম্প্রদায়িক হননি। অন্যান্যদের তুলনায় কংগ্রেসের কাছাকাছি। তিনি আশা করেছিলেন লখ্নউ চুক্তির মতো এবার আরো একটি চুক্তি হবে। যদি গান্ধী কথাবার্তা চালাতে রাজী হন। গান্ধী একদা ল খনউ চুক্তি সমর্থন করলেও পরবর্তীকালে বিরূপ হয়েছিলেন। আর অমনধারা চুক্তিতে বিশ্বাস করতেন না। ঝীণা চোখে অন্ধকার দেখেন। দেশে ফিরে আসেন না। বিলেতেই প্র্যাকটিস করেন। চার বছর পরে যখন ফেরেন তখন তিনি গান্ধীর কাছ থেকে কংগ্রেসের কাছ থেকে অনেক দূরে সরে গেছেন। যদিও ব্রিটিশ সরকারের আরো কাছে নন। দুই শিবিরের মাঝামাঝি তিনি তাঁর তৃতীয় শিবির সন্নিবেশ করেন। মুসলিম লীগ পুনর্গঠন করে তিনি হয়ে ওঠেন তার একমাত্র প্রতিনিধি। আর মুসলিম লীগ হয়ে উঠতে চায় মুসলিম ভারতের একমাত্র প্রতিনিধি।

।। বারো ।।

গোল টেবিল বৈঠকের কাছে বড আশা ছিল। তা নইলে ও বৈঠক বসত না, ওতে কংগ্রেসের উপস্থিতি অবশ্য প্রয়োজনীয় হতো না, তার জন্যে গান্ধী আরউইন চুক্তির নজীর স্থাপন করতে ব্রিটিশ প্রভুরা সম্মত হতেন না।

আশাভঙ্গের জন্যে কে দায়ী কে দায়ী নয়, কে কতটুকু দায়ী, এ বিচার ইতিহাসের উপর ছেড়ে দিয়ে শুধু তার ফল কী হলো তা দেখা যাক।

ফল হলো এই যে দেশীয় রাজারা আস্তে আস্তে পিছিয়ে গেলেন। ফেডারেশনে যোগ দিতে তাঁদের সত্যি তেমন কোনো তাগিদ ছিল না। কর্তারাই তাঁদের ধরে নিয়ে এসেছিলেন, যাতে কেন্দ্রীয় আইনসভায় সরকারী ব্লকের মতো একটা আজ্ঞাবহ ব্লক গঠন করা যায়। সেই ছিদ্র দিয়ে কে জানে কখন দেশীয় রাজ্যে গণতন্ত্র ঢুকবে আর রাজাদের কর্তৃত্ব যাবে এই-ভয়ে তাঁরা ক্রমে ক্রমে বিমুখ হলেন।

বাকী থাকে পরিকল্পিত মাইনরিটি ব্লক। কিন্তু তাকে দিয়ে কংগ্রেসকে ব্যালান্স করতে হলে এত বেশী ওয়েটেজ দিতে হয় যে মেজরিটি ও মাইনরিটি সমান হয়ে যায়। যাকে বলে প্যারিটি। তা হলে দাঁড়িপাল্লা থেকে যায় বড়লাটের হাতে। তার নাম স্বাধীনতা নয়। কংগ্রেস কখনো তাতে রাজী হতে পারে না।

তা ছাড়া ও জিনিস মাইনরিটিদের শিবিরে হরিজনদের না ঢোকালে সম্ভব নয়। সেটা করতে গেলে হিন্দুসমাজের বল কমে যায়, অস্পৃশ্যতাও আইনসিদ্ধ হয়। গান্ধীজী তার প্রতিরোধ করতে দৃঢ়সংকল্প। অথচ সেটা যদি না করা হয় তবে মাইনরিটি ব্লক কংগ্রেসের সমকক্ষ হতে পারে না।

কংগ্রেসকে তা হলে ব্যালান্স করবে কে? কেউ যদি না করে তবে ফেডারেশনের হয়ে দাঁড়ায় কংগ্রেসরাজ। ফেডারেশনের আইডিয়াটা এসেছিল মুসলমানদের মহল থেকে। তাঁরা চেয়েছিলেন যে হিন্দুপ্রধান ভারতে হিন্দু মেজরিটি রাজত্ব করতে পারবে না, যদি মেজরিটি আর মাইনরিটির সমান ওজন হয়। কিন্তু মহাত্মার অনশনের পরে দেখা গেল হরিজন বিনা তাঁরা ওজনে হালকা। হরিজন সমেত কংগ্রেস ওজনে ভারী।

তাই যে-মুসলমানদের মহল একদিন ফেডারেশন দাবী করেছিলেন তাঁরাই আরেক-দিন ফেডারেশন প্রত্যাহার করে পার্টিশনের প্রস্তাব তুললেন। অখণ্ড ভারত আর নয়। এখন চাই মোসলেম ভারত। যার অন্য নাম পাকিস্তান।

এখানে উল্লেখযোগ্য, পাকিস্তান কথাটির উৎপত্তি ওই গোল টেবিল বৈঠকের পরেই। বৈঠকের বাইরে রহমৎ আলী বলে এক জন ছাত্র মুসলিমপ্রধান প্রদেশগুলির নামের আদ্য অক্ষর মিলিয়ে ওই পেটেন্ট শব্দটি উদ্ভাবন করেন। সে সময় মুসলিম জননায়করা কেউ ওতে গুরুত্ব আরোপ করেননি। সবাই তাঁরা ছিলেন অখণ্ড ও অবিভাজ্য ভারতে বিশ্বাসী। তাঁদের অবিশ্বাস শুধু ব্রিটিশরাজের উত্তরাধিকারীরূপে কংগ্রেসরাজের উপর। কারণ কংগ্রেসরাজ কার্যত হিন্দুরাজই হবে। তাঁদের ভরসা ছিল যে আলাপ-আলোচনা ও চুক্তির সূত্রে এমন এক মীমাংসায় পৌঁছনো যাবে যেটা মুসলমানদের গ্রহণযোগ্য, অথচ কংগ্রেসের বর্জনযোগ্য নয়। গান্ধী যদি তাতে রাজী হয়ে যান ব্রিটিশকে রাজী করানোর

দায় অন্যেরা নেবেন। তাঁরাও তো চান ভারতের রাজনৈতিক অগ্রগতি। তবে তার আগে চান সম্প্রদায়িক বন্দোবস্ত।

ওইখানেই কাঁটা। সাম্প্রদায়িক বন্দোবস্ত আর রাজনৈতিক অগ্রগতি দুটোর মধ্যে কোন্‌টা এক নম্বর ও কোন্‌টা দু'নম্বর এই প্রশ্নের উত্তরে গভীর মতভেদ। কংগ্রেসের কাছে, গান্ধীজীর কাছে স্বরাজ হচ্ছে এক নম্বর ও সাম্প্রদায়িক মীমাংসা দু'নম্বর। মুসলিম নেতাদের কাছে ও ব্রিটিশ সরকারের কাছে সাম্প্রদায়িক মীমাংসা হচ্ছে এক নম্বর, স্বরাজ বা স্বায়ত্তশাসন হচ্ছে দু-নম্বর। এ মতভেদ কংগ্রেসের প্রতিষ্ঠার সময় থেকেই ভারতীয় রাজনীতির একটা ফাণ্ডামেণ্টাল রিয়ালিটি। মুসলীম লীগ প্রতিষ্ঠার পর থেকে এটা আরো প্রকট হয়। মতভেদের উপসাগরের উপর সেতুবন্ধ করেছিলেন ঝীণা। তাঁর পেছনে ছিলেন টিলক। কিন্তু তাঁদের সেই লখ্‌নউ চুক্তির পরে দেখা গেল উপসাগর আরো প্রশস্ত হয়েছে, সুতরাং আরো প্রশস্ত সেতু চাই। এবার কিন্তু কংগ্রেস বা গান্ধী সেদিক দিয়ে যেতে রাজী ছিলেন না, কারণ পরে সেই উপসাগর আরো বেশী প্রশস্ত হবে, আরও বেশী প্রশস্ত সেতুর দরকার হবে। অমন করে যে সমাধান হয় সেটা চূড়ান্ত নয়। আর তাতে করে সাম্রাজ্যের অন্ত হয় কোথায়? লড়তে তো হবেই বার বার। লড়াইয়ের সময় মুসলিম লীগ কোথায়?

লড়ুয়ে মুসলমানদের নিয়েই গান্ধীজী রাজনীতিক্ষেত্রে অবতীর্ণ হন। যেকাজ আর কেউ কোনোদিন পারেনি। খেলাফতীদের সর্দার হবার পরেই তিনি কংগ্রেসীদেরও সর্দার হন। খেলাফতীরা এর মধ্যে পিছিয়ে গেছেন। তা সত্ত্বেও লড়ুয়ে মুসলমান বড়ো কম নেই গান্ধীজীর শিবিরে। গান্ধীজীর মন পড়ে রয়েছিল স্বদেশের অসমাপ্ত ও অমীমাংসিত সংগ্রামে। হিন্দুমুসলমানের সংগ্রামী একতায়। গোল টেবিল বৈঠকের উপর তাঁর আস্থা থাকলে তিনি বড়ো বড়ো কংগ্রেস নেতাদেরও সঙ্গে করে নিয়ে আসতেন। তা বলে মানবপ্রকৃতিতে তাঁর অবিশ্বাস ছিল না। সুযোগের সদ্ব্যবহার করতে হবে। সবাই মিলে একবার দেখতে হবে গোল টেবিলে সম্মানজনক মিটমাট হয় কি না। অহিংসাবাদী কখনো সম্মানজনক মিটমাটের সুযোগ ছাড়েন না। সুযোগে পেলে গ্রহণ করেন, প্রাণপণ চেষ্টা করেন। ব্যর্থতাও সিদ্ধির সোপান।

তারপর অহিংসাবাদী সুযোগ পেলেই তাঁর প্রতিপক্ষের সঙ্গে আলাপ-পরিচয় করে প্রতিপক্ষের অন্তঃপরিবর্তনে প্রয়াসী হন। গোল টেবিল বৈঠক তাঁকে অভূতপূর্ব সুযোগ দেয়। বৈঠকের সভাপতি লর্ড স্যাঙ্কি তাঁর সম্বন্ধে লিখেছেন—

"How Mr Gandhi managed to stand the physical and mental strain of that Conference has always been a marves to me. Without

fail he was there at the beginning and he remained till the end of the day's work. A note made at the time tells me that on some days as many as 80,000 words were spoken. But Mr. Gandhi's real task only began when the Conference adjourned. Hour after hour till late in the night, and early in the morning, he was engaged in conversations and interviews with the different interests, doing his best to get them into line and to bring them to his own way of thinking. Prime Ministers and Dictators have means and opportunities of imposing their views on their peoples, but it is doubtful whether there has ever been any man, other than Mr. Gandhi, who has in his lifetime won so many millions of men over to his side by his own efforts and example."

সাধারণতঃ তিনি দিনে একুশ ঘণ্টা খাটতেন। তাঁর মতে গোল টেবিল বৈঠকের বাইরেই আসল গোল টেবিল বৈঠক। তাঁর কাজ কেবল জনাকয়েক রাজনীতিককে নিয়ে নয়, সর্ব স্তরের ইংরেজকে নিয়ে। ইংরেজ জাতিকে নিয়ে। সেইজন্যে তাঁর আস্তানা ওয়েস্ট এণ্ডের সম্ভ্রান্ত হোটেলে নয়, ইস্ট এণ্ডের গরিবপাড়ায় অবস্থিত কিংসলী হল নামক সমাজকল্যাণ প্রতিষ্ঠানে। যাকে বলা হয় সেটলমেণ্ট। কতকটা আশ্রম, কতকটা ক্লাব। যুদ্ধে নিহত কিংসলী লেস্টারের বোন মুরিয়েল তার পরিচালিকা। আমার বন্ধুর বন্ধু। এর বছর দুই আগে আমিও সেখানে গেছি। উপর তলায় কয়েকটি সেল দেখেছিলুম, যেমন মঠবাড়িতে থাকে। সাধক কর্মীদের জন্যে। তারই একটিতে গান্ধীজী তিনমাস থাকেন। মীরা বেনকে নির্দেশ দেন তাঁর খোরাকের জন্যে দিনে দেড় শিলিং বা এক টাকার বেশী যেন খরচ না হয়। বিলেতে গিয়েও তিনি তাঁর বেশভূষা বদলান না। সেই অর্ধ উলঙ্গ ফকির।

কাজকর্মের সুবিধের জন্যে তিনি নাইটসব্রিজ অঞ্চলে রাখেন ছোট একটি আপিস। অসংখ্য প্রসিদ্ধ ব্যক্তি তাঁর সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন বা তিনি তাঁদের সঙ্গে। বার্নার্ড শ তাঁদের একজন। শ বলেন গান্ধী হচ্ছেন 'মহাত্মা মেজর' আর তিনি 'মহাত্মা মাইনর'। শ আরো বলেন, "আপনি ও আমি পৃথিবীর একটি অতি ক্ষুদ্র সম্প্রদায়ের লোক।"

চার্চিল গান্ধীর সঙ্গে সাক্ষাৎকারের অনুরোধ প্রত্যাখ্যান করেন। কিন্তু কী আশ্চর্য, চার্চিলেরই এক সম্পর্কিতা ভগিনী ক্লেয়ার শেরিডান স্বতঃপ্রবৃত্ত হয়ে সরোজিনী নাইডুর

সহায়তায় মহাত্মার মূর্তি মডেল করার অনুমতি পান। গান্ধীজী সহজে রাজী হননি। উনি পোজ করবেন না।

মিসেস শেরিডান লেনিনেরও মূর্তি মডেল করেছিলেন। এগারো বছর আগে। তখন লেনিনও একই রকম শর্ত করেছিলেন। দু'জনের মধ্যে কৌতুহলপ্রদ সাদৃশ্য ছিল।

'The first time I found myself in his presence, the Mahatma said (just as Lenin had said), "I cannot pose, you must let me go on with my work, and do the best you can."

Gandhi squatting upon the floor proceeded with his weaving. Lenin in his office chair went on reading.

I sensed—on both occasions—a silent resentment, but in each case it ended on terms of great mutual friendship. One day Gandhi in almost the same words and with the same ironical smile as Lenin, observed :

"So you are a cousin of Mr. Winston Churchill !"

It was the same old joke : Winston's relation fraternising (yes ?) with his arch enemy ! And Gandhi pursued :

"You know he refuses to see me ? But you will tell him, won't you, from me how glad I am to see you."

Lenin in much the same way : "You will tell your cousin···etc"

And when their respective heads were finished and I asked one and the other the question : "What do you think of it ?" They answered identically, "I don't know—I cannot judge my own face, and I know nothing about Art—but you have worked well !"

লেনিনের সঙ্গে গান্ধীর এই সাদৃশ্যের বর্ণনায় মনে পড়ে লেনিনের মৃত্যুর কিছুদিন বাদে "লেনিন ও গান্ধী" বলে একখানি নামকরা বই বেরোয়। লেখক একজন অস্ট্রিয়ান। রেনে ফ্যুএলপ-মিলার। এ যুগে এক-বন্ধনীভুক্ত করবার মতো নাম ওই দুটিই। যদিও মতবাদ ভিন্ন।

কিংসলী হলে আমোদ আহ্লাদের সময়েও গান্ধীজীকে ডাক পড়ত। প্রায়ই লোক-নৃত্যস্থলে উপস্থিত থাকতেন। "মিঃ গান্ধী, আপনি কি আমাদের সঙ্গে নাচবেন না?"

শ্রমিক নরনারীর এই অনুরোধে গান্ধীজী বলতেন, "নিশ্চয়। আমার হাতের ছড়ি হবে আমার সঙ্গিনী।"

এটা হলো ওদের নির্দোষ বিনোদন। ওদের সঙ্গে একাত্ম হতে হলে এতে যোগ দিতে হয়। এ নিয়ে গান্ধীজীর এক পিউরিটান অনুবর্তী প্রশ্ন করলে তিনি বলেন, "যাদের সঙ্গে আমরা মিশতে চাই তাদের জীবনের ধারা বুঝতে হবে, তার সমঝদার হতে হবে। ভুলে যেয়ো না লোকনৃত্য হচ্ছে ইংরেজ জাতির একটি প্রাচীন প্রতিষ্ঠিত প্রথা।"

সময় করে তিনি দিন-দুই কাটিয়ে আসেন ল্যাঙ্কাশায়ারের মিল মজদুরদের সঙ্গে। যারা তাঁরই বয়কট আন্দোলনের দরুন বেকার। তাদের সমবেদনা জানিয়ে তিনি বোঝান যে বেকার হলেও তারা বুভুক্ষু নয়, যেমন ভারতের কর্মহীন ও অর্ধকর্মহীন নরনারী। তারা কি ভারতের কাটুনি ও তাঁতীদের মুখের গ্রাস কেড়ে নিয়ে নিজেরা সমৃদ্ধ হবে? তারা বোঝে ও তাঁর সঙ্গে একমত হয়। তাঁর সঙ্গে হাত ধরাধরি করে ফোটো তোলায়। চীৎকার দেয়। বেশীর ভাগই মজুরনী। তাদের মাঝখানে পড়ে গান্ধী যেমন সহাস তেমনি লজ্জাকুল।

একদিকে যেমন ইংলণ্ডের দীনদুঃখীদের সঙ্গে মেশা অন্যদিকে তেমনি ধার্মিক, বুদ্ধিজীবী, জ্ঞানী-গুণী তথা রাজনীতিকদের সঙ্গে। 'কোথাও আমার হারিয়ে যাওয়ার নেই মানা'। এমন কি রাজা পঞ্চম জর্জের বাকিংহাম প্রাসাদেও। সেখানেও সেই ফকিরের বেশ। রাজা বলেন, "দক্ষিণ আফ্রিকায় আপনাকে আমি দেখেছি। তখন ও তারপরেও ১৯১৮ সাল অবধি আপনি তো একজন ভালো মানুষ ছিলেন। পরে আপনার মধ্যে কিছু একটা বিগড়ে যায় বলে মনে হয়।" গান্ধী তাঁর সঙ্গে তর্ক করেন না। নীরব থাকেন। পরে যখন রাজা আরো বলেন যে বিদ্রোহ বরদাস্ত করা হবে না, দমন করা হবে, রাজসরকারকে চালু রাখতে হবে, তখন গান্ধীজী ভদ্রভাবে ও দৃঢ়তার সঙ্গেই প্রতিবাদ করেন।

ধার্মিকরা তাঁকে তাঁদেরই মতো একজন খ্রীষ্টান বলে আপনার করে নেন। মড রয়ডেনের মতে শ্রেষ্ঠ খ্রীষ্টান। যীশু খ্রীষ্টের তিনি যত কাছাকাছি আর কেউ তত নন। আরনেস্ট বারকারের মনে হলো যে গান্ধী হচ্ছেন এ যুগের সেণ্ট ফ্রান্সিস তথা সেণ্ট টমাস আকুইনাস। তাঁর মধ্যে যেমন এ দুইয়ের মিশ্রণ ঘটেছে তেমনি একজন প্র্যাকটিকাল কাজের লোকের। মিশ্রণটাই সারকথা। অবিমিশ্র হলে ফল হতো না।

অক্সফোর্ডের পরম সম্মানিত অধ্যাপকগণ—তাঁদের মধ্যে ছিলেন বেলিয়লের অধ্যক্ষ, গিলবার্ট মারে, মাইকেল স্যাডলার, পি সি লায়ন—তাঁকে তিন ঘণ্টা ধরে পরীক্ষা করেন। এ প্রসঙ্গে এডওয়ার্ড টমসন লিখেছেন—

"The conviction came to me, that not since Socrates has the world seen his equal for absolute self-control and composure ; and once or twice, putting myself in the place of men who had to confront that invincible calm and imperturbility, I thought I understood why the Athenians made the 'martyr-sophist' drink the hemlock."

ঘরে ফেরার পথে গান্ধীজী সুইটজারল্যাণ্ডের ভিলনভ গ্রামে রম্যা রলাঁর সঙ্গে মিলিত হন। রলাঁ তাঁকে স্টেশনে গিয়ে অভ্যর্থনা করেন, যদিও স্বয়ং অসুস্থ। আট বছর আগে রলাঁই 'মহাত্মা গান্ধী' লিখে তাঁকে বিশ্ববিখ্যাত করে দিয়েছিলেন। মীরাবেনকেও গান্ধীসকাশে পাঠিয়েছিলেন তিনিই। পরের দিন রলাঁ বলেন, "আমার তো ভয় ছিল যে এ জীবনে আপনার সঙ্গে দেখা হবে না। তার পূর্বেই চলে যেতে হবে।"

শোবার ঘরেই কথাবার্তা হয়। দেয়ালে দৃশ্যমান এই ক'জনের মস্তকের আলেখ্য— গোটে, বেঠোফেন, টলস্টয়, গর্কি, রবীন্দ্রনাথ, আইনস্টাইন, লেনিন ও গান্ধী। সেই গান্ধীই আজ উপস্থিত। কিন্তু সে লেনিন আর নেই। রলাঁর মহা খেদ লেনিনের সঙ্গে গান্ধীর কোনো দিন সাক্ষাৎ হলো না। "যে লেনিন আপনার মতোই কোনদিন মিথ্যের সঙ্গে আপস করেননি।" অর্থাৎ সত্যের থেকে নড়েননি।

ফরাসীবিপ্লবের মানসপুত্র রলাঁ একদা টলস্টয়ের দ্বারা প্রভাবিত হন। যুদ্ধকালে তিনি ছিলেন 'যুদ্ধের ঊর্ধ্বে'। যুদ্ধের সময় থেকে সুইটজারলণ্ডেই রয়েছেন। চার বছর আগেও আমি তাঁকে যুদ্ধবিরোধী দেখেছি। কিন্তু গান্ধীর সঙ্গে মিলনের পূর্বে তিনি ধীরে ধীরে শান্তিবাদ অতিক্রম করে যেখানে উপনীত হন সেটা যদিও লেনিনবাদ নয় তবু লেনিনের দেশের বিপ্লবকে যেমন করে হোক বাঁচিয়ে রাখার বজ্রকঠোর সংকল্প। তার মানে দরকার হলে যুদ্ধ।

হিংসা অহিংসা আর তাঁর কাছে মুখ্য ইস্যু নয়, যেমন ছিল 'মহাত্মা গান্ধী' রচনার কালে। এখনকার মুখ্য ইস্যু হচ্ছে বিপ্লব প্রতিবিপ্লব। গান্ধীর থেকে তিনি দূরে সরে গেছেন। কিন্তু যে গান্ধী সত্যনিষ্ঠ সে গান্ধীর কাছ থেকে নয়। সত্যই উভয়ের যোগসূত্র। সত্য নিয়ে দু'জনের আলোচনা হয়। ইউরোপের তৎকালীন অবস্থা নিয়ে রলাঁ যন্ত্রণায় ছটফট করছিলেন। কিন্তু বুঝতে পারছিলেন না অবস্থার সঙ্গে খাপ খাবে কোন্ ব্যবস্থা।

"হিংসার উত্তর না দিয়ে সহ্য করার বীরত্ব যদি কোনো নেশনের থাকে তবে সেইটেই হবে সব চেয়ে কার্যকর শিক্ষা। কিন্তু তার জন্যে চাই অখণ্ড বিশ্বাস।" ইতি গান্ধী।

"কোনোকিছুই আধাআধিভাবে করা উচিত নয়, তা সে ভালোই হোক আর মন্দই হোক।" ইতি রলাঁ।

গান্ধীর অনুরোধে রলাঁ তাঁকে বেঠোফেনের পঞ্চম সিম্ফনি পিয়ানোতে বাজিয়ে শোনান। এমনি করে পাঁচদিন অতিবাহিত হলে রলাঁ তাঁকে স্টেশনে নিয়ে গিয়ে বিদায় দেন। দু'জনে দু'জনের কাঁধে গাল রেখে মাথায় গাল ঠেকিয়ে সাদরে আলিঙ্গন ও চুম্বন করেন। "ওটা হচ্ছে সেন্ট ডমিনিক ও সেন্ট ফ্রান্সিসের চুম্বন।" উপমাটা রলাঁর।

॥ তেরো ॥

যীশুর সব চেয়ে কাছকাছি বলেই বোধহয় ক্যাথলিক ধর্মগুরু পোপ গান্ধীজীর দর্শন দেন না। তবে তাঁর খাতিরে ভাটিকানের গ্যালারিগুলো খুলে দেওয়া হয়। অপূর্ব শিল্পসম্পদের মাঝখানে তিনি হারিয়ে যান।

রম্যা রলাঁ সতর্ক করে দিয়েছিলেন বলে তিনি রোমে ফাসিস্টদের অতিথি হন না। কিন্তু মুসোলিনির সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন ও তাঁর মুখের উপর বলে আসেন যে, তিনি শুধু একটা তাসের কেল্লা গড়ছেন।

ব্রিন্দিসি থেকে জাহাজের ডেক প্যাসেঞ্জার হয়ে যাত্রা করেন গান্ধীজী। পেছনে পড়ে থাকে ইউরোপের, বিশেষ করে ইংলণ্ডের, তিনমাস। সেই তিনমাসে যা তিনি করেছেন তাকে দুই ভাগে বিভক্ত করা যায়। ভারতের কাজ ও অহিংসার কাজ। ভারতের কাজে যেমন বিশ্রাম নেই, তেমনি অহিংসার কাজেও। পশ্চিমকে তিনি অহিংসার বাণী শোনাবেন।

হায়! তখনকার দিনের ইউরোপে কেই বা অহিংসার বাণীতে কান দেবে! যখন ভারতেই চলেছে হিন্দু মুসলমানের অন্তহীন হানাহানি। আর থেকে থেকে সন্ত্রাসবাদী হামলা। আর ইউরোপের সঙ্কট তখন এমন গভীরভাবে ঘনিয়ে আসছে যে হিংসাকেই মনে হচ্ছে একমাত্র পন্থা। তা সে যতই বর্বর হোক। যতই অমানুষিক হোক।

ইউরোপকে তার স্বকীয় আধ্যাত্মিকতার উপর ছেড়ে দিয়ে গান্ধী ফিরে আসেন ভারতে। যেখানে সারা দেশ অধীরভাবে অপেক্ষা করছে নেতার জন্যে। নেতাবিহীন জনতা ঠিক যুদ্ধবিরতির নিয়মশৃঙ্খলা মেনে চলেনি, এখানে ওখানে শান্তিভঙ্গ করেছে। আর সরকারপক্ষও যে মান্য করেছে তা নয়। চুক্তিতে সরকারের প্রেস্টিজ হানি হয়েছে,

তাই কড়া হাতে সমঝিয়ে দিতে হয়েছে যে সরকারই বলবান। সন্ত্রাসবাদীরাও যথেষ্ট কারণ দিয়েছে দমননীতি অনুসরণের। গোটা-তিনেক অর্ডিনান্স জারি করতে হয়েছে তিনটি প্রদেশে।

দু'পক্ষেই যুদ্ধং দেহি। সুতরাং যুদ্ধ বেধে যেতে সাতটা দিনও লাগে না। গান্ধীজীকে ধরে নিয়ে গিয়ে বন্দী করে রাখা হয় পুণার য়েরওয়াদা জেলে। কংগ্রেস নেতারাও বন্দী হন। কংগ্রেস বেআইনী ঘোষিত হয়। আরো দশটা অর্ডিনান্স জারি করা হয়। খুব সম্ভব সেগুলি তিনমাস ধরে সরকারী কারখানায় তৈরি হচ্ছিল। যেমন তৈরি হচ্ছিল কংগ্রেসের আইন অমান্য পরিকল্পনা। যুদ্ধে নেমে নালিশ করা চলে না যে এটা অন্যায়, ওটা আইনবিরুদ্ধ।

আমরা সেদিন লক্ষ করি যে কোনো পক্ষই আইনকে কানাকড়ি দাম দিচ্ছে না। কংগ্রেস তো সোজাসুজি আইনভঙ্গের প্রোগ্রামই নিয়েছে, হিংসা এড়ানো ভিন্ন তার আর কোনো দায় নেই। আইনের শাসন বলে ব্রিটিশ শাসকদের যে গর্ব ছিল সেটাও আর আইনের নয়, অর্ডিনান্সের শাসন। জেল, জরিমানা তো তুচ্ছ কথা, বেত্রদণ্ডও বিহিত করা হলো। ঘরবাড়ি, জমিজমা, ব্যাঙ্ক ব্যালান্স, মোটরগাড়ি যেটা খুশি কেড়ে নিয়ে বাজেয়াপ্ত করলেই হলো। সব চেয়ে আজব কাণ্ড নাবালকদের অপরাধের জন্যে তাদের গুরুজনের শাস্তি।

চার্চিল পর্যন্ত মন্তব্য করতে বাধ্য হলেন যে সিপাহীবিদ্রোহের পর থেকে এমনতর কঠোর দণ্ডবিধির প্রয়োজন হয়নি। আর সার স্যামুয়েল হোর তো সাফ কথা শুনিয়ে দিলেন যে, এবার যেটা হবে সেটা অমীমাংসিত যুদ্ধ নয়।

তবে গান্ধীজী যে বলেছিলেন এবার শুধু লাঠি চার্জ নয়, বুলেটের সম্মুখীন হতে হবে, সেরকম কিছু ঘটল না। যত গর্জায় তত বর্ষায় না। সরকারকেও সব ক'টা অর্ডিনান্স সর্বতোভাবে প্রয়োগ করতে হয়নি। কংগ্রেসের আন্দোলনও তেমন গুরুতর পর্যায়ে পৌঁছয়নি।

"ব্যাপার কী, বলুন তো?" আমার এক ইউরোপীয় সহকর্মী বিস্মিত হয়ে সুধান। "এবারকার আন্দোলনটা হঠাৎ এমন ঠাণ্ডা মেরে গেল কেন? আমরা তো ভেবেছিলুম অনেকদিন ধরে গড়াবে। কংগ্রেসের দম যে এত কম তা কে জানত!"

ওঁদের আফসোসটা আন্তরিক। আন্দোলনটা জোর চলেছে দেখলেই ওঁরা যুদ্ধের স্বাদ পেতেন। সে স্বাদ ওঁদের জোগায় সন্ত্রাসবাদী দল। কিছুতেই তারা নিরস্ত হয় না।

ভারতের রাজধানীতে গান্ধীজীর আবির্ভাবের উদ্দেশ্যই হলো হিংসার সঙ্গে হিংসার দ্বন্দ্ব বাধতে না দেওয়া। তার পরিবর্তে হিংসার সঙ্গে অহিংসার দ্বন্দ্ব বাধানো।

সাধারণ যুদ্ধ হচ্ছে হিংসার সঙ্গে হিংসার দ্বন্দ্ব। আর সত্যাগ্রহ হচ্ছে হিংসার সঙ্গে অহিংসার দ্বন্দ্ব। ইতিহাসে এটা নতুন। যুদ্ধ যেখানে হাজার হাজার বছরের সত্যাগ্রহ সেখানে মাত্র পঁচিশ বছরের। যুদ্ধের নিয়মকানুন সকলের জানা। কিন্তু সত্যাগ্রহের নিয়মকানুন সত্যাগ্রহীদেরই অজানা।

সুতরাং কোনো পক্ষকেই দোষ দেওয়া যায় না। খেলার নিয়ম না জেনে খেলতে গেলে ভুলচুক যেমন হয়, বাড়াবাড়িও তেমনি হয়। আন্দোলনটাকে অমন কঠোর হস্তে দমন না করলেও চলত। কারণ ওর পরমায়ু সত্যি বেশীদিন ছিল না। যে কারণেই হোক মুসলমানরা দু'-তিনটি প্রদেশ ছাড়া অন্যত্র সরে দাঁড়িয়েছিল। যোগ দিতে যাদের দেখা গেল তারা অন্ততঃ বাংলাদেশে মুষ্টিমেয়। গণ আন্দোলন, অথচ গণই নেই, কারণ অধিকাংশ জেলায় গণ বলতে বোঝায় মুসলমানগণ।

একজন হিন্দু আর একজন মুসলমানকে আমি একসঙ্গে জেলে আটক করতে পাঠিয়েছিলুম। অকারণে নয় অবশ্য। ইংরেজ জেলা শাসক মুসলমানটিকে পত্রপাঠ ছেড়ে দেন ও বলেন, "তোমাদের সঙ্গে আমাদের কোনো ঝগড়া নেই।"

ডিভাইড অ্যাণ্ড রুল। তবে কিছুদিন বাদে হিন্দুটিকেও সতর্ক করে দিয়ে ছেড়ে দেন। পরিস্থিতি আয়ত্তে এসেছিল। কত সহজে আয়ত্তে এল যখন ভাবি তখন আমারও আফসোস হয় যে কেন অত কড়াকড়ি করা।

তেরোটা অর্ডিনান্স যা পারেনি একা ম্যাকডোনাল্ডের রোয়েদাদ তা পারল। দিল অতি সুস্পষ্ট আভাস যে বাংলাদেশের বরাতে আছে ইউরোপীয় সমর্থিত মুসলিম মেজরিটি গবর্নমেন্ট। তা তুমি যতই লাফাও আর যতই চ্যাঁচাও আর যতই সাহেব নিপাত কর।

মিয়া ভাইরা যে ক'জন যোগ দিয়েছিলেন সে ক'জনও সরে গেলেন। কোথায় গান্ধীজীর সাধের স্বপ্ন যে তাঁর গণসত্যাগ্রহে সব সম্প্রদায়ের লোক সমানে ঝাঁপ দেবে! আর কোথায় অপ্রীতিকর বাস্তব! আন্দোলনটাকে নিমু্সলমান করাই ছিল কর্তাদের উদ্দেশ্য। আর গান্ধীজীর উদ্দেশ্য ছিল তার বিপরীত। উত্তর-পশ্চিম সীমান্তে তাঁর উদ্দেশ্য সার্থক হয়। কিন্তু বাংলাদেশে ব্যর্থ। ইংরেজের কূটনীতি বাংলাকে তুলে দেয় ইউরোপীয় সমর্থিত মুসলিম মেজরটির হাতে।

ওটা ছিল সন্ত্রাসবাদীদের দুরস্ত করতে না পেরে হিন্দুদের—বিশেষ করে বর্ণহিন্দুদের —শায়েস্তা করার উপায়। কেমন! আর লাগবে আমাদের সঙ্গে! হুঁ! আমাদের এতকালের গদী তোমাদের ছেড়ে দিয়ে যাব!

এখানে বলে রাখা দরকার যে ১৯১৬ সালে লখ্‌নউ চুক্তি যখন সম্পাদিত হয় তখনো বাংলাদেশে মুসলমান সংখ্যাগরিষ্ঠতা ছিল। কিন্তু চুক্তি অনুসারে বাংলার মুসলমানদের

খরচে বিহার, যুক্তপ্রদেশ ইত্যাদির মুসলমানদের ওয়েটেজ দেওয়া হয়। আর ওইসব প্রদেশের হিন্দুদের খরচে বাংলার হিন্দুদের ওয়েটেজ দেওয়া হয়। ম্যাকডোনালড যদি লখ্‌নউ চুক্তিকে পুরোপুরি অগ্রাহ্য করে নতুন করে ভাবতেন তা হলে একরকম হতো। কিন্তু লখ্‌নউ চুক্তিকে মোটামুটি বহাল রেখেই তিনি তার ব্যালান্স নষ্ট করলেন। ব্যালান্স গেল মুসলমানদের অনুকূলে। যেখানে তারা মাইনরিটি সেখানে তাদের জন্যে ওয়েটেজ। যেখানে তারা মেজরিটি সেখানে হিন্দুদের জন্যে ওয়েটেজ নয়। তবে পাঞ্জাবে শিখদের ওয়েটেজ অব্যাহত। সেখানে মুসলমান অমুসলমান সমান সমান।

রোয়েদাদের এইদিকটার বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করা যায়, কিন্তু মরণপণ অনশন করা অনুচিত। অনিষ্ট যেটা সেটা লখ্‌নউ চুক্তিই করে রেখেছিল স্বতন্ত্র নির্বাচন স্বীকার করে। শুধু স্বীকার করে নয়, তাকে সর্বত্র ছড়িয়ে। মর্লি মিণ্টো যা করতে সাহস পাননি তখনকার দিনের কংগ্রেস জননেতারাই তা করেছিলেন। এখন তথাকথিত অস্পৃশ্যরাও যদি দাবী করে যে তাদের জন্যেও স্বতন্ত্র নির্বাচনের ব্যবস্থা হোক ম্যাকডোনালড কোন যুক্তিবলে প্রত্যাখ্যান করবেন? তিনি মর্লি মিণ্টোর অনুসরণে কতক জায়গায় স্বতন্ত্র নির্বাচন ও কতক জায়গায় যৌথ নির্বাচন ব্যবস্থা করলেন। তাঁর মতে ওটা হিন্দুসমাজের পক্ষে ক্ষতিকর হবে না। মাত্র গোটাকয়েক আসন স্বতন্ত্র। আর সব তো একত্র।

মর্লি মিণ্টোর সময়ও তো ছিল মাত্র কয়েকটি আসন মুসলমানদের বেলা স্বতন্ত্র। আর সব একত্র। আরম্ভটা একই রকম। পরিণতিটাও তো একই রকম হবে। ছুঁচ হয়ে ঢোকে, ফাল হয়ে বেরোয়। একবার ওটা উপলব্ধি করার পর কেমন করে ওর প্রশ্রয় দেওয়া যায়? হিন্দু মুসলমান ভেদবুদ্ধি যথেষ্ট অশান্তিকর। বর্ণহিন্দু অবর্ণহিন্দু ভেদবুদ্ধি কি আরো অশান্তিকর হবে না? এতে শুধু রাষ্ট্র নয়, সমাজও দুর্বল হবে। সমাজসংস্কার বাধা পাবে। অস্পৃশ্যতা কতক লোকের পক্ষে লাভজনক হয়ে কায়েমী স্বত্ব হয়ে দাঁড়াবে।

রাজনৈতিক কারণে নয়, নৈতিক তথা আধ্যাত্মিক কারণে গান্ধীজী স্থির করেন তিনি আমরণ অনশন করবেন। এটা যে রোয়েদাদের পর তাঁর মাথায় আসে তা নয়। গোল টেবিল বৈঠকেই তিনি এর আভাস দিয়েছিলেন, পরে ভারতসচিবকে জেল থেকে চিঠি লিখে সতর্ক করে দিয়েছিলেন। তাঁর অনুভূতির গভীরতা কেউ পরিমাপ করেননি। সত্যি কি তিনি অমন তুচ্ছ কারণে আমরণ অনশন করবেন?

দেশবাসীদের অনেকের মতেও ওটা তেমন কিছু গুরুতর নয়, যেমন গুরুতর রোয়েদাদের অন্যান্য অংশ। মহাত্মার আমরণ অনশনের জন্যে বিশেষ কেউ প্রস্তুত ছিলেন না। খবরটা তাই বোমার মতো ফেটে পড়ে। দেশময় উদ্বেগের স্রোত বয়ে যায়।

ম্যাকডোনালড জানিয়ে দেন যে ভারতীয় সম্প্রদায়গুলি নিজেদের মধ্যে একমত না হওয়ায় ব্রিটিশ সরকারকে বাধ্য হয়ে তাঁদের সিদ্ধান্ত জানাতে হয়েছে ; সিদ্ধান্তের রদবদল একতরফা হবে না, হবে যদি সংশ্লিষ্ট সম্প্রদায়গুলি একমত হয়।

অর্থাৎ নিজেরাই স্থির করে নিজেদের গ্রহণযোগ্য একটা বিকল্প। ম্যাকডোনালড সেটা মেনে নেবেন। যেমন লখ্‌নউ চুক্তি মেনে নিয়েছিলেন মণ্টেগু চেমসফোর্ড।

অনশনরত মহাত্মাকে ঘিরে দরবার বসে যায়। সরকার অনুমতি দেন। এবার কেন্দ্রীয় পুরুষ হচ্ছেন আম্বেদকর। মহাত্মার জীবনমরণ তাঁরই হাতের মুঠোয়। তিনি যদি পাষাণ হন তো মহাত্মার প্রাণের আশা নেই। তাই আম্বেদকরের হৃদয়ের উপর চাপ পড়ে। কিন্তু তার মস্তিষ্ক তা বলে অভিভূত হয় না। তিনি স্বতন্ত্র নির্বাচন ছেড়ে দেন বটে, কিন্তু তার বিনিময়ে আদায় করে নেন অনেক বেশী আসন। সেসব আসনের জন্যে নির্বাচন অনুষ্ঠিত হবে এমন এক পদ্ধতিতে যে হরিজন প্রার্থীদের হরিজনরাই প্রথমে ভোট দিয়ে মনোনয়ন করবে, তারপরে হিন্দুরা সমবেতভাবে ভোট দেবে। পুণা চুক্তি হিন্দুরা সবাই মেনে নিলে ব্রিটিশ সরকারও সেই অনুসারে রোয়েদাদের সংশোধন করবেন।

লখ্‌নউ চুক্তির সঙ্গে পুণা চুক্তির পার্থক্য এইখানে যে একটাতে যেমন স্বতন্ত্র নির্বাচনের নীতিটাকে স্বীকার করে নিয়ে সেই ভিত্তির উপরে বিভিন্ন সম্প্রদায়ের মধ্যে সামঞ্জস্য প্রতিষ্ঠা করা হয়েছিল অপরটাতে তেমনি সেই নীতিটাকে অস্বীকার করে আসন সংরক্ষণের ভিত্তিতে বর্ণহিন্দু ও অবর্ণহিন্দুদের মধ্যে সামঞ্জস্য বিধান করা হয়। হায়! এ বুদ্ধি কেন ১৯১৬ সালে কারো মাথায় আসেনি! কেউ কেন হৃদয়ঙ্গম করেননি যে স্বতন্ত্র নির্বাচন মেনে নেওয়া মুসলমানকে অমুসলমানের থেকে ও অমুসলমানকে মুসলমানের থেকে স্বতন্ত্র করে উভয়কে সাধারণের প্রতিনিধিত্ব থেকে বঞ্চিত করা? আর সাধারণকেও প্রতিনিধি নির্বাচনের স্বাধীনতা থেকে বঞ্চিত করা?

ম্যাকডোনালড আমাদের একটি গ্লানির থেকে মুক্ত করলেন। আমাদের আর অমুসলমান বলে পরিচয় দিতে হলো না। তার বদলে 'সাধারণ' শব্দটি চলিত হলো। বলা বাহুল্য মুসলমান বাদে ও শিখ বাদে সাধারণ। মাইনরিটির সংখ্যা ওই দুটিতে সীমাবদ্ধ। ধর্মীয় মাইনরিটির কথা বলছি।

গান্ধীজী এখন থেকে তথাকথিত অবর্ণহিন্দুদের নিয়ে ব্যাপৃত রইলেন। তাদের নতুন নামকরণ হলো সরকারী মতে তফশিলী জাত, আর গান্ধীজীর মতে হরিজন। নামটা কিন্তু তাঁর নিজের উদ্ভাবন নয়। এক অস্পৃশ্য পত্রলেখকের কাছে ওটি তিনি পান। গুজরাটের প্রথম কবিসন্ত নাকি ওটি প্রথমে ব্যবহার করেন, কিন্তু অন্য প্রসঙ্গে।

'হরিজন' বলে যে পত্রিকার উদ্বোধন হয় তার জন্যে আম্বেদকরকে একটি বাণী পাঠাতে অনুরোধ করা হয়। তার উত্তরে তিনি বাণী দেন না, দেন তাঁর অভিমত। তিনি বলেন,

"The outcaste is a by-product of the caste system. There will be outcastes as long as there castes. And nothing can emancipate the outcaste except the destruction of the caste system."

গান্ধীজী তখনো জাতিভেদে বিশ্বাস করতেন, কিন্তু অস্পৃশ্যতায় না। কিন্তু জীবনের শেষ প্রান্তে তাঁর বিশ্বাস বদলায়। তিনিও তখন জাতিহীন সমাজের পক্ষপাতী হন। কিন্তু যে সময়ের কথা বলা হচ্ছে সে সময় একটি পদক্ষেপই যথেষ্ট। সেটি অস্পৃশ্য বলে কাউকে কোনো সাধারণ অধিকার থেকে বঞ্চিত না করা। মন্দির-প্রবেশেও স্পৃশ্যাস্পৃশ্যভেদ থাকবে না।

এই যেমন লক্ষ্য তেমনি পদ্ধতি হলো বর্ণহিন্দুদের স্বতঃপ্রণোদিত অন্তঃপরিবর্তন। তার জন্যে অবর্ণহিন্দুদের সত্যাগ্রহ বা অন্যপ্রকার আন্দোলন করতে হবে না। যা করবার তা বর্ণহিন্দুরাই করবে। বর্ণহিন্দুদের মধ্যে অবশ্য দু'রকম মত ছিল। সংস্কারকামী ও সংস্কারবিরোধী। যাতে দ্বন্দ্ব না বাধে তারই উপর ছিল গান্ধীজীর দৃষ্টি।

হরিজন আন্দোলন উপলক্ষে গান্ধীজীকে আরো একবার অনশন করতে হয়। এটা সরকারের ব্যবহারে উত্ত্যক্ত হয়ে নয়, সংস্কারবিরোধীদের আচরণে মর্মাহত হয়ে। অনশনের কারণ জানতে পেরে সরকার তাঁকে বিনা শর্তে খালাস দেন। তিনি তখন জেলের বাইরে গিয়ে তাঁর অনশন সমাপন করেন। একুশদিনের অনশন।

এরপরে তিনিও ভদ্রতা করে গণসত্যাগ্রহ একমাসের জন্যে বন্ধ রাখেন। উদ্দেশ্য সরকারের সঙ্গে আলাপ আলোচনা। কথাবার্তা সফল হলে তিনি গণসত্যাগ্রহ একেবারেই বন্ধ করার সিদ্ধান্ত নিতেন। অবশ্য কংগ্রেস নেতারা রাজী হলে। কিন্তু আলাপ আলোচনার প্রস্তাব শুনে সরকারপক্ষ জানিয়ে দেন যে সর্বপ্রথমে গণসত্যাগ্রহ বিনা শর্তে প্রত্যাহার করতে হবে। তার মানে পরাজিতের মতো অস্ত্র সমর্পণ করতে হবে। বিজিত দেশের সেনাপতি বিজেতা দেশের সেনাপতির কাছে যেমন তরবারী সমর্পণ করেন।

না, তেমন কিছু করবেন না গান্ধীজী। হিংসার তরবারি বহুপূর্বেই বিজেতা ইংরেজের হাতে সমর্পণ করা হয়েছে। তার উপর যদি অহিংসার অস্ত্রটিও সমর্পণ করা হয় তবে হাতে রইল কী? তিনি তাঁর বেদনাভরা অন্তর দিয়ে অনুভব করছিলেন যে অর্ডিনান্সের প্রহারে দেশবাসী জর্জর। শাস্তির বোঝা বইতে দারুণ কষ্ট হচ্ছে। মনের জোর ভেঙে যাচ্ছে। চাই এখন সম্মানজনক সন্ধি। তা বলে অস্ত্র সমর্পণ? না; কদাচ নয়।

জেলের বাইরে সেলময় যেসব সহকর্মীকে পাওয়া গেল তাঁদের সঙ্গে পরামর্শ করে পরিশেষে এই স্থির হলো যে গণসত্যাগ্রহ তুলে নেওয়া হবে, ব্যক্তিসত্যাগ্রহ চালিয়ে যাওয়া হবে। গান্ধীজী তখন সবরমতী যান, আশ্রম গুটিয়ে নেন, তেত্রিশ জন সহচর নিয়ে যাত্রা করেন রাস অভিমুখে। তাঁকে গ্রেপ্তার করে পাঠিয়ে দেওয়া হয় আবার সেই য়েরওয়াদা জেলে। কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে ছেড়ে দেওয়া হয় এই আদেশ দিয়ে যে পুণায় অবস্থান করতে হবে। তিনি সে আদেশ মান্য করবেন না বলায় তাঁর বিচার হয়, বিচারে একবছরের কারাদণ্ড।

এবারেও তিনি জেল থেকে হরিজন আন্দোলন চালাবার অনুমতি চান, কিন্তু পান না। কারণ এবার তিনি আটক বন্দী নন, দণ্ডিত কয়েদী। তিনি আবার অনশন করেন। তখন তাঁকে বিনা শর্তে খালাস দেওয়া হয়। এই বেড়াল ইঁদুর খেলা তাঁর ভালো লাগে না। তাঁর প্রাণ চায় হরিজনদের কাজ নিয়ে থাকতে। ব্যক্তিসত্যাগ্রহ তার সঙ্গে বেখাপ। তিনি নিজের জন্যে বেছে নেন এক বছরের হরিজন সেবা। কিন্তু অপরের জন্যে ব্যক্তি সত্যাগ্রহ প্রত্যাহার করা হয় না।

সেকালের পরিব্রাজকদের মতো তিনি পদব্রজে ভারতের অস্পৃশ্যবহুল অঞ্চলগুলি পর্যটন করেন। বুদ্ধের মতো প্রচার করেন অস্পৃশ্যদের মুক্তির বাণী। সেটাও তো স্বরাজের অঙ্গ।

॥ চৌদ্দ ॥

ব্যক্তি সত্যাগ্রহ অবশ্য যে কোনো ব্যক্তি যে কোনো সময় করতে পারেন, কিন্তু গণ-সত্যাগ্রহ হলো বিপ্লবের মতো অপৌরুষেয়। লেনিন বা গান্ধী তার নিমিত্তমাত্র। তাঁদের কান পেতে থাকতে হয় কখন জনগণের জীবনে জোয়ার আসবে। জোয়ার না এলে জনগণকে ডাক দেওয়া বৃথা। তারা সাড়া দেবে না। তেমনি জোয়ার এসে চলে গেলে, ভাঁটা পড়লে, জনগণকে ঝাঁপ দিতে বলা নিষ্ফল। তারা অসাড়।

গান্ধীজীর গণসত্যাগ্রহ ১৯৩০ সালে বিস্ময়করভাবে সফল হয়েছিল, কারণ সেটা ছিল জোয়ারের সময়। কিন্তু ১৯৩২ সালে অপ্রত্যাশিতরূপে বিফল হলো, কারণ ততদিনে ভাঁটা শুরু হয়ে গেছে। সময় বা জোয়ার কারো জন্যে সবুর করে না। মহাত্মার জন্যেও না। যা করবার তা সময় থাকতে করে নিতে হয়।

গান্ধী আরউইন চুক্তি একদিক থেকে একটা জয়। আরেকদিক থেকে একটা ছেদ।

অবশ্য গণসত্যাগ্রহ অব্যাহতভাবে চলতে থাকলেও যে পূর্ণ স্বরাজের ঘাটে পৌঁছে দিত তা নয়। ওকে দমন করবার শক্তি ভারত সরকারের ছিল। শক্তির সঙ্গে সঙ্গে ছিল শাঠ্য। ডিভাইড অ্যাণ্ড রুল। গান্ধী গোল টেবিল বৈঠকে যোগ না দিলেও সাম্প্রদায়িক রোয়েদাদ যথাকালে ঘোষিত হতো। জনগণ ভিন্ন হয়ে যেত।

এ সমস্যা লেনিনের দেশে ছিল না। ব্রিটিশ সরকার জানতেন যে তুরুপের তাস সব সময় তাঁদের হাতে। যাবার সময়ও হিন্দু মুসলমানের কান ধরাধরি করিয়ে দিয়ে যেতেন। তখন তাঁরাই মধ্যস্থ হয়ে যাকে যা দিয়ে যেতেন তাই তার পাওনা। তার বেশী নয়।

হরিজন পরিক্রমার সময় গান্ধীজীর কল্পনা ছিল নতুন কিছু না ঘটলে তিনি এক বছর বাদে জেলে ফিরে যাবেন। ব্যক্তিসত্যাগ্রহ চলতে থাকবে।

হঠাৎ ঘটে গেল বিহারের ভূমিকম্প। দক্ষিণের হরিজন সফর আধখানা ফেলে রেখে মহাত্মাকে ছুটতে হলো বিহারে। সেখানে যখন তিনি সেবাকর্মে ব্যাপৃত তখন দিল্লীতে এক বৈঠক সেরে পাটনায় উদয় হন ডাক্তার অনসারী, ডাক্তার বিধান রায় ও ভুলাভাই দেশাই। গান্ধীজীকে এঁরা বোঝান যে বহুসংখ্যক কংগ্রেসকর্মীর মতে আরেকবার স্বরাজ পার্টি গঠন করার প্রয়োজন দেখা দিয়েছে। সামনেই কেন্দ্রীয় নির্বাচন। কিন্তু পার্লামেন্টারি প্রোগ্রাম গ্রহণ করার পূর্বে আইন অমান্যের প্রোগ্রাম পরিত্যাগ করতে হবে। নইলে গবর্নমেন্ট কংগ্রেসকে আইনসম্মত প্রতিষ্ঠান বলে গণ্য করবেন না। নির্বাচনে কংগ্রেসের জনবলের সাহায্য পাওয়া যাবে না। স্বরাজ পার্টি কী করে জিতবে? এখন মহাত্মা যদি দয়া করে আইন অমান্যের প্রোগ্রাম তুলে নেন সরকার আবার কংগ্রেসকে আইনসঙ্গত প্রতিষ্ঠান বলে গণ্য করবেন।

এর পরে রাঁচীতে আরো অনেক নেতা তাঁর সঙ্গে মিলিত হন। তাঁদের সঙ্গে আলাপ আলোচনায় আরো পরিষ্কার হয় যে পার্লামেন্টারি প্রোগ্রামের খাতিরে গণসত্যাগ্রহ তো বন্ধ করতে হবেই, ব্যক্তিসত্যাগ্রহও চলতে দেওয়া হবে না। এমন কি মহাত্মা যে কংগ্রেসের নামে বা কংগ্রেসের তরফ থেকে একক সত্যাগ্রহ করার স্বাধীনতা হাতে রাখবেন তাতেও সরকারের আপত্তি হতে পারে।

গান্ধীজী শেষকালে উপলব্ধি করেন যে কংগ্রেস একই কালে আইনসঙ্গত প্রতিষ্ঠান ও আইন অমান্যকারী প্রতিষ্ঠান হতে পারে না। গান্ধীজীকে তার নামে ও তার তরফ থেকে একক সত্যাগ্রহের স্বাধীনতা দিলে সরকারের দৃষ্টিতে তার কার্যকলাপ বেআইনী বলে প্রতিভাত হবে। তখন একজনের অপরাধে সমগ্র প্রতিষ্ঠান বেআইনী বলে ঘোষিত হবে। সেটা কংগ্রেসের পক্ষে অস্তিত্বহানি। বিশেষত যদি সে পার্লামেন্টারি প্রোগ্রাম গ্রহণ করার সংকল্প নিয়ে থাকে।

আনসভায়ই যাওয়া নিয়ে গান্ধীজীর ব্যক্তিগত মত অসহযোগের সময় যেমন ছিল এখনো তেমনি। কিন্তু কংগ্রেসের বহুসংখ্যক কর্মীর মত অন্যরূপ। তাঁদের সঙ্গে সেবারেও তিনি যেমন রফা করেছিলেন এবারেও তেমনি করলেন। কিন্তু এবারকার রফার বৈশিষ্ট্য হলো তিনি কংগ্রেসের চার আনার সদস্যও রইলেন না। একেবারে কংগ্রেসের বাইরে চলে গেলেন।

কী দুঃখের কথা! গান্ধীহীন কংগ্রেস। শিবহীন যজ্ঞ। এ কি কখনো ভাবা যায়! কিন্তু এ না করে তাঁর উপায় ছিল না। গবর্নমেণ্ট জেদ ধরে বসেছিলেন যে কংগ্রেসকে তার অস্ত্র সমর্পণ করতে হবে। কোনোরকম আইন অমান্য চলবে না। না গণসত্যাগ্রহ, না ব্যক্তিসত্যাগ্রহ। আইন অমান্য চলতে থাকলে বা তার সম্ভাবনা থাকলে কংগ্রেসকে পার্লামেণ্টারি কাজ করতে দেওয়া হবে না। প্রতিষ্ঠানের একটা বড়ো অংশ এখন পার্লামেণ্টারি প্রোগ্রামে কৃতসংকল্প। এঁরা যদি আইনসভায় যাবার জন্যে কংগ্রেস ত্যাগ করেন তবে কংগ্রস ভেঙে যাবে। বেআইনী প্রতিষ্ঠান হিসাবে বেঁচে থাকা না থাকা সমান।

তা হলে কি গান্ধীজীও কংগ্রেসের মতো অস্ত্রসমর্পণ করবেন? না, কিছুতেই না। তার চেয়ে কংগ্রেস থেকে নাম কাটিয়ে নেবেন। একজন সদস্য কংগ্রেস ত্যাগ করলে প্রতিষ্ঠানের তেমন কিছু ক্ষতি হবে না। কিন্তু সেই একজন সদস্য যদি প্রতিষ্ঠানের স্বার্থে তাঁর হাতের অহিংসার অস্ত্র সমর্পণ করেন তবে দেশের ক্ষতি, জগতেরও ক্ষতি, কারণ হিংসার উপরে অহিংসার জয় প্রমাণ করা হয় না। বরং তিনি যদি কংগ্রেস থেকে সরে থাকেন তা হলে কংগ্রেসকেও একদিন আপনার দিকে টানতে পারবেন। আর যদি নিতান্তই তা না পারেন তবে তাঁর একক সত্যাগ্রহের স্বাধীনতা তো থাকছেই। তা ছাড়া থাকছে উপযুক্ত সময়ে গণসত্যাগ্রহের ডাক দেবার অবাধ স্বাধীনতা। কংগ্রেস ত্যাগ মানে গণসত্যাগ্রহ ত্যাগ নয়। বরং গণসত্যাগ্রহ রক্ষা।

তা ছাড়া আরো গভীর কারণ ছিল। গণসত্যাগ্রহ দিয়ে তিনি ক্ষমতা দখল করতে চাননি, চেয়েছিলেন বিদেশী শাসকদের অন্তঃপরিবর্তন ঘটাতে। সেইসঙ্গে স্বদেশী সন্ত্রাসবাদীদেরও। কিন্তু তিনি লক্ষ্য করেন কোনো পক্ষেরই অন্তঃপরিবর্তন হয়নি। হিংসার সঙ্গে অহিংসার দ্বন্দ্ব হিংসার অন্তরে ভাবান্তর আনেনি। গান্ধীজী যে-কাজের জন্যে পৃথিবীতে এসেছেন সে কাজ এখনো অপ্রতিষ্ঠিত। কংগ্রেস তাঁকে যতটা সাহায্য করবার করেছে, এখন থেকে তিনি তাঁর একার উপর নির্ভর করতে চান। তিনি সরাসরি জনগণের কাছে যাবেন, কংগ্রেসের মধ্যস্থতায় নয়। তাঁর বাণী শিক্ষিত সম্প্রদায়ের মারফৎ বিকৃতভাবে পৌঁছয়, তাই জনগণ ভুল বোঝে। একক সত্যাগ্রহী

হয়েও তিনি অনেক দূর যেতে পারবেন, তাঁর বাণী অনেকের কানে পৌঁছে দিতে পারবেন। কংগ্রেসের বাইরে গেলেই বরং তাঁর আত্মনির্ভরতা ও আত্মবিশ্বাস বাড়বে। তাঁর কর্মের স্বাধীনতাও। তাঁর যখন ইচ্ছা তখন সত্যাগ্রহের সিদ্ধান্ত নিতে পারবেন, কংগ্রেসের সমর্থনের জন্যে অপেক্ষা করতে হবে না। তিনি প্রতিষ্ঠানের ভারমুক্ত হতে চান। বিশেষত কংগ্রেসের মতো প্রতিষ্ঠানের, যে গঠনকর্মে মনোযোগী নয়, সুতরাং অহিংসা সম্বন্ধে সীরিয়াস নয়। গঠনকর্ম বিনা অহিংসা হয় না, অহিংসা বিনা সত্যাগ্রহ হয় না, সত্যাগ্রহ বিনা স্বরাজ হয় না। কংগ্রেস কি বোঝে এ যুক্তি? মানে এর যথার্থতা? গঠনকর্মই সেই নিত্য কর্ম যা সত্যাগ্রহীকে সংযুক্ত রাখে জনগণের সঙ্গে। সংযোগ ভিন্ন শক্তি নেই। শক্তিহীনের সত্যাগ্রহ কারো অন্তর স্পর্শ করে না। না বিদেশী শাসকদের। না স্বদেশী সন্ত্রাসবাদীদের।

তার চেয়েও গভীর কারণ ছিল। বিশের দশকে কংগ্রেসে যাঁরা ছিলেন তাঁরা সকলেই মোটের উপর গান্ধীপন্থী। যদিও তাঁদের একদল তাঁর অনিচ্ছাসত্ত্বে পার্লামেন্টারি কর্মপন্থায় আগ্রহী। কিন্তু ত্রিশের দশকে কংগ্রেসের ভিতরে এমন বহু কর্মীর সমাগম হয় যাঁরা গান্ধীজীর গণসত্যাগ্রহের চেয়ে লেনিনের শ্রেণীসংগ্রামেই অধিকতর আস্থাবান, সেইজন্যে গান্ধীনেতৃত্বে কম আস্থাবান। এঁরা চান গণসত্যাগ্রহ যাতে শ্রেণীসংগ্রামের দিকে মোড় নেয়। গান্ধী সেটা কিছুতেই হতে দেবেন না। তেমন সংগ্রাম কিছুতেই অহিংসার সঙ্গে খাপ খেতে পারে না। অথচ কংগ্রেসের মতো গণতান্ত্রিক প্রতিষ্ঠানে এঁদেরও স্থান আছে। হয়তো এঁরাই হবেন সংখ্যায় ভারী। গান্ধীজী যদি কংগ্রেসে থাকেন তাঁকে এঁদের সঙ্গে ভোটদ্বন্দ্বে নামতে হতে পারে। এঁদের অনাস্থা প্রস্তাবের সম্মুখীন হওয়াও বিচিত্র নয়। এঁদের কাছে হেরে গেলে এঁদের বিরোধীপক্ষ হিসাবেও কাজ করতে হতে পারে। তার চেয়ে কংগ্রেসের থেকে নাম কাটিয়ে নেওয়া শ্রেয়। বাইরে থেকেই বরং তিনি কংগ্রেসকে আরো বেশী কাছে টানতে পারবেন।

সত্যি তাই হলো। সন্ন্যাসী কমলীকে ছাড়লেন, কিন্তু কমলী সন্ন্যাসীকে ছাড়ল না। তাঁর উপর কংগ্রেসের আস্থা বহুগুণ বেড়ে গেল। কংগ্রেসের বম্বে অধিবেশনে তিনি যখন উপনীত হন তখন আশী হাজার সভ্য ও দর্শক একসঙ্গে উঠে দাঁড়ান। তাঁর নেতৃত্বের উপর আস্থাসূচক প্রস্তাব একবাক্যে গৃহীত হয়। যাঁর পরিচালনায় লক্ষ লক্ষ লোকের জেল জরিমানা বেত্রদণ্ড সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত হলো, কারো কারো প্রাণ গেল, শেষ পর্যন্ত কী এনে দিলেন তিনি? পূর্ণ স্বরাজও নয়, আংশিক স্বরাজও নয়। তথাপি তাঁর বিরুদ্ধে নালিশ নেই কারো। সকলেই ব্যথিত যে তিনি কংগ্রেস সদস্য থাকবেন না।

আসলে গণসত্যাগ্রহ ছিল এমন এক ঐতিহাসিক অভিজ্ঞতা যে তাতে অংশ গ্রহণ করাটাই পরম সৌভাগ্য। যেমন স্বাধীনতার যুদ্ধে যোগদান। সেই মহামূল্য অভিজ্ঞতা যিনি এনে দিয়েছেন তাঁর কাছে মানুষ এমনিতেই কৃতজ্ঞ। সিদ্ধি এনে দিলেন কি না সেটা অতিরিক্ত। সিদ্ধি কি কেবল একজনের উপর নির্ভর? আর ব্যর্থতার নিরিখ কী? লক্ষ লক্ষ নরনারীর এই যে আত্ম উপলব্ধি এটা কি আর কোনো উপায়ে হতো? এটা কি সার্থকতা নয়?

পরাজয়ও পরাজয় নয়, যদি সৈন্যদলের সংগঠন অটুট থাকে, যদি মনোবল অটুট থাকে, যদি সেনাপতির উপর সৈন্যদলের আস্থা অটুট থাকে, আনুগত্য অটুট থাকে। গান্ধীজীর অস্ত্র তাঁর আপনার হাতেই রয়ে গেছে, আর কারো হাতে সমর্পণ করা হয়নি। তিনি আর একদিন লড়বেন বলেই বেঁচে আছেন। তার আগে প্রাচীরগুলো ভালো করে সারাবেন। কংগ্রেসকে পার্লামেণ্টারি কর্মপন্থা নিয়ে দ্বিমত হতে দেবেন না, বিভক্ত হতে দেবেন না। যখন যে কর্মপন্থা নেওয়া হবে তখন সেটা একমত হয়ে নেওয়া হবে, শৃঙ্খলার সঙ্গে মানা হবে। তিনি নিজে ভিন্নমত পোষণ করলেও আপাতত পার্লামেণ্টারি কর্মপন্থাকেও একটা সুযোগ দেবেন অন্যান্য নেতাদের খাতিরে।

পার্লামেণ্টারি কর্মপন্থা সম্বন্ধে এই যে নরমভাব এটার আরো একটা গূঢ় কারণ ছিল। সেটা তখন কেউ জানতেন না। পরে জানা গেল। সরকারী নিপীড়ন কংগ্রেসের সহায় হলো। নিপীড়িত জনগণ কংগ্রেসকেই ভোট দিয়ে জিতিয়ে দিল। যেসব প্রদেশের আইনসভায় কংগ্রেস সংখ্যাগরিষ্ঠতা পেলো সেসব প্রদেশে কি কংগ্রেস মন্ত্রিত্ব গ্রহণ করবে? যদি গ্রহণ করে তবে গভর্নররা কি তাঁদের অঙ্কুশ প্রয়োগে বিরত থাকবেন? এ দুটি প্রশ্ন পরস্পর-নির্ভর। গান্ধীজীই কংগ্রেসকে অপেক্ষা করতে বলেন। প্রায় মাস ছয়েক ধরে সরকারপক্ষের সঙ্গে বিতর্ক চলে। ইতিমধ্যে অন্যান্য প্রদেশে অন্যান্য দলের মন্ত্রীমণ্ডল গঠন করা হয়ে যায়। নতুন শাসনসংস্কার আইন অনুসারে ছ'মাসের মধ্যে মন্ত্রীমণ্ডল গঠন করা চাই, নয়তো গভর্নরের শাসন। নতুন শাসনসংস্কার আইনের প্রণেতারা সেটা পরিহার করতে ব্যস্ত। তাই একটা ফরমূলা পাওয়া গেল যাতে দু'পক্ষের মানরক্ষা হয়।

কংগ্রেস মন্ত্রীদের আশ্বাস দেওয়া হয় যে তাঁদের কাজে বাধা দেওয়া হবে না। বাধা পেলে তাঁরা পদত্যাগ করতে পারবেন। কিন্তু গভর্নরের সঙ্গে গুরুতর মতভেদ না ঘটলে সে রকম উপলক্ষ জুটবে না। এর পরে মন্ত্রীমণ্ডল গঠন করা হয়। মন্ত্রীরা শুধু অফিস লাভ নয়, 'পাওয়ার' লাভ করেন। তখন যাদের উপর নিপীড়ন হয়েছিল তারা জেলে থাকলে তাদের মুক্তি দেওয়া হয়, তাদের জমি বাজেয়াপ্ত হয়ে থাকলে বাজেয়াপ্ত জমি

ফেরত দেওয়া হয়, তারা বরখাস্ত হয়ে থাকলে সে বরখাস্ত রদ হয়। এককথায় গান্ধী যাদের বিপদে ফেলেছিলেন গান্ধীই তাদের বিপদ থেকে উদ্ধার করেন। কংগ্রেসের জন্যে যারা রাজরোষে পড়েছিল কংগ্রেস তাদের রক্ষা করে। গান্ধী উইলিংডন চুক্তি হয়ে থাকলে যেটা চুক্তির দ্বারা হতো সেটা এইভাবে হয়। ততদিনে এসেছেন লর্ড লিনলিথগাউ। তিনি স্বচক্ষে দেখেন যে গান্ধী নত হয়েই জিতেছেন। বুদ্ধির যুদ্ধে তাঁকে হারানো শক্ত।

গান্ধী ছিলেন বিদেশী পুরাণের সেই ফিনিক্স পাখী, যে পাখী আগুনে পুড়ে ছাই হয়ে যায়, তারপর ভস্মের ভিতর থেকে তরুণ রূপ নিয়ে উঠে আসে।

ইংরেজরা কেউ ভাবতেই পারেননি যে কংগ্রেস ছ'টি প্রদেশে একক সংখ্যাগরিষ্ঠতা লাভ করে একদলীয় মন্ত্রীমণ্ডল গঠন করবে ও গভর্নরদের অঙ্কুশ অকর্মণ্য হবে। ভারতীয়রাও কেউ ভাবতে পারেননি যে ছ'টি মন্ত্রীমণ্ডলকে নিয়ন্ত্রণ করবেন তিনজন কংগ্রেসনেতার একটি ত্রয়ী—যার চলতি নাম কংগ্রেস হাই কমাণ্ড। বল্লবভাই পটেল, রাজেন্দ্রপ্রসাদ ও আবুল কালাম আজাদ ছিলেন গান্ধীর তিনখানি হাত। গান্ধীর থেকে তাঁদের পৃথক করা যেত না। আইনসভায় গিয়েও কংগ্রেস তার সামরিক শৃঙ্খলা রক্ষা করেছিল। এর একমাত্র তুলনা সোভিয়েট রাশিয়ার কমিউনিস্ট পার্টি। সেখানে প্রচ্ছন্ন ছিল স্টালিনের বেপরোয়া মারণশক্তি। না মানলে নির্মম লিকুইডেশন। কিন্তু বিশুদ্ধ নৈতিক শক্তি দিয়ে সামরিক শৃঙ্খলা রক্ষা করা ইতিহাসে এই প্রথমবার লক্ষিত হলো।

এটা কিন্তু গণতান্ত্রিক ঐতিহ্য নয়। ব্রিটিশ পার্লামেণ্টের ইতিহাসে এর কোনো নজির নেই। মন্ত্রীরা দায়ী হবেন পার্লামেণ্টের কাছে, পার্লামেণ্ট তাঁদের ইচ্ছা করলে সরাতে পারবে, এই তো নিয়ম। কিন্তু এদেশে কেউ তাঁদের গায়ে হাত দিতে পারে না, যতক্ষণ তাঁরা তাঁদের পার্টি হাই-কমাণ্ডের বিশ্বাসভাজন। অপরপক্ষে হাই কমাণ্ডের বিরাগভাজন হলে আর তাঁদের রক্ষা নেই। বড়লাট যেমন সর্বশক্তিমান হাই কমাণ্ডও তেমনি সর্বশক্তিমান। বড়লাটের পেছনে যেমন ব্রিটিশ বড়কর্তা হাই কমাণ্ডের পেছনে তেমনি গান্ধী।

যে কোনো মুহূর্তে পদত্যাগ করতে হতে পারে, কিংবা পদচ্যুত হতে পারে, এ রকম একটা সম্ভাবনা মাথার উপর খড়্গের মতো ঝুলছিল। তাই গান্ধী ও হাই কমাণ্ড, ওয়ার্কিং কমিটি তথা পার্লামেন্টারি নেতারা মিলে এ ব্যবস্থা করেছিলেন। এটা এক-প্রকার আপৎকালীন ব্যবস্থা। কংগ্রেস মন্ত্রীমণ্ডলগুলি এক একটি দুর্গ। অন্য পার্টির লোককে সেখানে নিলে যৌথ দায়িত্ব পালন করা শক্ত। তবে কোয়ালিশন একেবারে

অনভিপ্রেত নয়, যদি কংগ্রেসের প্রতি আনুগত্য থাকে। তা হলে আবার স্বকীয় দলের প্রতি আনুগত্য থাকে না।

যে প্রদেশে একাধিক সম্প্রদায় বাস করছে সে প্রদেশে মাইনরিটিও ক্ষমতার স্বাদ চাইবে। এটাই তো স্বাভাবিক। সেইজন্যে নতুন শাসনসংস্কার আইনে এমন কথাও ছিল যে মন্ত্রীমণ্ডল গঠন করার সময় গভর্নর মাইনরিটি থেকেও মন্ত্রী নেবেন। কিন্তু কংগ্রেস এর ব্যাখ্যা করল এই বলে যে, সে দায়িত্ব মন্ত্রীমণ্ডলের যৌথ দায়িত্বের অন্তর্গত। যে ব্যক্তি অন্যদলের প্রতি অনুগত, কংগ্রেসের প্রতি নয়, কংগ্রেস তাঁকে নিলে যৌথ দায়িত্ব অসম্ভব হয়। যৌথ দায়িত্বই তো বৃটিশ ক্যাবিনেট সীস্টেমের গ্রন্থিবন্ধন। মাইনরিটি থেকে মন্ত্রী নিতে হবে, এর কংগ্রেসী ব্যাখ্যা হলো আইনসভার কংগ্রেস দলের ভিতর থেকেই নিতে হবে। আইনসভায় কংগ্রেসদলে বহু মুসলমান ছিলেন বিহারে, যুক্তপ্রদেশে। কিন্তু খুব কম ছিলেন মাদ্রাজে, মধ্যপ্রদেশে। একেবারেই ছিলেন না বম্বেতে, ওড়িশায়। বম্বেতে একজন স্বতন্ত্র মুসলমানকে মন্ত্রীমণ্ডলে নেওয়া হয়। ওড়িশায় কাউকেই না।

এখন প্রশ্ন হলো এঁরা কাদের প্রতিনিধি? আইনসভায় বিস্তর অকংগ্রেসী মুসলমান ছিলেন। এঁরা নিশ্চয় তাঁদের প্রতিনিধি নন। তাঁদের পেছনে যে নির্বাচকমণ্ডলী তাদেরও প্রতিনিধি নন। আবার একই প্রশ্ন দেখা দিল বাংলাদেশের মন্ত্রীমণ্ডলের হিন্দু মন্ত্রীদের বেলা। এঁরা ব্যক্তি হিসাবে সকলেই উপযুক্ত, কিন্তু প্রতিনিধিত্ব আর ব্যক্তিত্ব দুই আলাদা জিনিস। কোয়ালিশন হলে প্রতিনিধিদের সমস্যার সমাধান হতো, কিন্তু মন্ত্রীমণ্ডলের একভাগ কংগ্রেস হাই কমাণ্ডের আজ্ঞাধীন, আরেক ভাগ মুসলিম লীগ সভাপতি ঝীণা সাহেবের আজ্ঞাধীন, আরেক ভাগ কৃষক প্রজা দলপতি ফজলুল হক সাহেবের অনুগত হলে সঙ্কট চরমে উঠত।

কোনোখানেই মাইনরিটি সমস্যার মিটমাট হলো না, তবে পাঞ্জাবের ইউনিয়নিস্ট দল ছিল হিন্দু, মুসলমান, শিখ সম্প্রদায়ের বিস্তর প্রতিনিধি নিয়ে গড়া। সিকন্দর হায়াৎ খান্ ছিলেন সকলের আস্থাভাজন।

কংগ্রেস মন্ত্রীমণ্ডলগুলো থাকতে আসেনি, তাই এ নিয়ে মাথা ঘামাতে চায়নি, কিন্তু পরে দেখা গেল আরো দুটি প্রদেশে কংগ্রেস মন্ত্রীমণ্ডল গঠিত হয়েছে, তার জন্যে কংগ্রেসের বাইরে থেকে লোক নিতে হয়েছে, কংগ্রেসকে মান্য করার অঙ্গীকারনামা সই করিয়ে। এতে কংগ্রেসের ছত্রতলে এল আটটি প্রদেশ, বাইরে রইল তিনটি। ইংরেজ সরকারের একটা অদৃষ্ট ব্যালান্স ছিল। হিন্দু ছয়, মুসলমান পাঁচ। আসামকেও তর্কের খাতিরে মুসলিম বলে ধরা হতো। বাংলার মতো সেখানেও ইউরোপীয় স্বার্থ সমধিক। তেমনি উত্তরপশ্চিম সীমান্তের সামরিক গুরুত্ব অত্যধিক। আসাম ও উত্তরপশ্চিম সীমান্ত

কংগ্রেসের ছত্রতলে দেখে ইংরেজের ব্যালান্স নড়ে যায়। তেমনি মুসলিম লীগেরও একটা ব্যালান্স ছিল, সেটা প্রকাশ্ত! সেটাও নষ্ট হয়। মুসলিম নির্বাচনকেন্দ্রে কংগ্রেসপ্রার্থী দাঁড় করিয়ে লীগকে হারিয়ে দিয়ে কংগ্রেস তাকে শত্রু করেছিল। এবার ব্যালান্স নাশ করে চিরশত্রু করল।

॥ পনেরো ॥

প্রাদেশিক স্তরে ব্যালান্স হানি হলো বলে যারা মনে মনে মহাক্রুদ্ধ কেন্দ্রীয় স্তরে তারা প্রাণ থাকতে ব্যালান্স হাতছাড়া করবে না। মানুষ অত ভালোমানুষ নয়। কেন্দ্রীয় স্তরেও মেজরিটি রুল প্রতিষ্ঠা করতে চাইলে কংগ্রেসকে একজোড়া যুদ্ধ জয় করতে হতো। একটা তো সাম্রাজ্যবাদী ইংরেজদের সঙ্গে, আরেকটা সম্প্রদায়বাদী মুসলমানদের সঙ্গে।

যুদ্ধ অবশ্য অহিংস পদ্ধতিতে হতে পারত, কিন্তু কতটুকুই বা আমাদের অহিংসায় বিশ্বাস, কতটুকুই বা ট্রেনিং, কতটুকুই বা মৃত্যুবরণের প্রস্তুতি। হাতে অস্ত্র নেই বলেই আমরা অহিংস, অস্ত্র থাকতে তো নয়।

কংগ্রেস যখন আটটি প্রদেশ গণতান্ত্রিক উপায়ে হস্তগত করে তখনি বুঝতে পারা যায় যে বাকী তিনটি প্রদেশ কোনো মতেই সে উপায়ে লাভ করা যাবে না, যদি না মুসলিম নির্বাচক মণ্ডলীতেও কংগ্রেস জয়ী হয়। তেমন সম্ভাবনা একেবারেই ছিল না যে তা নয়! কিন্তু তার জন্যে জেল জরিমানা ইত্যাদি নয়, অন্য পন্থায় ত্যাগ স্বীকার করতে হতো। জমিদারকে ছাড়তে হতো জমিদারি, মহাজনকে মহাজনী। অন্তত বহুপরিমাণে খাজনা মাফ করতে হতো, সুদ মকুব করতে হতো। বাংলা, পাঞ্জাব ও সিন্ধু তিন প্রদেশেই শোষক শ্রেণীর লোকেরা ছিল হিন্দু, শোষিত শ্রেণীর লোকেরা মুসলমান। বাংলার আইনসভায় রায়ত আর খাতকদের বোঝা হালকা করার জন্যে যে সব আইন আসে সেসব আনে মুসলিমরা, তাতে বাধা দেয় হিন্দুরা। হাঁ, কংগ্রেসের হিন্দুরা। সেইদিনই বোঝা গেল বাংলাদেশে কংগ্রেসরাজ হবার নয়। হতে পারে কোয়ালিশন, কিন্তু কংগ্রেস হাইকমাণ্ড তাতে রাজী হবে না। তা হলে আবার কংগ্রেস ছাড়তে হয়। যারা কংগ্রেসের স্রষ্টা তারাই কংগ্রেস ছাড়বে! কংগ্রেস ছাড়লে স্বাধীন হবে কাকে সংগ্রামের সৈন্যদল করে?

কংগ্রেস নেতারা জানতেন বাংলার জন্যে তাঁরা বিশেষ কিছু করতে পারছেন না,

তাঁদের হাতে প্রাদেশিক সরকার নেই। কোয়ালিশনেও তাদের অনিচ্ছা। সুভাষচন্দ্রকে কংগ্রেস সভাপতি পদে বরণ করে তাঁরা বাঙালীকে একপ্রকার ক্ষমতার স্বাদ দিয়েছিলেন। কিন্তু সুভাষচন্দ্র কিছুদিন পরে টের পান যে সভাপতি হলেও তিনি আসলে হর্তাকর্তা নন, হর্তাকর্তা হচ্ছেন বল্লভভাই, রাজেন্দ্রপ্রসাদ ও আবুল কালাম আজাদ। কংগ্রেস মন্ত্রীরা এঁদের কাছ থেকেই নির্দেশ নেন, এঁরাই তাঁদের কাজকর্মের পরিদর্শক। বলতে গেলে আটটি ক্যাবিনেটের উপর এঁরাই একরকম সুপার-ক্যাবিনেট। অথচ এ সুপার-ক্যাবিনেট কংগ্রেস সভাপতির নয়। যাঁকে বলা হয় রাষ্ট্রপতি তিনি প্রকৃতপক্ষে ক্ষমতাহীন। তিনি আমেরিকার প্রেসিডেন্ট নন, রাশিয়ার প্রেসিডেন্ট। তাঁর স্টালিন বল্লভভাই।

মহাত্মাজীর মুঠোয় গণসত্যাগ্রহ, সর্দারজীর মুঠোয় পার্লামেন্টারি শাসনক্ষমতা, তাঁদের দু'জনেরই বাছা বাছা সহকর্মীদের মুঠোয় পার্টি মেশিন। কংগ্রেস সভাপতির মুঠোয় তা হলে কী? শূন্যগর্ভ রাষ্ট্রপতি মর্যাদা? সে রাষ্ট্রও তাঁর নয়, বড়লাটের মুঠোয়। সুভাষচন্দ্রের মতো স্বভাববিদ্রোহী পুরুষ এ রকম ভাগবাঁটোয়ারায় সন্তুষ্ট হতে পারেন না। অন্তত পার্টি মেশিনটা তাঁর চাই। তিনি ওটাকে গড়ে পিটে সংগ্রামের উপযোগী করতে ইচ্ছা করেন। কয়েক বছর আগে ভিয়েনায় থাকতে বিঠলভাই পটেল ও তিনি একটি বিবৃতি দিয়ে বলেন,

"The latest act of Mahatma Gandhi in suspending civil disobediencc is a confession of failure. We are of opinion that the Mahatma as a political leader has failed. The time has come for a radical reorganisation of the Congress on new principles with a new method for which a new leader is essential, as it is unfair to expect the Mahatma to work a programme not consistent with his lifelong principles."

নতুন নেতা, নতুন নীতি, নতুন কর্মপদ্ধতি, এই তিনটিকে ঘিরে কংগ্রেসের শিকড়-শুদ্ধ টেনে পুনর্গঠন। এই যদি হয় লক্ষ্য তবে পুরাতন নেতা, পুরাতন নীতি ও পুরাতন কর্মপদ্ধতির স্থান হবে কোথায়। কংগ্রেসে না কংগ্রেসের বাইরে? গান্ধী মাঝে মাঝে কংগ্রেসের বাইরে সরে গিয়ে পুনর্গঠনকামীদের একটা বিষয়ে নিষ্কণ্টক করেছিলেন। নেতা নিয়ে ভাববার সময় তাঁরা তাঁকে বাদ দিয়ে ভাবতে পারতেন। বাকী থাকে নীতি আর কর্মপদ্ধতি। এই দুই বিষয়ে দ্বন্দ্ব। এ দ্বন্দ্ব পুরাতনের সঙ্গে নতুনের।

যাঁরা পুরাতন নীতি ও পুরাতন কর্মপদ্ধতি পরিত্যাগ করতে অনিচ্ছুক তাঁদের

প্রতিরক্ষরা তাঁদের নাম দিলেন দক্ষিণপন্থী। আর নিজেদের নামকরণ করলেন বামপন্থী। এর একটা সহজ কারণও ছিল। দুনিয়ার সব দেশেই তিনটে বড়ো বড়ো আইডিয়াল দিনে দিনে প্রবল হয়ে উঠেছিল। ন্যাশনালিজম, ডেমোক্রাসী, সোশিয়াল জাস্টিস। সোশিয়াল জাস্টিসের প্রকারভেদ ছিল সোসিয়ালিজম বা কমিউনিজম বা অ্যানারকিজম। আবার তার শত্রু ছিল ফাসিজম। ভারতবর্ষ দুনিয়ার বার নয়। কংগ্রেসের প্রতিষ্ঠার সময় থেকেই ন্যাশনালিজম ও ডেমোক্রাসী তার আদর্শ হয়েছে। তবে সোশিয়াল জাস্টিস অপেক্ষাকৃত নতুন। স্বয়ং গান্ধীজীই তাকে বহন করে আনেন, কিন্তু টলস্টয়ের শিষ্যরূপে, কার্ল মার্কসের শিষ্যরূপে নয়। অথবা ফেবিয়ানদের একজন হিসাবে নয়। বিশের দশকের কংগ্রেসীরা তাতে প্রেরণা পেলেও ত্রিশের দশকের একদল কংগ্রেসী তার চেয়ে সোজাসুজি সোশিয়ালিজম পছন্দ করেন। ফরাসী কেতায় এঁরাই হলেন বামপন্থী।

দক্ষিণপন্থীদের হাতে মন্ত্রিত্ব ছিল, বামপন্থীদের হাতে ছিল না। বামপন্থীরা ধরে নিলেন যে মন্ত্রীর দল অত সাধের মন্ত্রিত্ব ছেড়ে স্বেচ্ছায় সরে আসবেন না। গদী আঁকড়ে পড়ে থাকবেন ও আরো উঁচু গদীর জন্যে ব্রিটিশ কর্তাদের সঙ্গে আপস করবেন। আপসে ফেডারেশন হাসিল হলে আর সংগ্রামের দিকে মন যাবে না। অথচ সংগ্রাম না করে স্বাধীনতা লাভ কোনো দেশে কোনো কালে ঘটে নি। ফেডারেশন একটা মরীচিকা।

সুভাষচন্দ্রের প্রথমবারের নির্বাচনে কেউ প্রতিদ্বন্দ্বিতা করেন নি। তাঁর মতবাদ জানা সত্ত্বেও দক্ষিণপন্থীরা অন্তরায় হন নি। গান্ধী তো সুভাষচন্দ্রকেই চেয়েছিলেন। এক বছরের মধ্যে এমন কী ঘটল যার দরুন সুভাষচন্দ্রকে দ্বিতীয়বার সভাপতি নির্বাচন করতে তাঁদের অসম্মতি প্রতিদ্বন্দ্বিতার রূপ নিল। সকলে এটা বুঝতে পেরেছিলেন যে সুভাষচন্দ্র আবার সভাপতি হলে পুরাতন ওয়ার্কিং কমিটিকে বিদায় দিতেন, সেই সঙ্গে পুরাতন নীতি ও কর্মপদ্ধতিকেও খারিজ করতেন। ব্রিটিশ কর্তাদের সঙ্গে কথাবার্তা তো বন্ধ হতোই, ইউরোপে মহাযুদ্ধ বাধবার আগেই মন্ত্রীদের অকালে পদত্যাগ করতে হতো, গণসত্যাগ্রহের অনুকূল জোয়ার আসবার আগেই কংগ্রেসকর্মীদের অকালে জেলখানায় যেতে হতো। গান্ধীজীর ইচ্ছায় নয়, সুভাষচন্দ্রের ইচ্ছায়। তেমন অবস্থায় কংগ্রেসের যে অংশটা গান্ধীজীর নেতৃত্বে বিশ্বাস রাখত সে অংশটা কংগ্রেস থেকে বেরিয়ে যেত। কংগ্রেস দু'ভাগ হয়ে যেত। ফলে জনগণও দু'ভাগ হয়ে যেত।

সুভাষচন্দ্র তাঁর প্রতিদ্বন্দ্বী পট্টভি সীতারামাইয়াকে পরাজিত করলে গান্ধীজী বলেন তিনিও পরাজিত। কিন্তু তা সত্ত্বেও তিনি আনন্দিত। তাঁর বিবৃতিতে ছিল— সুভাষচন্দ্র এখন ইচ্ছামতো স্বমতের লোকদের নিয়ে ওয়ার্কিং কমিটি গঠন করতে পারেন।

সেই বিবৃতির কিছুদিন পরে আমার এক বিশিষ্ট বন্ধুর সঙ্গে দেখা। তিনি বামপন্থী ও সুভাষচন্দ্রের পক্ষপাতী। জানতে চাই ওয়ার্কিং কমিটিতে তিনি থাকছেন কিনা। তাঁর প্রদেশ থেকে তাঁরই তো থাকার কথা।

"এই বছরই মহাযুদ্ধ।" তিনি গম্ভীরভাবে উত্তর দেন। "দক্ষিণপন্থী বামপন্থী ভেদবিভেদ ভুলে গিয়ে কংগ্রেসকে এখন এক হয়ে দাঁড়াতে হবে। সুভাষচন্দ্রকে আমরা বলে এসেছি তিনি যেন মহাত্মার সঙ্গে দেখা করে মিটিয়ে ফেলেন।"

পরে বোঝা গেল সুভাষচন্দ্রেরও সেই ইচ্ছা। ত্রিপুরী কংগ্রেসে তো গোবিন্দবল্লভ পন্তের প্রস্তাব পাশ হয়ে গেল যে গান্ধীজীর সঙ্গে পরামর্শ করে সুভাষচন্দ্র যেন তাঁর ওয়ার্কিং কমিটি গঠন করেন। মহাত্মা যাঁদের যাঁদের নিতে বলবেন তাঁদের নিতে রাজী ছিলেন সুভাষচন্দ্র।

কিন্তু মহাত্মাই তাঁকে ঐ প্রস্তাবের দায়মুক্ত করে দিয়ে বলেন তাঁর আপনার ইচ্ছামতো সদস্য মনোনয়ন করতে। গান্ধী তাঁর উপর ইচ্ছা খাটাবেন না। কারো নাম দেবেন না।

সুভাষচন্দ্র দক্ষিণপন্থীদের সঙ্গেও আলোচনা করেন। তাঁরা যদি আসেন পুরোপুরি আসবেন, আধাআধি আসবেন না। হয় পুরোনো ওয়ার্কিং কমিটিকে সমগ্রভাবে পুনর্নিয়োগ করতে হবে, নয় সমগ্রভাবে বাতিল করতে হবে। দক্ষিণপন্থী ও বামপন্থী জগাখিচুড়ি ক্যাবিনেট চলবে না।

প্রথমটাই যদি হলো তবে নির্বাচন প্রতিদ্বন্দ্বিতার দরকারটা কী ছিল? আর দ্বিতীয়টাই যদি হয় তবে শুধুমাত্র বামপন্থীদের নিয়ে ওয়ার্কিং কমিটি গঠন করতে হয়। তেমন কমিটি সমগ্র কংগ্রেসকে প্রতিফলিত করবে না। গান্ধীজীরও আশীর্বাদ পাবে না। যুদ্ধের সময় কোন কাজে লাগবে, যদি গান্ধীজীর সঙ্গে মতোবিরোধ ঘটে? যুদ্ধ না বাধলে তো সামাজিক ন্যায় নিয়ে কংগ্রেস মন্ত্রীদের সঙ্গেই ঠোকাঠুকি বেধে যাবে। তাঁরা বামপন্থী হাইকমাণ্ড মানবেন কি? আর তাঁরা যদি বামপন্থী হাইকমাণ্ডের নির্দেশের প্রতিবাদে পদত্যাগ করেন তা হলে কি নতুন মন্ত্রীমণ্ডল গঠন করা হবে বামপন্থীদের দিয়ে? না আদৌ কোনো মন্ত্রীমণ্ডল থাকবেই না? সরকারকে ছ'মাসের আল্টিমেটাম দিয়ে গণসত্যাগ্রহ শুরু করা হবে? সে গণসত্যাগ্রহ যখন গান্ধী অনুমোদিত নয় তখন তাতে গান্ধীবাদীরা বা দক্ষিণপন্থীরা কেউ যোগ দেবেন কি? পারবেন বামপন্থীরা একা সে সংগ্রাম চালাতে?

সুভাষচন্দ্রের বামপন্থী কমরেডরা বারো রাজপুত। তাঁদের সবাইকে একত্র করে নির্বাচনে জেতা যায়। কিন্তু সবাইকে একমত করে ওয়ার্কিং কমিটিও গঠন করা যায়

না, হাইকমাণ্ডও না, আটটা প্রদেশে মন্ত্রীমণ্ডলও না। তা হলে কী করা যায়? গণসত্যাগ্রহ? না, তাতেও তাঁরা সবাই রাজী নন। গান্ধীজীকে পুরোভাগে না রেখে, দক্ষিণপন্থীদের সঙ্গে না নিয়ে গণসত্যাগ্রহ শুধুমাত্র বামপন্থীদের দিয়ে হবার নয়। হতে পারে বিপ্লব বা বিদ্রোহ, কিন্তু তার জন্যে কংগ্রেসকে নিয়ে টানাটানি কেন? আর বিপ্লব বা বিদ্রোহ যদি হবার থাকে তো বিনা আলটিমেটামেই হবে। শত্রুকে ছ'মাস নোটিস দিয়ে বিপ্লব বা বিদ্রোহ বাধাতে গেলে শত্রুই আগে থেকে প্রস্তুত হবার সময় পায়।

সভাপতি পদের জন্যে প্রতিদ্বন্দ্বিতা না করবার জন্যে সুভাষচন্দ্রকে টেলিগ্রাম করেছিলেন গান্ধীজী। নিশ্চয়ই গুরুতর কারণ ছিল। প্রতিদ্বন্দ্বিতায় বামপন্থীরা জয়ী হতে পারেন, কিন্তু গান্ধীজীর দ্বারা পরিচালিত বা দক্ষিণপন্থীদের দ্বারা সমর্থিত নয় যে সংগ্রাম তেমন কোনো সংগ্রামে অসময়ে ঝাঁপ দিতে গেলে নিজেরাও মজবেন, দেশকেও মজাবেন। আর যদি সংগ্রামে ঝাঁপ দেবার অভিপ্রায় না থাকে তবে পার্লামেন্টারি প্রোগ্রাম ছাড় আর কী কর্মসূচী আছে তাঁদের? তাই যদি তাঁরা চালিয়ে যান তবে তাঁরাও তো দক্ষিণপন্থী বনে যাবেন।

সুভাষচন্দ্রকে অবশেষে সভাপতির পদ থেকে সরে যেতেই হলো। কংগ্রেসের ইতিহাসে এটা একটা শোচনীয় অধ্যায়। যেমন অনমনীয় গান্ধীজী, তেমনি অনমনীয় পুরাতন ওয়ার্কিং কমিটি, নমনীয় কেবল সুভাষচন্দ্র আর তাঁর বামপন্থী বান্ধবরা। কিন্তু আর কত নুইবেন? একটা পয়েন্ট পর্যন্ত নোয়া যায়। তারপর আর না। তাই পদত্যাগই শ্রেয়।

নতুন নেতা, নতুন নীতি, নতুন কর্মপদ্ধতি, কোনোটাই হলো না। কংগ্রেসের পুনর্গঠনও না অথচ কংগ্রেসের পুনর্গঠনের সত্যি দরকার ছিল। গান্ধীজীর মতে "I would go to the length of giving the whole Congress organisation a decent burial, rather tlan put up with the corruption that is rampant."

যে কংগ্রেস কণামাত্র ক্ষমতা হাতে পেয়েই বেসামাল কেমন করে সে সর্বময় ক্ষমতার অপরিসীম দায়িত্ব বহন করবে? আকণ্ঠ ডুবে আছে যে আপন দুর্নীতির পাঁকে কে তার কাছে আশা করবে প্রশাসনিক শুদ্ধি, রাষ্ট্রীয় আয়-ব্যয়ের হিসাব, বিপুল প্রলোভনের মুখে সততা? ক্ষমতাই তো সব কথা নয়। তার সঙ্গে চাই অথরিটি। নৈতিক শক্তি না হলে অথরিটি আসে না। কংগ্রেসের যেটুকু অথরিটি সেটুকু মহাত্মার জন্যে। মহাত্মার জনাকতক বাছা বাছা সহকর্মীর জন্যেও। কিন্তু সেই ক'জনকে নিয়ে তো ভারতবর্ষের মতো বিরাট দেশ নিখুঁত ভাবে শাসন করা যায় না। গান্ধীজী সেইজন্যেই চেয়েছিলেন আগে কংগ্রেসের পঙ্কোদ্ধার, তারপরে দেশোদ্ধার। লেনিনও তাঁর পার্টি তৈরি না করে বিপ্লবের দিকে পা বাড়াননি।

দেশকে স্বাধীন করার জন্যে হয়তো পার্টির দরকার ছিল না, জনগণ তৈরি হলেই যথেষ্ট। কিন্তু স্বাধীন হতে না হতেই ক্ষমতা হাতে নিতে হবে, দায়িত্ব ঘাড়ে নিতে হবে। পার্টি তখন একান্ত আবশ্যক। গান্ধী তো একা এতবড়ো দেশ শাসন করতে পারবেন না। আর জনগণও কি শাসনব্যবস্থার সব ক'টা বিভাগ নিজেরাই চালাতে পারবে? গান্ধীজী মুখে যাই বলুন মনে মনে জানেন যে কংগ্রেস ভিন্ন আর কেউ সে গুরুভার ঘাড়ে নিতে পারবে না। অতএব কংগ্রেসকেই ক্লেদমুক্ত করতে হবে। সে কর্তব্য তাঁরই।

আরো ক্ষমতা নয়, তা পেলে তো কংগ্রেস আরো বকে যাবে। উল্টে ক্ষমতার রাজনীতি ছেড়ে বেরিয়ে আসা চাই। ক্ষমতার পরিধি আরো বাড়ানো নয়, কেন্দ্রীয় সরকার গঠন করা নয়। প্রত্যুত প্রাদেশিক বৃত্ত থেকে মহানিষ্ক্রমণ। সেটাও এক আধ বছরের জন্যে নয়। আরো দীর্ঘকালের জন্যে। যুদ্ধ বাধার পরে শোনা গেল মহাত্মা ভাবছেন সাত বছরের জন্যে কংগ্রেসের কপালে লিখবেন অজ্ঞাতবাস।

তিনি নিজেও মনঃস্থির করেন জীবনে কোনদিন নিজের হাতে ক্ষমতার দায়িত্ব নেবেন না। ক্ষমতার আসনে বসবেন না। ক্ষমতা থাকলেই তাকে খাটাতে হয়। তিনি হলেন অহিংস মানুষ। আর রাষ্ট্র হলো সহিংস যন্ত্র। রাষ্ট্রকে যতদিন না অহিংস করে গড়ে তুলতে পারা যাচ্ছে ততদিন তাঁর ভূমিকা হবে পরামর্শদাতার। রাজা উজিরের নয়। কিন্তু কংগ্রেস নেতাদের কথা অন্য। রাষ্ট্রের দায়িত্ব নিয়ে তাঁরা যদি অহিংস থাকতে না পারেন সেটা মার্জনীয়। তবে সেরকম পরিস্থিতি পরিহার করাই সুবুদ্ধি। মুসলীম লীগের পাল্টা দিতে গিয়ে যেন গুলী চালাতে না হয়। লীগ যেমন দিন দিন ভায়োলেন্ট হয়ে উঠেছে তার উত্তরে কংগ্রেস যেন ভায়োলেন্ট না হয়। তার চেয়ে যুদ্ধ উপলক্ষে অপসরণ শ্রেয়।

ওদিকে মুসলিম লীগও মনঃস্থির করে যে কংগ্রেস যেদিন ইংরেজের হাত থেকে মুক্ত হবে সেদিন মুসলিম লীগও কংগ্রেসের হাত থেকে মুক্ত হবে। তার কাম্য পাকিস্তান।

॥ যোল ॥

কংগ্রেসের তথাকথিত দক্ষিণপন্থী নেতাদের ধারণা ছিল আটটি প্রদেশের গভর্নমেণ্ট যেভাবে হস্তগত হলো কেন্দ্রীয় গভর্নমেণ্টও সেইভাবে কুক্ষিগত হবে। গভর্নরদের মতো বড়লাটও হস্তক্ষেপ থেকে বিরত থাকবেন। মুসলিম লীগকে গোটাকয়েক আসন ও দপ্তর ছেড়ে দিলেই চলবে। তা বলে তার হাতে ভীটো থাকতে দেওয়া হবে না। ভোটাভুটিতেও তাকে সমান ওজন দেওয়া অসম্ভব। কাস্টিং ভোট বড়লাটের হাতে কিছুতেই নয়।

কী মধুর স্বপ্ন ! কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে দুঃস্বপ্নও ছিল যে অত সহজে ওসব হবার নয়, ওর জন্য আবার একটা সংগ্রামের ভিতর দিয়ে যেতে হবে। যার নেতা মহাত্মা গান্ধী। যাঁর নীতি অহিংসা। যাঁর পদ্ধতি সত্যাগ্রহ। অথবা যেতে হবে সম্ভবপর এক মহাযুদ্ধের ভিতর দিয়ে। যার একপক্ষে ব্রিটেন ও তার ডোমিনিয়নসমূহ। ডোমিনিয়ন না হলেও ভারত যার পক্ষভুক্ত। স্বাধীনতার প্রশ্নে বোঝাপড়া হলে কংগ্রেসও যার সঙ্গে সহযোগিতার সূত্রে আবদ্ধ। মহাত্মা কিন্তু আবদ্ধ নন।

একদিন সত্যি সত্যি মহাযুদ্ধ বেধে যায় ও ব্রিটেনের মতো ভারতও যুদ্ধ ঘোষণা করে। কিন্তু সে কোন ভারত ? ভারতীয় প্রতিনিধিদের সঙ্গে সম্পর্কশূন্য বৈদেশিক রাজপুরুষদের দ্বারা শাসিত ব্রিটিশ সরকারের পলিসিবাহক ভারত।

গান্ধী ভালো করেই জানতেন যে যুদ্ধকালে ব্রিটেন এমন কোনো পরিবর্তনে সম্মত হবে না যার ফলে পলিসিটাই যুদ্ধবাদী না হয়ে শান্তিবাদী হতে পারে, সহিংস না হয়ে অহিংস হতে পারে। ইংরেজদের বদলে ভারতীয়দের দিয়ে যুদ্ধকালীন সরকার গঠন করা অসম্ভব নয়, কিন্তু তার অনিবার্য শর্ত হবে যুদ্ধকার্যে সক্রিয় সহযোগিতা। ধন জন রসদ জোগানো। পরিবর্তে দেশের লোক কী পাবে ? স্বাধীনতা। ব্রিটেন যদি যুদ্ধে হেরে যায় ভারতও তো হেরে যাবে। তখন স্বাধীনতার প্রশ্ন আবার সাত হাত জলে। জিতলেও কি ব্রিটেন কথা রাখবে ?

ব্রিটেনের বিপদে সহানুভূতি জানানো এক কথা, আর বন্দুক ঘাড়ে করে যুদ্ধক্ষেত্রে যাত্রা করা আরেক। কে জিতবে কে হারবে কেউ সেটা বলতে পারে না। নাৎসীবাদ যদি হারে সাম্রাজ্যবাদ জিতবে। সাম্রাজ্যবাদ যদি হারে নাৎসীবাদ জিতবে। একটা মন্দের জায়গায় আরেকটা মন্দ জিতবে। মন্দের বদলে ভালোর জয় কোথায় যে ভারতের ছেলেদের প্রাণ দেওয়া সার্থক হবে। ভালোর জয় না হয়ে পরাজয় হলেও তার মধ্যে সার্থকতা আছে। গান্ধীজী তাই সহানুভূতি জানিয়েই ক্ষান্ত হন। সহযোগিতার আশ্বাস দেন না। অপরপক্ষে যুদ্ধরত সরকারকে বিব্রত করতেও কুণ্ঠিত হন। সত্যাগ্রহের আভাস থাকে না তাঁর কথায়।

সহযোগও নয়, সত্যাগ্রহ নয়, বিশুদ্ধ অসহযোগ, এই যদি হয় গান্ধীনীতি তবে এতে কংগ্রেসের বাম দক্ষিণ উভয় অঙ্গের আপত্তি ছিল। যুদ্ধকালে যুদ্ধ না করে তাঁরা ছাড়বেন না। হয় সেটা হিটলারের সঙ্গে সশস্ত্র সমর, নয় সেটা ইংরেজের সঙ্গে নিরস্ত্র সংগ্রাম। হয় তাঁরা নাৎসীদের গ্রাস থেকে দুনিয়াকে রক্ষা করবেন, নয় তাঁরা সাম্রাজ্যবাদীদের কবল থেকে ভারতকে উদ্ধার করবেন। যুদ্ধকালে তাঁরা শান্তিতে থাকবেন না, শান্তিতে থাকতেও দেবেন না।

বলা বাহুল্য হিটলারের সঙ্গে সশস্ত্র সমর চালাতে হলে কেন্দ্রীয় সরকারটা হাতে আসা চাই। তা হলে প্রথম কাজই হয় সাম্রাজ্যবাদীদের হটানো। কিন্তু তা হলে যে আবার উল্টো বুঝলি রাম হবে। ওরা বুঝবে যে এরা আসলে হিটলারেরই পঞ্চম বাহিনী। আর গান্ধীজীও তেমন কর্মে নেতৃত্ব দেবেন না। যুদ্ধকালে ইংরেজকে তাড়াতে গেলে ওরাও প্রতিশোধ নেবে।

কংগ্রেস কর্তারাও ভারত সরকারকে ঘাঁটাতে চান না। তাঁরা চান এমন একটা বন্দোবস্ত যাতে সাপও না মরে লাঠিও না ভাঙে। অনেক ভেবেচিন্তে তাঁরা নিজেদের তাস হাতে রেখে ব্রিটেনকেই বলেন তার তাসখানা দেখাতে। সে কি সাম্রাজ্যবাদ ত্যাগ করবে? সে কি গণতন্ত্র প্রবর্তন করবে? সে কি যুদ্ধশেষে ভারতীয়দেরকে তাদের ইচ্ছামতো সংবিধান প্রণয়নে প্রতিশ্রুতি দেবে? সে কি যুদ্ধকালে ভারতীয় স্বাধীনতার কিঞ্চিৎ নিদর্শন দেখাবে? সে কেন যুদ্ধ করছে, কী তার উদ্দেশ্য সেটা ঘোষণা করবে কি?

কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটির স্টেটমেন্ট যে কোনো স্বাধীন দেশের পক্ষে গৌরবজনক একটি সাহিত্যকীর্তি। জবাহরলালের সেই সৃষ্টি দেখে গান্ধীজী বলেন ওর স্রষ্টা একজন আর্টিস্ট। গান্ধীজীও কমিটির বিবেচনার জন্যে একটি স্টেটমেন্ট খসড়া করেছিলেন। কিন্তু জবাহরলালেরটি তাঁর এত পছন্দ হয়ে যায় যে নিজেরটি তিনি প্রত্যাহার করেন। শিষ্যাৎ ইচ্ছেৎ পরাজয়ম্। শিষ্যের কাছে পরাজয় ইচ্ছা করবে।

অমন যে চমৎকার ইংরেজী ওর ফল হলো ব্রিটিশ কর্তাদের দিক থেকে কয়েকটা পিঠ চাপড়ানি ভাষণ ও বিবৃতি। কাজের কথা শুধু এইটুকু যে যুদ্ধকালে বড়লাট একটা পরামর্শ পরিষদ গঠন করবেন, তাতে ভারতীয় নেতারা থাকবেন, কেমন করে যুদ্ধ চালানো হবে সেবিষয়ে তাঁদের পরামর্শ নেওয়া হবে। যুদ্ধশেষে সকলের সঙ্গে আলোচনা করে বিশেষ করে মাইনরিটিদের মতামত জেনে ভারতশাসন আইনের সংশোধন করা হবে। হাঁ, ডোমিনিয়ন স্টেটাসই লক্ষ্য।

ঘোষণাপত্র পড়ে কংগ্রেস নেতাদের চক্ষুঃস্থির। ওটা মুসলিম লীগকে চোখের সামনে রেখে তৈরি। লীগ বলে রেখেছিল তার অমতে যেন শাসনতান্ত্রিক অগ্রগতি না হয়। সাম্রাজ্যের পর রামরাজ্য আসবে ওতে কৈকেয়ীর আপত্তি।

বেশ বোঝা গেল সংখ্যালঘু প্রশ্নের উত্তর না দিলে স্বাধীনতার প্রশ্নের উত্তর মিলবে না। সংখ্যালঘু প্রশ্নের উত্তর কংগ্রেসের হাতে নয়। লীগের হাতে। লীগ মেহেরবানী না করলে ব্রিটেন মেহেরবানী করবে না। এক্ষেত্রে মহাযুদ্ধ অবান্তর। হিটলারের আক্রমণ অবান্তর। কিছুতেই কিছু হবে না, তা তুমি যতই বন্দুক ঘাড়ে করে উত্তর ফ্রান্সে বা উত্তর আফ্রিকায় যাও। যতই জান মাল রুপেয়া সরকারের পায়ে ঢালো।

কংগ্রেস নেতারা হতাশ হলেন বইকি। অমন চমৎকার একখানি সাহিত্যসৃ বিলকুল বৃথা গেল। ইংরেজের প্রাণে এতটুকুও সাড়া তুলল না। ওদের ধারণা কংগ্রে তারী তো সহযোগিতা করবে! তার জন্যে তাকে দিতে হবে যুদ্ধের পর কনস্টিটুয়ে অ্যাসেম্বলি আর ইতিমধ্যে কেন্দ্রীয় গভর্ণমেন্টের উপর সর্দারী। ওদিকে পাঞ্জাবে মুসলমানরা যদি চটে যায় তো যুদ্ধের জন্য রংরুট হবে কারা? মুসলমানরা রংরুট ন হলে শিখরাও কি হবে? শিখরা রংরুট না হলে হিন্দুরাও কি হবে?

ইংরেজরা এ যুদ্ধে সব চেয়ে বেশী নির্ভর করছিল সিকন্দর হায়াৎ খানের ইউনিয়নিস পার্টির উপর, তাঁর পাঞ্জাব সরকারের উপর। তাঁর সৈনিক সংগ্রহের কৌশল ছি অসাধারণ। ভারতের স্বাধীনতার জন্য যুদ্ধ, নাৎসীবাদ উৎসাদনের জন্য যুদ্ধ ইত্যাদি বললে একজনও জওয়ান নাম লেখাবে না। বলতে হবে, "ভাই শিখ, তুমি যদি যুে না যাও মুসলমান যাবে, সেই উপায়ে হাতিয়ার যোগাড় করবে, সেই হাতিয়ার দিে পাঞ্জাব দখল করবে ও পাকিস্তান হাসিল করবে। তুমিও চল। হাতিয়ার জোগা করো। তারপর একদিন পাঞ্জাব কেড়ে নেবে। আবার রণজিৎ সিংহের রাজত্ব।"

তেমনি মুসলমানকে বলতে হবে, "ভাই মুসলমান, তুমি যদি যুদ্ধে না যাও শি যাবে। সেই উপায়ে হাতিয়ার হাত করবে। তাই দিয়ে পাঞ্জাব দখল করে রণজি সিংহের রাজ্য পুনঃপ্রতিষ্ঠা করবে। তুমিও চল। হাতিয়ার হাত করো। তারপ একদিন পাকিস্তান হাসিল করবে। আবার সেই মোগল রাজত্ব।"

তেমনি হিন্দু ডোগরাকে, রাজপুতকে। মুসলমানের আগে, শিখের আগে ওরা তো পাঞ্জাবের মালিক ছিল। আবার হবে। হাতিয়ার সংগ্রহ করাটাই তো সমস্যা রংরুট বনে যাও। সমস্যার সমাধান জলের মতো সহজ।

দেখা গেল গোড়ায় যাদের অনিচ্ছা ছিল তারা হিন্দু মুসলিম শিখ নির্বিশেষে রংরু হয়ে বন্দুক ঘাড়ে করে চলল। মুখে তাদের "আল্লা হো আকবর," "সৎ শ্রী অকাল" "দুর্গা মাঈকী জয়"। যুদ্ধে যদি বাঁচে তো পাঞ্জাবের জন্যে পরে গৃহযুদ্ধে মারবে ও মরবে

চালাকির দ্বারা কোনো মহৎ কর্ম হয় না। যুদ্ধে সহযোগিতাও একটা চালাকি যখন দেশবাসীকে কোনোমতে বোঝাবার জো নেই যে হিটলার কেবল ব্রিটেনের শত্ৰ নয় ভারতেরও শত্রু। সত্যি কথা বলতে কী, হিটলারের পক্ষেও সেদিন বহুলোক ছিল তারা মনে মনে বলছিল, যা শত্রু পরে পরে। হিটলার ব্রিটেনকে হারিয়ে দিব রাশিয়াও হিটলারকে কাহিল করুক, বাকীটুকু আমরাই পারব। তার জন্যে যুে সহযোগিতা করতে হবে কেন? কংগ্রেস মন্ত্রিত্ব এমন কী মূল্যবান যে তার জন্যে অত বেশী দাম দিতে হবে?

সেদিন ইংরেজ শাসন ও কংগ্রেস শাসন দুটোই একই রকম অন্তঃসারশূন্য ঠেকছিল। ওপথে আর যাই আসুক নূতন শৃঙ্খলা আসবে না। বামপন্থীরা বরঞ্চ ছল খুঁজছিলেন দুটোকেই একসঙ্গে সরাবার। লেনিনের মতো বিপ্লব করবার। তাঁদের অনেকেরই বিশ্বাস দেশ প্রস্তুত, নেতারাই প্রস্তুত নন। জোয়ার এসে গেছে, তার সুযোগ নিতে হবে, নইলে সে বৃথা ফিরে যাবে। ইংলণ্ডের দুর্যোগই ভারতের সুযোগ।

বিপ্লবের লক্ষণ কী কী বিষয়ে আমাদের বামপন্থীদের গুরু লেনিনের উক্ত স্মরণীয়।

"When a revolutionary party has not the support of a majority either among the vanguard of the revolutionary class, or among the rural population, there can be no question of a rising. A rising must not only have this majority, but must have : (1) the incoming revolutionary tide over the whole country , (2) the complete moral and political bankruptsy of the old regime, for instance, the Coalition Government , and (3) a deep-seated sense of insecurity among all the irresolute elements."

এসব লক্ষণ কি মহাযুদ্ধের প্রারম্ভে ভারতবর্ষের কোনোখানে ছিল? ছিল হয়তো বামপন্থী নেতাদের ভক্তজনের মধ্যে। ছিল হয়তো সভাস্থলে। কিন্তু ব্যাপকভাবে নয়। থাকলে থাকত ওই কংগ্রেস প্রদেশগুলিতে, কিন্তু সেখানে যে বিক্ষোভ জড়ো হচ্ছিল সেটা ইংরেজ সরকারের বিরুদ্ধে নয়, কংগ্রেস সরকারেরই বিরুদ্ধে। কংগ্রেস মন্ত্রীরা ব্রিটেনের সঙ্গে সহযোগিতায় স্বাধীনতা প্রশ্নের সমাধান হবে না বুঝতে পেরে হাইকমাণ্ডের নির্দেশে যেই পদত্যাগ করলেন অমনি সব বিক্ষোভ মুহূর্তে জল হয়ে গেল। বামপন্থীরা তখন আর ওর মধ্যে বিপ্লবের লক্ষণ খুঁজে পেলেন না।

কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটি ব্রিটেনের মতিগতি জানতে চেয়েছিলেন। জানতে পেরেই কংগ্রেস মন্ত্রীদের আটটি প্রদেশ থেকে পশ্চাৎ অপসরণ করতে বলেন। অভূতপূর্ব সামরিক শৃঙ্খলা ও বাধ্যতার সঙ্গে আটটি প্রদেশ একই কালে মন্ত্রীশূন্য হয়ে যায়। ইচ্ছা করলেই অমান্য করতে পারতেন কেউ কেউ। কিন্তু সেটা হতো বিশ্বাসঘাতকতা। জনমত ক্ষমা করত না। বলা বাহুল্য মন্ত্রীরা মুহূর্তেই বীরপুরুষ বনে গেলেন।

কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটি এবার গান্ধীজীর উপরেই সমস্ত ভার অর্পণ করেন। যা করবার তিনিই করবেন। না করার দায়িত্বও তাঁর। এতকাল অপেক্ষার পর কংগ্রেসের পরিপূর্ণ নেতৃত্ব মহাত্মার হাতে এল। তিনি তাঁর কণ্ঠস্বর ফিরে পেলেন।

গান্ধীজী এককালে বিশ্বাস করতেন যে সহযোগিতার পথেই স্বরাজ আসবে। সহযোগিতারই একটা অঙ্গ যুদ্ধে সহযোগিতা। প্রথম মহাযুদ্ধে তিনি তাই সহযোগিতার হাত বাড়িয়ে দেন। প্রথমদিকে খাস ইংলণ্ডের মাটিতে, পরে ভারতভূমিতে। জনমতও দেশময় সহযোগিতার অনুকূলে ছিল। যদিও সেকালের চরমপন্থীরা তখনি বলতে শুরু করেছিলেন যে ইংলণ্ডের দুর্যোগই ভারতের সুযোগ। কেউ কেউ সশস্ত্র বিদ্রোহের জন্যে অস্ত্র সংগ্রহ করতে সাগর পাড়ি দেন। মহাত্মার কাজ হলো হিংসা নামক উপায়টাকে অচলিত করে তার জায়গায় অহিংসা নামক অপর এক উপায়কে জনগণের সামনে তুলে ধরা। যুদ্ধ থামতে না থামতে তার উপলক্ষও জুটে যায়। দেশের লোক সহযোগিতার পরিণাম দেখে অসহযোগের নীতি অবলম্বন করে। গান্ধীই হন তাদের নেতা। সেই থেকে তিনি অসহযোগের প্রবর্তক। অহিংসার প্রোফেট।

মাঝে মাঝে দেশকে দম নেবার অবকাশ দিলেও অসহযোগ নীতি ত্যাগ করে সহযোগিতার নীতি তিনি পুনর্গ্রহণ করবেন, এমন কী ঘটেছে? আর একটা মহাযুদ্ধ? না, তার জন্যেও নীতি পরিবর্তন করা যায় না। এমন কি স্বরাজের জন্যেও নয়, ওটা যদি শর্তাধীন স্বরাজ হয়। যদি হয় এই শর্তে স্বরাজ যে মহাযুদ্ধে সহযোগিতা করতে হবে। তাঁর কাছে তেমন স্বরাজ মূল্যহীন। তিনি চান জনগণের জন্য স্বরাজ। জন-গণের স্বার্থ যুদ্ধবিগ্রহে জড়িয়ে পড়া নয়। যুদ্ধবিগ্রহের স্থলে শান্তি স্থাপন করা। ভারত যদি স্বাধীন হয় তবে তা বন্দুক ঘাড়ে করে হিটলারের সঙ্গে মোকাবিলার জন্যে নয়। গান্ধীজীর মতে ভারত স্বাধীন হবার সঙ্গে সঙ্গে হিটলারের সাম্রাজ্য-পিপাসাও দূর হবে, কারণ ব্রিটেন যখন সাম্রাজ্য রাখতে পারল না জার্মানীও কি পারবে?

ভারতের স্বাধীনতা যদি যুদ্ধকালে আসে বিশ্বশান্তিও দু'দিন আগে আসবে। আর যদি যুদ্ধকালে না আসে তা হলেও ক্ষতি নেই। ভারত অপেক্ষা করবে। ইতিমধ্যে স্বাধীনতার দিকে আরো কয়েক পা এগিয়ে যাবে। সেটা যোদ্ধাদের বিব্রত না করে। অহিংসভাবে। মোট কথা গান্ধীজী অসহযোগ ত্যাগ করবেন না, কংগ্রেসকেও ত্যাগ করতে দেবেন না। অথচ সরকারী যুদ্ধোদ্যমেও ব্যাঘাত সৃষ্টি করবেন না। তাঁর বক্তব্যটা যেন এই যে, তোমরা যুদ্ধ করতে চাও করো, আমরা অসহযোগ করতে চাই করি, আমরা তোমাদের পথে কাঁটা দেব না, তোমরাও আমাদের পথে কাঁটা দেবে না। কেমন? এটাই কি ফেয়ার গেম নয়?

ইতিহাসে কেউ কখনো দেখেনি যে, রাজারা করছেন যুদ্ধ আর প্রজারা করছে অসহযোগ। যেটা দেখা যায় সেটা সেই—রাজারা রাজায় যুদ্ধ হয়, উলুখাগড়ার প্রাণ যায়। এই প্রথম শোনা গেল উলুখাগড়া বলছে সেও অসহযোগ করবে। উলুখাগড়া অসহ-

যোগ করলে রাজারা যুদ্ধ করবেন কী করে? ভারতের প্রজাদের দেখাদেখি অন্যান্য দেশের প্রজারাও যদি অসহযোগ করে তবে যুদ্ধই বা চলতে পারে কদ্দিন? তখন যে শান্তি আপনি আসবে।

মহাত্মার যুদ্ধকালীন অসহযোগ নীতি প্রকারান্তরে শান্তিবাদীদের যুদ্ধবিরোধী নীতি। টলস্টয় বেঁচে থাকলে গান্ধীকে আশীর্বাদ করে বলতেন, তুমিই মানবজাতির আশাভরসা। আর তোমাদের দেশ যদি তোমার সঙ্গে থাকে তবে সেই বয়ে আনবে বিশ্বশান্তি।

বোধহয় এই সময় কিংসলি মার্টিন তাঁর নিউ স্টেটসম্যান পত্রিকায় লেখেন যে, গান্ধীর নীতি হচ্ছে যুদ্ধকালে লেনিনের নীতি। এরই নাম বৈপ্লবিক পরাজয়বাদ। রেভলিউশনারি ডিফিটিজম। মার্টিন আরো কী কী লিখেছিলেন ঠিক মনে নেই। তবে তার মর্ম ছিল কতকটা এইরকম যে, গভর্নমেন্টকে পরাজিত হতে দেওয়াই বিপ্লবকে সফল হতে দেওয়া।

বার্নার্ড শ এমনি এক সময় বলেন যে গান্ধীর স্ট্র্যাটেজী ঠিক আছে। তার মানে, তিনি তাঁর লক্ষ্য থেকে বিচ্যুত হননি ও হবেন না। ব্রিটিশ গভর্নমেন্টকে বাঁচিয়ে রাখা তাঁর কর্তব্য নয়।

গান্ধীসেবাসঙ্ঘের সম্মেলনে যোগ দিতে গান্ধীজী যখন মালিকান্দায় যান তখন কুমিল্লা থেকে আমিও যাই তাঁকে দর্শন করতে। পোলাণ্ডের পতনের পর আমার মনের ভিতর একটা মন্থন চলছিল। হিংসার উপরে নির্ভর করে যুদ্ধে নামার চেয়ে অহিংস প্রতিরোধ শ্রেয়। এই কথাটাই গান্ধীজীকে নিবেদন করে আসি। তিনি ধরাছোঁয়া দেন না। মুচকি হাসেন।

সেই সময়ই লক্ষ করি তিনি অসাধারণ গম্ভীর। দেশের গুরুভার বইতে হচ্ছে তাঁকে। শুনতে হচ্ছে বিদেশেরও নিন্দাবাদ। যুদ্ধকালে অসহযোগ নাকি শত্রুপক্ষের মনোবলবর্ধক। মন্ত্রীরা সরে যাওয়ায় বামপন্থীরা ঠাণ্ডা হয়েছে, কিন্তু মুসলিম লীগ এমন ভাব দেখাচ্ছে যেন সেই বর্তে গেছে। তার প্রতিজ্ঞা সে এর পরে মন্ত্রীদের ফিরতে দেবে না। মন্ত্রীরাও ফেরার জন্যে ব্যাকুল।

কংগ্রেস তখন এমন একটা পার্টি যে একই কালে সহযোগিতাও করবে, অসহযোগও করবে। হিটলারের সঙ্গে লড়বে, ইংরেজের সঙ্গেও লড়বে। হিংসাও মানবে, অহিংসাও মানবে। মহাত্মার মাথাব্যথা কংগ্রেসকে নিয়ে, যেমন বুদ্ধের মাথাব্যথা সঙ্ঘকে নিয়ে।

। সতেরো ।

পোলাণ্ডের পতনের পর যে জিজ্ঞাসা আমার মনে জেগেছিল ও যেকথা আমি মহাত্মার সম্বন্ধে মুখ ফুটে নিবেদন করেছিলুম ফ্রান্সের পতনের পরে দেখি তিনি সেটা কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটির সদস্যদের বিবেচনা করতে বলেছেন। ভারতের পরিস্থিতি যদি পোলাণ্ডের বা ফ্রান্সের অনুরূপ হয় তবে ভারতীয়রা কি হিংসা দিয়ে দেশরক্ষা করবে, না অহিংসা দিয়ে ?

যদিও ঠিক সেই মুহূর্তে আক্রমণের আশঙ্কা ছিল না তবু বলা তো যায় না। ভবিষ্যতে দেশ আক্রান্ত হতে পারে। ততদিনে যদি কংগ্রেসের উপর দেশরক্ষার দায়িত্ব এসে থাকে তবে কংগ্রেস কীভাবে দেশরক্ষা করবে ? যেভাবে সকলে করে থাকে সেইভাবে ? না গান্ধী যেভাবে করতে বলেন সেইভাবে ? সৈন্যবল দিয়ে না গণসত্যাগ্রহ দিয়ে ?

ওয়ার্কিং কমিটি গভীরভাবে চিন্তা করেন। খান আবদুল গফর খান ভিন্ন আর সকলের সিদ্ধান্ত হলো, অহিংসা দিয়ে দেশোদ্ধার হতে পারে, কিন্তু অহিংসার নীতি দেশরক্ষার ক্ষেত্রে সম্প্রসারণ করা যায় না। তার বেলা হিংসার নীতি অবলম্বন করতে হবে। অর্থাৎ কংগ্রেস নেতারা প্রয়োজনমতো কখনো অহিংস কখনো সহিংস। যখন যেটা কার্যকর। পোলাণ্ডের ও ফ্রান্সের দশা দেখেও তাঁদের শিক্ষা হয়নি। গান্ধীজী নিরাশ হন।

ইতিমধ্যে রামগড় কংগ্রেস স্পষ্ট কণ্ঠে ঘোষণা করেছে যে ভারতের জন্যে চাই পূর্ণ স্বাধীনতা আর সংবিধান রচনার জন্যে কনস্টিটুয়েন্ট অ্যাসেম্বলি। যুদ্ধের জন্যে কংগ্রেস তার দাবী খাটো করবে না, তার সংগ্রাম বন্ধ করবে না। গান্ধীজীর উপরেই সব ভার দেবে। তিনিই সংগ্রাম পরিচালনা করবেন। তিনি সবাইকে প্রস্তুত হতে উপদেশ দিয়েছেন, কিন্তু আপাতত সত্যাগ্রহের নির্দেশ দেবেন না।

ওদিকে বড়লাটও চিন্তা করছিলেন কংগ্রেসকে কী করে সহযোগিতায় সম্মত করা যায়। আটটি প্রদেশ কেবল যে মন্ত্রীশূন্য ছিল তা নয়, মেজরিটি অনুপস্থিত থাকায় আইনসভাও অকেজো হয়েছিল। মাইনরিটিও বাধ্য হয়ে বেকার। সুতরাং রুদ্ধ।

মুসলিম লীগ ইতিমধ্যে পার্টিশনের প্রস্তাব গ্রহণ করে রাজনৈতিক সমাধানকে আরো জটিল করে তুলেছে। তার আশঙ্কা যুদ্ধের ঠেলায় ব্রিটেন কংগ্রেসের সঙ্গে আপস করবে, তখন মুসলিম লীগ তার ভাগ থেকে বঞ্চিত হবে। তাই তার বখরাটা সে পৃথক রাষ্ট্ররূপে পেতে চায়। না পেলে অন্য কোনো সমাধানে সন্তুষ্ট হবে না।

দেশরক্ষা অহিংসা দিয়ে হবে না এই সিদ্ধান্ত নেবার পর কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটি আবার দেশরক্ষার অনুরোধে দাবী করেন যে কেন্দ্রে একটি অস্থায়ী ন্যাশনাল গভর্নমেন্ট গঠন করা হোক। কংগ্রেস তা হলে পুরো শক্তি দিয়ে যুদ্ধোদ্যমে সহযোগিতা করবে। যাতে দেশরক্ষা ব্যবস্থা আরো ফলপ্রদ, আরো সুশৃঙ্খল হয়।

বড়লাট কংগ্রেসের প্রস্তাবে রাজী হয়ে গেলে কংগ্রেস নেতারা আর সত্যাগ্রহের প্রয়োজন দেখতেন না। সুতরাং গান্ধীজীর সঙ্গে তাঁদের বিচ্ছেদ ঘটে যেত। তিনি একলা চলতেন ও বিবেকের নির্দেশ পেলে একাই সত্যাগ্রহ করতেন।

কংগ্রেসের মতিগতি দেখে তিনি আবার নতুন করে সরে দাঁড়ান। তবে বেশীদিন সরে থাকতে হলো না। বড়লাট জানিয়ে দিলেন যে তাঁর শাসন পরিষদ্ পুনর্গঠিত হবে না, কিন্তু পরিবর্ধিত হবে। অর্থাৎ ইংরেজ সদস্যরা যেমন আছেন তেমনি থাকবেন, ভারতীয় সদস্য যে দু'-একজন আছেন, তাঁরাও তেমনি থাকবেন, অধিকন্তু যুক্ত হবেন কংগ্রেস ও লীগ নেতারা। যুদ্ধের পরে ভারতীয়রা তাঁদের ইচ্ছামতো সংবিধান রচনার সুযোগ পাবেন, তবে দুটি শর্তে। ব্রিটিশ স্বার্থ অক্ষুণ্ণ থাকা চাই। আর সংখ্যালঘুদের সম্মতি থাকা চাই।

বড়লাটের জবাব পেয়ে কংগ্রেস নেতাদের দেশরক্ষায় সহযোগিতার সাধ সঙ্গে সঙ্গে মিটে যায়। অন্তত তখনকার মতো। আবার তাঁরা গান্ধীজীর শরণ নেন। অসহযোগ ও সত্যাগ্রহ ভিন্ন গতি নেই। অন্তত যতদিন না বড়লাট আবার ডাক দেন।

হয় পুরো শক্তি দিয়ে যুদ্ধোদ্যমে সহযোগিতা নয় পুরো শক্তি দিয়ে যুদ্ধোদ্যম পণ্ড করা, এই দুই চরমপন্থার মধ্যপন্থা তাঁরা মানতেন না। মহাত্মা কিন্তু সেই সঙ্কটকালে কোনরকম চরমপন্থার পক্ষপাতী ছিলেন না। তার পন্থা ছিল ক্ষুরধার পন্থা। ব্রিটেন যুদ্ধে বিশ্বাস করে, যুদ্ধ কেমন করে করতে হয় তা জানে। কেন তাকে বিব্রত করা? তার দিকেও তো বহু ভারতীয় রয়েছে। যোদ্ধার দলকে যুদ্ধ করতে দাও। কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে দেশের লোককেও জাগাও, জাগিয়ে বল যে যুদ্ধবিগ্রহে তোমাদের বিশ্বাস নেই, অন্ততপক্ষে বর্তমান যুদ্ধ তোমাদের দেশের স্বাধীনতার পোষক নয়। তোমাদের স্বাধীন উক্তির জন্যে যদি তোমাদের কারাদণ্ড হয় তো যাও কারাগারে। যুদ্ধকালটা কাটিয়ে দাও সেখানে।

একটি নাম ব্যক্তি সত্যাগ্রহ। এর ইস্যু হচ্ছে যুদ্ধকালে সত্যকথনের স্বাধীনতা। সত্যে আগ্রহ। যুদ্ধকালে কোথাও কাউকে সত্য বলতে দেওয়া হয় না। যুদ্ধের প্রথম বলি হচ্ছে সত্য। পৃথিবীতে অন্তত একটি দেশের রাজনৈতিক কর্মীরা সত্য বলতে গিয়ে দণ্ডবরণ করুন। ইতিহাসে নাম থাকবে। জনগণকে সেইভাবে নেতৃত্ব দিন। তারা গণসত্যাগ্রহের জন্যে প্রস্তুত হবে।

গান্ধীজী বড়লাটের সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন। বড়লাট বিবেকচালিতদের সহ্য করবেন, কিন্তু তাঁদের প্রচারকার্য সহ্য করবেন না। কোনো গভর্নমেন্ট করেন না। নতুবা যুদ্ধোদ্যম বাধা পাবে।

নিঃশ্বাস ফেলতে না পারলে যেমন মানুষ বাঁচে না তেমনি মন খুলে কথা বলতে না পারলে সভ্য মানুষ। গণতন্ত্রের প্রাথমিক কর্তব্য হচ্ছে বাক্যের স্বাধীনতা আদায় করা ও অক্ষুণ্ণ রাখা। নইলে গণতন্ত্রই থাকে না। সিভিল লিবার্টি হচ্ছে ভিত্তিশিলা। তারই উপর দাঁড়িয়ে গণতন্ত্রের সৌধ। যুদ্ধকালে যারা সিভিল লিবার্টি হারায় তারা গণতন্ত্রও রাখতে পারে না। গণতন্ত্র যাদের নেই তাদের সিভিল লিবার্টি থাকলে সেটা আরো বেশী করে আঁকড়ে ধরতে হয়।

কাজেই এ প্রশ্নে গান্ধীজী বড়লাটের সঙ্গে একমত হতে পারেন না। বড়লাটও গান্ধীজীর সঙ্গে। বড়লাটের শঙ্কা যুদ্ধবিরোধী প্রচারকার্য যোদ্ধাদের মনোবল ভঙ্গ করবে। যুদ্ধে যাবার জন্যে সৈনিক পাওয়া যাবে না। রংরুট না জুটলে যুদ্ধ চলবে কী করে?

ওটা এমন একটা ইস্যু যে যুদ্ধবাদীতে শান্তিবাদীতে আপস হতে পারে না। এমন কি কংগ্রেস যদি যুদ্ধে যোগ দিত তার সঙ্গেও গান্ধীজীর আপস হতো না। তিনি একাই যুদ্ধবিরোধী ভাষণ ও লেখা দিয়ে যুদ্ধবিরোধী মনোভাব জাগিয়ে রাখতেন। তাঁকে তাঁর সেই প্রাথমিক অধিকার থেকে বঞ্চিত করলে তিনি কারাবরণ করতেন বা অনশনে দেহ-ত্যাগ করতেন।

সিভিল লিবার্টির ইস্যুতে যুদ্ধকালীন ব্যক্তিসত্যাগ্রহ যাতে ব্যাপক না হয় সেদিকে তাঁর প্রখর দৃষ্টি ছিল। আসলে ওটা একটা প্রিন্সিপ্‌ল্ নিয়ে আন্দোলন। আর সেই প্রিন্সিপ্‌ল্ ছিল নৈতিক। তবে তার সঙ্গে রাজনীতিরও সম্পর্ক ছিল। প্রথম সত্যাগ্রহী মনোনীত হন বিনোবাজী। তিনি রাজনীতির লোক নন। তাঁর যুদ্ধবিরুদ্ধতা রাজনৈতিক কারণে নয়। তিনি যুদ্ধমাত্রেরই বিরোধী। কংগ্রেস যুদ্ধে যোগ দিলেও তিনি বিরুদ্ধতা করতেন।

আন্দোলনটাকে শুধুমাত্র বিনোবাজীর মতো নীতিনিপুণদের মধ্যে নিবদ্ধ রাখতে পারতেন গান্ধীজী, যদি কংগ্রেসের নেতৃত্বের দায় তাঁর উপর না বর্তাত। কংগ্রেস

কর্মীদেরও আন্দোলনে যোগদানের সুযোগ না দিলে নয়। যদিও তাঁদের প্রতিরোধ কেবলমাত্র সাম্রাজ্যবাদী যুদ্ধের বিরুদ্ধে। সেইজন্যে দ্বিতীয় সত্যাগ্রহী মনোনীত হন জবাহরলালজী। নীতিনিপুণ ও রাজনীতিনিপুণ দু'রকমের কর্মীকেই মনোনয়ন দেওয়া হয়। অমনি করে প্রায় সব ক'জন প্রাক্তন মন্ত্রীকে ও তাঁদের সমর্থক আইনসভার সদস্যকে জেলখানায় পাঠানো হয়। বাইরে যে ক'জন পড়ে থাকেন তাঁরা হয় অসুস্থ নয় যুদ্ধবিরোধী প্রচারে অনিচ্ছুক। সেটা জেলের ভয়ে নয়। তাঁদের মতে সহযোগিতাটাই ঠিক বিরোধিতাটাই ভুল। যুদ্ধটাকে এককথায় সাম্রাজ্যবাদী বলে খারিজ করতে তাঁরা নারাজ। তাঁরা যখন সত্যাগ্রহের মনোনয়ন চান না তখন পান না।

মনোনয়ন দিয়ে বাছা বাছা কর্মীদের সত্যাগ্রহ করতে দেওয়া গান্ধীজীর বহুদিনের কামনা। সত্যাগ্রহ তা হলে সংখ্যাগত না হয়ে গুণগত হয়। আর তাতেই বেশী প্রভাব। সত্যি সত্যি কয়েক মাসের মধ্যে রাজভয় ভেঙে গেল। লোকে খোলাখুলি-ভাবে যুদ্ধের বিরুদ্ধে বলতে লাগল। তবে ছাপাখানা কড়া হাতে নিয়ন্ত্রিত বলে যুদ্ধের বিরুদ্ধে লিখে ছাপতে পারল না। তার দরকারও হলো না। কারণ যুদ্ধে আর চাঁদা উঠছিল না, পাঞ্জাবের বাইরে রংরুটও জুটছিল না। তবে যাদের ইচ্ছা বা প্রয়োজন তারা অবাধে যোগ দিচ্ছিল। কংগ্রেস বাধা দিচ্ছিল না। প্রচারকার্যের চেয়ে জোরালো কিছু করা গান্ধীজীর বারণ ছিল। তিনি সরকারী যুদ্ধোদ্যমকে অচল করে দিতে চাননি। চাইলে তাঁকে নিশ্চয় গ্রেপ্তার করা হতো, দণ্ড দেওয়া হতো। সত্যাগ্রহ পরিচালনার জন্যে এবার তিনি মুক্ত থাকতে মনস্থ করেছিলেন।

ব্যক্তি সত্যাগ্রহ কি স্বরাজ এনে দিল? না, স্বরাজ তার লক্ষ্য ছিল না। তার লক্ষ্য গণসত্যাগ্রহের জন্যে ক্ষেত্র প্রস্তুত করা। ক্ষেত্র মানুষের মন। অন্য কোনো উপায়ে সেটা সম্ভব হতো না। তার আরো একটি লক্ষ্য ছিল দুনিয়াকে জানানো যে ভারতের জনসাধারণ এ যুদ্ধের পক্ষভুক্ত নয়। ভারতের নামে লড়াই চললেও লড়ছে যারা তারা বিদেশী সরকারের বেতনভুক সৈনিক। ভারতীয়রা তবে কি হিটলারের পক্ষে? না, তেমন কথাও বলা যায় না। কারণ তারা সরকারী যুদ্ধোদ্যমে ব্যাঘাত ঘটাতে চায় না। সরকার বলে কয়ে বুঝিয়ে সুঝিয়ে যাদের নিয়ে যাচ্ছেন তাদের যাওয়ার অধিকার কেউ অস্বীকার করছে না। কিন্তু জোর জুলুম করলে প্রতিবাদ করছে।

তবে জোর জুলুমও কোথাও তেমন শোনা যাচ্ছিল না। বড়লাট লিনলিথগাউ জানতেন যে জোর জুলুম গান্ধীজী সহ্য করবেন না। জোর জুলুম হলে বিদ্রোহ অবশ্য-ম্ভাবী। গান্ধীজীও সর্বক্ষণ সজাগ ছিলেন সরকার পক্ষ থেকে জোর জুলুম যাতে না হয়। খবর পেলে নিষ্ক্রিয় থাকতেন না। বড়লাটের সঙ্গে তাঁর একটা অলিখিত

বোঝাপড়া হয়েছিল যে কোনো পক্ষই সীমা লঙ্ঘন করবেন না। বড়লাটও করবেন না কনস্ক্রিপশন, গান্ধীজীও করবেন না ব্যাপক সত্যাগ্রহ। দাবাখেলায় এই দুই খেলোয়াড় পরস্পরের চাল জানতেন। তাই খেলাটা চলেছিল ভালো। শেষের দিকে তো যুদ্ধ-বিরোধী প্রচারের জন্যে পুলিশ কারো গায়ে হাত দিত না। ফলে প্রচারকার্যও আপনা থেকে থেমে এসেছিল।

দেশকে শান্ত রেখেছিলেন বলে বড়লাট গান্ধীজীর কদর বুঝেছিলেন। তাঁকে ঘাঁটাননি। তিনিও নিজের জন্যে বা কংগ্রেসের জন্যে ক্ষমতার আসন চাননি। ফলে বড়লাটের সঙ্গে তাঁর সদ্ভাব ছিল। কিন্তু সেটা দেশের খরচে নয়। দেশ স্বাধীনতার অভিমুখে মার্চ করে চলেছিল। গণতন্ত্রের বেদীনির্মাণ করছিল। গুণগত সত্যাগ্রহ নাটকীয় নয় বলে নিষ্ক্রিয় নয়। আর কোনো দেশের নাগরিক যুদ্ধকালে এদেশের নাগরিকের মতো স্বাধীন ছিল না। ব্যক্তি স্বাধীনতায় আমরাই ছিলুম অগ্রগণ্য। নিরপেক্ষ দেশগুলি বাদে।

ওদিকে হিটলারের সৈন্য মার্চ করে চলেছিল সোভিয়েট রাশিয়ার বুকে। আমাদের সকলেরই সহানুভূতি রাশিয়ার প্রতি। কিন্তু সহানুভূতি প্রকাশ করা এক জিনিস আর 'এ যুদ্ধ আমাদের যুদ্ধ' বলা আবেক। অমন করলে নিজেদের দেশেব জনগণকে দ্বিধাবিভক্ত করা হয়। ওরা ব্রিটেনের বিরুদ্ধে গণসত্যাগ্রহ করতে গেলে দেখবে ওদেরি একভাগ রাশিয়ার কথা ভেবে সত্যাগ্রহবিমুখ ও যুদ্ধে সহযোগী। যুদ্ধটা নাকি 'জনযুদ্ধ'।

কমিউনিস্টরা কংগ্রেসের বাইরে। তাঁদের পলিসির উপব গান্ধীজীর হাত নেই। কিন্তু পরে দেখা গেল জাপান আর আমেবিকাও যুদ্ধে ঝাঁপ দিয়েছে ও জাপান একলম্ফে সিঙ্গাপুর অধিকার করেছে। পরিস্থিতি এমন ঘোরালো হবে কেউ ভাবতে পারেনি। আরো ঘোরালো হলো যখন মালয় আর বর্মা জাপানের অধিকারে চলে গেল। ব্রিটেনের দোরগোড়া যেমন বেলজিয়াম ভারতেরও দোরগোড়া তেমনি বর্মা। বেলজিয়াম আক্রমণ করলে যেমন ব্রিটেনকেও আক্রমণ করা হয় তেমনি বর্মা আক্রমণ করলে ভারতকেও। আমরা সকলেই নিজেদের জন্যে শঙ্কিত হয়ে উঠি। এবার অপরের প্রতি সহানুভূতি নয়। এবার প্রত্যক্ষ অনুভূতি। ভারত আক্রমণ এখন শুধু একটা সুদূর সম্ভাবনা নয়, সেটা অল্পদিনের মধ্যেই ঘটবে।

ইংরেজদের আচরণেও বোঝা গেল যে সিঙ্গাপুরের পতনের পর ওঁদের ডিফেন্স সীস্টেম বিকল হয়েছে। সেটাকে যতদিন না সারাতে পারা যাচ্ছে ততদিন শত্রুর আক্রমণের মুখে অপসরণই ওঁদের নীতি। সরকার থেকে আমাদের কাছে সার্কুলার আসছিল অপসরণের জন্যে প্রস্তুত থাকতে। অনেক সরকারি অফিস সমুদ্রকূল থেকে

সরানো হচ্ছিল। বর্মার পর আসাম ও বঙ্গ এটা একরকম ধরেই নেওয়া হয়েছিল। ইংরেজ সামরিক কর্মচারীদের কারো কারো সঙ্গে কথা কয়ে দেখেছি তাঁরা বাংলার আশা ছেড়ে দিয়ে রাঁচীতে লাইন টানছেন। সেই লাইন রক্ষা করবেন। আমার এক বন্ধু বিহারে চাকরি করতেন। তাঁকে তাঁর প্রাদেশিক সরকার জানিয়ে রেখেছিলেন যে যথাকালে তিনি বার্তা পাবেন, "বেঙ্গল কামিং।"

হাসির কথা নয়। বাংলার পাঁচ কোটি লোক অবশ্য বিহারে মামার বাড়ী যেত না, অধিকাংশই জাপানীদের অধীনে বাস করত। কিন্তু আইনে যাকে বেঙ্গল বলে সে কলকাতা থেকে বিহারে গিয়ে হাজির হতো। বর্মা যেমন হাজির হয়েছিল সিমলায় না মুসৌরীতে। আমার কাছে যে সার্কুলার এসেছিল তা পড়ে আমার বুঝতে বাকী ছিল না যে ইংরেজরা যদি যুদ্ধ করতে না পারে বা করা নিরর্থক মনে করে তবে বাংলাদেশ থেকে বিহার প্রভৃতি প্রদেশে সরে যাবে। তখন ইংরেজ পক্ষের প্রতিনিধিরা জাপানী পক্ষের প্রতিনিধিদের হাতে শাসনভার সঁপে দেবেন। বিধিমতো নয়, কার্যত। কিন্তু ভারতীয় পক্ষের প্রতিনিধিদের হাতে নয়। অর্থাৎ বাংলাকে বাঙালীর হাতে সঁপে দিয়ে যাবেন না। পরাধীনকে স্বাধীনতা দেবেন না।

ব্রিটিশ অপসরণের স্বরূপ তো বর্মাতেই লক্ষ করা গেল। ওরা নিজেরাই নিজ রাজ্যের কলকারখানা খনি ইত্যাদি বোমা দিয়ে বিধ্বস্ত করে দিয়ে আসে। যাতে শত্রুর হাতে না পড়ে বা শত্রুর কাজে না লাগে। একেই বলা হয় নিজের নাক কেটে পরের যাত্রাভঙ্গ। রুশদেশের লোক স্বতঃপ্রণোদিত হয়ে নেপোলিয়নের আক্রমণের সময় রাজধানীতে আগুন লাগিয়ে দিয়েছিল। সেই থেকে এর নাম পোড়ামাটি। এবার হিটলারের আক্রমণের মুখেও রুশরা পোড়ামাটি করে নিজেদের নাক কেটেছে ও নাৎসীদের যাত্রাভঙ্গ করেছে। নীতিটা রুশদের পক্ষে ভালো। তা বলে বর্মীদের পক্ষেও কি ভালো? তা যদি হতো বর্মীরাই স্বতঃপ্রবৃত্ত হয়ে এটা প্রয়োগ করত, ব্রিটিশ ফৌজকে করতে হতো না। তেমনি বাংলার পক্ষে যদি ভালো হয় বাঙালীরাই স্বতঃস্ফূর্তভাবে কলকাতা শহর পুড়িয়ে গুঁড়িয়ে ছারখার করে দেবে। ব্রিটিশ ফৌজকে ও কাজ করতে হবে না।

যেটা আক্রমণের দিন জনগণ করবে, জনফৌজ করবে সেটা কি এদেশের লোক [ব্রি]টিশ আর্মিকে বা তার ভারতীয় শাখাকে করতে দেবে? ভারতীয় সিপাহীরা [বে]তনভুক্, তারা দেশের জন্যে প্রাণ দেবার জন্যে সৈন্যদলে যোগ দেয়নি। দেশরক্ষার [জন্যে] নতুন আর্মি সৃষ্টি করতে হবে। কে সে কাজ করবে? ইংরেজ করতে না দিলে [ক]েমন করেই বা করবে? তার জন্যে যত সময় চাই তত সময়ই বা কোথায়?

জাপানীরা কি ভস্ত লম্বর দেবে ? তা হলে কি আমাদের কপালে আছে প্রভুপরিবর্তন ও পলায়মান প্রভু কর্তৃক কলকাতার বন্দর, হাওড়ার পুল, জামশেদপুরের ইস্পাতের কারখানা ধ্বংস ? ইতিমধ্যে চট্টগ্রাম বরিশালের নৌকার উপর দিয়ে হাতেখড়ি হয়েছিল। জাপানীরা যাতে খেতে না পায়। ফলে বাঙালীরাই না খেয়ে মরে।

যুদ্ধ যতদিন বহুদূরবর্তী ছিল ততদিন যুদ্ধবিরোধী নীতি হয়তো সমীচীন ছিল। যুদ্ধ যখন ঘাড়ের উপর এসে পড়ল তখনো কি সেই নীতি তেমনি সমীচীন হবে ? যুদ্ধক্ষেত্র এখন আর বেলজিয়ামে বা রাশিয়ায় নয়, এখন বর্মায় ও এর পরেই আসামে অথবা বাংলায়। যুদ্ধক্ষেত্রে আমাদের স্বনির্বাচিত নয়, নির্বাচন যারা করবে তারা বিদেশী ও তাদের পক্ষে অপসরণ যেমন সহজ পোড়ামাটিও তেমনি অকাতর ও নির্মম। জাতির জীবনে এত বড়ো একটা বিপর্যয় ঘটে যাবে, অথচ জাতি পড়ে থাকবে শক্তির চরণতলে শিবের মতো অসাড়। শবের সঙ্গে যার তুলনা। দেশ কি তা হলে মৃত ?

পরিস্থিতির গুরুত্ব উপলব্ধি করে চার্চিল ক্যাবিনেট ক্রিপসকে ভারতে পাঠান। সত্যাগ্রহী বন্দীদের বিনা শর্তে মুক্তি দেওয়া হয়। তাঁদের মধ্যে যাঁরা যুদ্ধমাত্রেরই বিরোধী তাঁরা তো মুষ্টিমেয়। যাঁরা কেবলমাত্র সাম্রাজ্যবাদী যুদ্ধের বিরোধী তাঁরা পড়ে যান বিষম ধাঁধায়।

॥ আঠারো ॥

কংগ্রেসকর্মীদের অধিকাংশের দৃঢ়বিশ্বাস ছিল যে জাপান ভারতের মিত্র নয়, গণতন্ত্রের শত্রু। সে যদি এই ফাঁকে ঘরে ঢুকে পড়ে তা হলে ইংরেজদের যা ক্ষতি হবে তার চেয়ে শতগুণ ক্ষতি হবে ভারতীয়দের। জাতীয়তাবাদের দিক থেকে, গণতন্ত্রের দিক থেকে জাপানী অনুপ্রবেশ বা আক্রমণ একটা অশুভ সূচনা। এর বিরুদ্ধে ভারতের নিজের স্বার্থেই রুখে দাঁড়াতে হবে। সুতরাং ইংরাজরাও যখন রুখতে যাচ্ছে তখন ওদের সঙ্গে হাত মেলানোই প্রকৃষ্ট নীতি। তবে, হ্যাঁ, প্রভুর সঙ্গে ভৃত্যের মতো নয় মিত্রের সঙ্গে মিত্রের মতো। ক্রিপসের প্রস্তাব যদি মিত্রোচিত হয়ে থাকে তবে কেন গ্রহণ করা হবে না ?

অপরপক্ষে এমন কর্মীও ছিলেন যাঁদের ধারণা জাপানের উদ্দেশ্য ভারতকে আবার পরাধীন করা নয়। সে ভারত অধিকার করতে আসেনি, সুতরাং তার সঙ্গে শত্রুতা

কথা উচিত নয়। শত্রুতা করতে পারে ইংরেজ, কিন্তু ভারতবাসী কেন করতে যাবে? সুতরাং ইংরেজের সঙ্গে হাত মেলাতে যাওয়া সুবুদ্ধি নয়। ইংরেজরা লড়তে চায় লড়ুক। ওটা ওদের যুদ্ধ ভারতীয়দের নয়। তা বলে ইংরেজকে বিব্রত করতে হবে এমন কোনো কথা নেই। শুধু এইটুকু দেখলেই চলবে যে ওরা পোড়ামাটি করছে না। ভদ্রভাবে অপসরণ করে চলে যাচ্ছে।

আবার এমন কর্মীও ছিলেন—সাধারণত কংগ্রেস বাইরে—যাঁরা মনে করতেন ওটা একটা মওকা। জাপান এলেই ভারত স্বাধীন হবে। জাপানের সাহায্য নিয়ে ইংরেজকে উচ্ছেদ করা যেন কাঁটা দিয়ে কাঁটা তোলা। ক্ষতি যা হবার তা ইংরেজেরই হবে, ভারতের ক্ষতির মধ্যে হবে শিকল হারানো। জাপান কখনো এদেশকে ইংরেজের মতো দাবীয়ে রাখতে পারবে না। জাপান যাবেই, রেখে যাবে ভারতের স্বাধীনতা।

সেদিন ভারতের চিন্তাজগৎ যেমন বিভ্রান্ত বা উদভ্রান্ত হয়েছিল তেমন আর কোনোদিন হয়নি। জাপানের মতো এক মহাশক্তিকে হঠাৎ প্রতিবেশীরূপে পাওয়া একটা অভূতপূর্ব ও অপ্রত্যাশিত ব্যাপার। কারো মতে ওটা মন্দ কারো মতে ভালো, কারো কারো মতে ভালোও নয় মন্দও নয়। কেউ জাপানের বিপক্ষে, কেউ পক্ষে, কেউ নিরপেক্ষ। কেউ তার বিরুদ্ধে লড়বেন, কেউ লড়বেন না, কেউ তার সাহায্য নিয়ে ইংরেজের বিরুদ্ধেই লড়বেন।

এই হলো ক্রিপস প্রস্তাবের পটভূমিকা। মহাত্মা সেবাগ্রাম থেকে নড়তে চাননি, নেহাৎ ক্রিপসের সঙ্গে ব্যক্তিগত বন্ধুতার খাতিরে দিল্লী যান। মনে রাখতে হবে যে গান্ধীজীকে বড়লাট ডাকেননি, এটা সরকারী আহ্বান নয়, কথাবার্তা বড়লাটের সঙ্গে হচ্ছে না। বড়লাট যে কী ভাবছেন তা গান্ধীজীকে জানাননি।

ক্রিপসের সঙ্গে সাক্ষাৎ হলে মহাত্মা বলেন, "এই যদি হয় আপনার সমগ্র প্রস্তাব তবে আমার পরামর্শ আপনি পরের প্লেনে বাড়ী ফিরে যান।"

প্রস্তাবটি সংক্ষেপে এইরূপ। ইণ্ডিয়ান ইউনিয়ন বলে একটি নতুন রাষ্ট্র গঠিত হবে। তার মর্যাদা হবে ডোমিনিয়ন স্টেটাস। ইচ্ছামাত্র সে ব্রিটিশ কমনওয়েলথ ত্যাগ করতে পারবে। যুদ্ধ শেষ হবার সঙ্গে সঙ্গেই একটি সংবিধান সংরচক সংস্থা স্থাপন করা হবে। সে যে সংবিধান সংরচন করবে ব্রিটিশ সরকার তাকেই স্বীকার করে নেবেন ও সেই অনুসারে কাজ করবেন, কিন্তু দুটি শর্তে। প্রথম শর্ত যদি কোনো এক বা একাধিক প্রদেশ সে সংবিধানে সায় না দেয় তবে সে বা তারা স্বতন্ত্র সংবিধান প্রণয়ন করতে পারবে ও ব্রিটেন তাকে বা তাদের ইণ্ডিয়ান ইউনিয়নের সমান মর্যাদা দিতে পারবে। তেমনি

কোনো এক বা একাধিক দেশীয় রাজ্য যদি স্বতন্ত্র সংবিধান প্রণয়ন করতে চায় তার বেলা ও তাদের বেলাও তাই হবে। সংবিধান সংরচক সংস্থায় দেশীয় রাজ্যের প্রতিনিধিও থাকবেন। দ্বিতীয় শর্ত, ব্রিটিশ সরকার ও সংবিধান সংরচক সংস্থার মধ্যে একটি সন্ধিপত্র সম্পাদন করতে হবে, তাতে থাকবে ব্রিটিশ হস্ত থেকে ভারতীয় হস্তে সমূহ দায়িত্ব হস্তান্তর সংক্রান্ত যাবতীয় সমস্যার মীমাংসা।

এসব তো যুদ্ধোত্তর কালে। যদি যুদ্ধে জয় হয়। যুদ্ধকালে যুদ্ধজয়ের জন্যে যা হবে তা বড়লাটের শাসনপরিষদের ভারতীয়করণ। পারিষদরা বিভিন্ন দলের প্রতিনিধি। কিন্তু সামরিক ক্ষমতা ও দায়িত্ব থেকে যাবে জঙ্গীলাটের হাতে। তিনিও পূর্ববৎ পরিষদের সভ্য থাকবেন। আর বড়লাটও তাঁর হস্তক্ষেপের অধিকার রাখবেন।

প্রস্তাবটা এককথায় নাকচ করবার মতো হলে কংগ্রেস নেতারা পনেরো ষোলো দিন ধরে ক্রিপস মহাশয়ের সঙ্গে আলাপ আলোচনা করতেন না। মানুষকে ভগবান ভবিষ্যদ্দৃষ্টি দেননি। দিলে হয়তো গান্ধীজীও পত্রপাট প্রত্যাখ্যান করতেন না সে প্রস্তাব। তার কোথাও কি হিন্দুস্তান বা পাকিস্তানের উল্লেখ ছিল? সাম্প্রদায়িক কারণে ইউনিয়ন থেকে বিচ্ছিন্ন হবার কথা ছিল কি? হিন্দু মেজরিটি বা মুসলিম মেজরিটিরও নামগন্ধ ছিল না। সেদিন যদি কংগ্রেস ক্রিপস প্রস্তাব গ্রহণ করত তা হলে ভাবী ইণ্ডিয়ান ইউনিয়ন প্রথমেই রচনা করত একটি এজমালী সংবিধান। যাদের আপত্তি হতো তারা যোগ দিত না তা ঠিক, কিন্তু প্রদেশকে প্রদেশ দ্বিখণ্ডিত হতো না। হলে পারস্পরিক চুক্তিতে হতো। পরের মধ্যস্থতায় নয়।

আসলে যুদ্ধজয় ছিল একটা অনিশ্চিত প্রশ্ন। যুদ্ধে সহযোগিতা চোখ বুজে করলে পোড়ামাটির দায়িত্ব কংগ্রেসের ঘাড়েই চাপত। বড়লাট ও জঙ্গীলাট তো নিরাপদস্থলে অপসরণ করতেন, দেশের নেতাদেরই জাপানের সঙ্গে মোকাবিলা করতে হতো, যেমন বর্মায়। যেটা অনিশ্চিত সেটাকে সুনিশ্চিত করতে হলে চার্চিলের মতো একজন ভারতীয় জননায়ককে রণনায়ক করতে হয়। যেমন জবাহরলাল নেহরুকে। তিনি সে ভূমিকা নিতে ইচ্ছুকও ছিলেন। তিনি রণনায়ক হলে জনগণ তাঁর পেছনে দাঁড়াত। জাপানকে প্রাচীরের মতো রোধ করত। কিন্তু সে ভূমিকা তাঁকে দিচ্ছে কে? ক্রিপস পরিষ্কার করে বলেন যে বড়লাটের পরিষদে জঙ্গীলাটের যে ভূমিকা তার বিশেষ কোনো রদবদল হবে না।

তৎকালীন শাসনতন্ত্র অনুসারে জঙ্গীলাট কারো কাছে জবাবদিহি করতে বাধ্য ছিলেন না। এমন কি বড়লাটের কাছেও না। তাঁর নিয়োগ ভারতবর্ষে হলেও দায়িত্ব ব্রিটিশ সামরিক কর্তাদের কাছে। ব্রিটেন থেকেই বোতাম টেপা হয়, সাম্রাজ্যের

সতরক্কে সৈন্যচলাচল হয়। ইণ্ডিয়ান আর্মি আসলে ব্রিটিশ আর্মির একটি শাখা। মিলিটারি সীক্রেট একজন ভারতীয় সমরসচিবকে জানতে দেওয়া হবে, এ কি কখনো ভাবতে পারা যায়? তেমন একজন ভারতীয় যদি সচিব পদে মনোনীত হন তবে তিনি হয়তো মহামান্য আগা খান বা বিকানীরের মহারাজা জাতীয় রাজভক্ত পুরুষ। জবাহরলাল নেহরু তো নন‌ই, ঝীণা সাহেবও না। ভারতীয়করণ ততদূর যেতে পারে না। জাপানের ভয়েও না। ভারত বা তার একাংশ যদি জাপান কেড়ে নেয় তবে ইংরেজ পরে ফেরৎ পাবে। কিন্তু যুদ্ধ বেধেছে বলে ভারতের জিনিস ভারতকে দেওয়া হবে এটা যে সাম্রাজ্যবাদের পক্ষে অভাবনীয়।

ক্রিপস প্রস্তাব চার্চিলগোষ্ঠীর দিক থেকে বিরাট কনসেশন। কিন্তু কংগ্রেসের দিক থেকে স্বাধীনতার চেয়ে অনেক কম। সাম্রাজ্যবাদকে তার বিপদে সাহায্য করলে সে আরো শক্ত হয়ে ঘাঁটি গেড়ে বসবে। বিপদটা অবশ্য তার একার নয়। ভারতেরও। সেইজন্যে জবাহরলাল ও আজাদ ক্রিপসের সঙ্গে বোঝাপড়ার জন্যে আপ্রাণ করেছিলেন। কিন্তু ওদিকে চার্চিলের ও এদিকে বড়লাটের দলবল পাষাণের মতো নিরেট। যুদ্ধকালে সিভিল পাওয়ার অনেকটা ছেড়ে দেওয়া যায়, কিন্তু মিলিটারি পাওয়ার কথামাত্র নয়। অথচ মিলিটারি পাওয়ার না হলে দেশ রক্ষা করা যায় না। সেই নিয়ে মতবিরোধ থেকেই ক্রিপস মিশন ব্যর্থ হলো। যদিও যুদ্ধোত্তর ব্যবস্থা নিয়েও মতবিরোধ ছিল।

কংগ্রেস নেতারা আশা করলেন যে রুজভেল্ট চার্চিলের উপর চাপ দেবেন। দিয়েওছিলেন, কিন্তু চার্চিল তাতে রুষ্ট হন। অগত্যা কংগ্রেস নেতাদের আবার সেই নাঙ্গা ফকিরের কাছে ফিরে যেতে হয় চার্চিলের সঙ্গে যাঁর উত্তরমেরু দক্ষিণমেরু সম্পর্ক। জাপানের সঙ্গে যুদ্ধ করতেন যাঁরা তাঁরা মহাত্মার শিবিরে গিয়ে যুদ্ধবিরোধী সত্যাগ্রহী হন। অহিংসার থেকে হিংসা, হিংসার থেকে অহিংসা, একটার থেকে আরেকটায় যাওয়া আসা কত সহজ!

সরকারপক্ষ ও কংগ্রেসপক্ষ উভয়পক্ষই ধরে নিয়েছিলেন যে সিঙ্গাপুরের পর যেমন মালয়, মালয়ের পর যেমন বর্মা, বর্মার পর তেমনি আসাম ও বাংলা। অন্তত সামরিক ঘাঁটিগুলোর ওপর জাপানীরা বোমাবর্ষণ করবেই, যাতে ভারত থেকে পাল্টা আক্রমণ না হয়। কলকাতাও একটা সামরিক ঘাঁটি। একটা বিরাট সামরিক ঘাঁটি। সুতরাং বিপদের আশঙ্কা শুধু যে ছিল তাই নয় বিপদ সেদিন পা টিপে টিপে আসছিল আর তার জন্যে মনটাকে আমরা বাঁধছিলুম। ইতিমধ্যে লক্ষ লক্ষ লোক যেখানে পারে সেখানে পালিয়েছিল। পালিয়েও কি বাঁচত? পেটের খোরাকে টান পড়তই, কারণ সামরিক

লোকে নিজেরাই নিজেদের শান্তি ও শৃঙ্খলা বিধান করবে। গ্রামে গ্রামে গড়ে উঠবে গণ পঞ্চায়েৎ। ক্ষুদে রেপাবলিক। বিনা হাতিয়ারেই তারা চোর ডাকাত ও বাইরের আক্রমণকারীদের রুখবে। মরবে, মারবে না। মার খাবে; তবু খাজনা দেবে না। সম্পত্তি খোয়াবে, তবু মান খোয়াবে না। এরকম সাত লক্ষ রেপাবলিক যেদেশের আছে তার কিসের ভয়? বেয়োনেট তার কী করতে পারে?

তিনি প্রথম যেবার গণসত্যাগ্রহ করতে যান সেখানে সাত লক্ষ রেপাবলিকই ছিল তাঁর ধ্যান। বারদোলির থেকে শুরু হতো পদক্ষেপের পর পদক্ষেপ। শেষ হতো কবে আর কোথায় তা ভগবানের ভাবনা। তড়িৎগতিতে গণসত্যাগ্রহ সারা হবে এমন কথা তিনি বলেননি। পরে আর তিনি ও ধরনের গণসত্যাগ্রহ করলেন না। যেটা হলো সেটা লবণ আইন ও অন্যান্য আইনভঙ্গ। অথবা বয়কট। ১৯২২ সালের মনের সাধ মনেই রয়ে যায়। ঠিক বিশ বছর পরে ১৯৪২ সালে সেই পুরাতন স্বপ্নের প্রত্যাবর্তন। এবারকার গণসত্যাগ্রহ গ্রামে গ্রামে গণ-পঞ্চায়েৎ প্রতিষ্ঠা করবে, নিচের দিক থেকে পিরামিডের মতো গড়ে উঠবে নতুন শাসনব্যবস্থা, যার অধোভাগ প্রশস্ত, ঊর্ধ্বভাগ সঙ্কীর্ণ।

ততদিনে তিনি রক্তাক্ত অরাজকতার ভীতি কাটিয়ে উঠেছেন। চৌরীচৌরা আর তাঁকে নিবৃত্ত করবে না। এই প্রসঙ্গে তিনি বলেন।

"That is the consideration that has weighed with me all these twenty-two years. I waited and waited, until the country should develop the non-violent strength necessary to throw off the foreign yoke. But my attitude has now undergone a change. I feel that I cannot afford to wait. If I have to wait, I might have to wait till doomsday. For the preparation that I have prayed for and worked for may never come, and in the meantime, I may be enveloped and overwhelmed by the flames that threaten all of us. That is why I have decided that even at certain risks, which are obviously involved, I must ask the people to resist the slavery."

।। উনিশ ।।

অগাস্ট অভ্যুত্থান গণসত্যাগ্রহ নয়। গণসত্যাগ্রহ আরম্ভ করবার পূর্বেই গান্ধীজীকে বন্দী করা হয়। সুতরাং ওটা অনারব্ধ থেকে গেল। ইতিহাসের গর্ভে অজাত সন্তানের মতো।

তার বদলে যেটা ঘটে সেটা একটা স্বতঃস্ফূর্ত প্রাকৃতিক উচ্ছ্বাস। বন্যা বা ভূমিকম্প। কিন্তু তার পেছনেও কংগ্রেস কর্মীদের হাত ছিল। বেশীর ভাগই বামপন্থী, কিছু কিছু আবার গোঁড়া গান্ধীপন্থী। সচরাচর যাঁরা খাদির কাজ নিয়ে ব্যস্ত। রাজনীতির ঘোলাজলের বাইরে পবিত্র জীবন যাপন করেন।

কলকাতায় তখন নিষ্প্রদীপ। অন্ধকারে গা ঢাকা দিয়ে বেড়ালে কেই বা টের পাচ্ছে? একদিন আঁধার রাতে কলকাতার এক নির্জন পথে আমরা তিনজন পায়চারি করছিলুম। আমার স্ত্রী, আমি ও আমাদের গান্ধীবাদী বন্ধু। অবাক কাণ্ড। তিনি তখন আণ্ডারগ্রাউণ্ডে পুলিশের চোখে ধুলো দিয়ে ঘুরছেন। আসাম থেকে তাঁর কাছে কর্মীরা আসেন নির্দেশ নিতে। ফিরে গিয়ে সেই নির্দেশ পালন করেন। কী রকম নির্দেশ? টেলিগ্রাফের তার কাটা, রেল লাইন ভেঙে ফেলা এসব শুনলে আমি স্তম্ভিত হতুম না, কারণ বিহারেও এসব হয়েছিল, আর আমি তখন বাঁকুড়ায়। স্তম্ভিত হলুম যখন বন্ধুর মুখে শুনলুম যে তিনি নির্দেশ দিয়েছেন রেলের পুল ধ্বংস করতে। কী সর্বনেশে কথা!

তিনি আমাকে বোঝান যে রেলের পুল ধ্বংস করলে মিলিটারি যাতায়াত বন্ধ হবে। জাপানীরা এগিয়ে আসতে পারবে না, ইংরেজরাও এগিয়ে যেতে পারবে না। মাঝখানে একটা এলাকা থাকবে, সেটা নো ম্যানস ল্যাণ্ড। সেখানে আমরাই রাজা। তা ছাড়া সেটা হবে যুদ্ধমুক্ত অঞ্চল। সেখানে যুদ্ধবিগ্রহ চলবে না। দেশ যাতে যুদ্ধক্ষেত্রে পরিণত না হয় তার জন্যেই যাতায়াতের ব্যবস্থা অচল করে দিতে হবে।

দেশ যাতে যুদ্ধক্ষেত্রে পরিণত না হয় তার জন্যে দুই পাগলা ষাঁড়কে পরস্পরের কাছ থেকে ঠেকিয়ে রাখা যে শান্তিবাদীর কর্তব্য সেবিষয়ে আমার সংশয় ছিল না। কিন্তু আমার জিজ্ঞাস্য ছিল, "উপায়টা কি অহিংস? রেলের পুল ধ্বংস করা—।"

"আমাদের সম্পত্তি, ইংরেজদের সম্পত্তি নয়। আমাদের সম্পত্তি আমরা যদি ধ্বংস করি তবে হিংসা হবে কেন? মানুষকে তো মারছিনে। বরং মানুষকে যুদ্ধের মুখ থেকে

বাঁচাতে চাইছি। নির্দেশ দেওয়া আছে যেন একটিও প্রাণ নষ্ট না হয়।" বন্ধুর উক্তি।

অর্থাৎ এটাও এক প্রকার পোড়ামাটি। তফাৎ এই যে এটা দুই যুধ্যমান পক্ষের বিরুদ্ধে। ইংরেজরা বলবে সাবোটাশ। কিন্তু ইতিহাস বলবে আত্মরক্ষা।

ওই পুল হয় ইংরেজরা ওড়াত, নয় জাপানীরা ওড়াত। ওসব রেললাইন হয় ইংরেজরা ওপড়াত, নয় জাপানীরা ওপড়াত। ওসব টেলিগ্রাফের তার হয় ইংরেজরা কাটত, নয় জাপানীরা কাটত। জাপানীরা যদি আক্রমণ করত তা হলে ওর নাম হতো মিলিটারি নেসেসিটি। তখন সকলের মুখ বন্ধ। কিন্তু শান্তিবাদীরা করলে মহাভারত অশুদ্ধ হয়। ও যে অহিংসা নয়!

গান্ধীজীকে আগা খান্ প্রাসাদে বন্দী করে বড়লাট তাঁকেই দায়ী করেন আগস্ট অভ্যুত্থানের যাবতীয় যুদ্ধবিরোধী সমাজবিরোধী আইনবিরোধী ঘটনার জন্যে। তিনি সে দায়িত্ব অস্বীকার করেন ও বড়লাটকে পরামর্শ দেন আদালতে বিচারের জন্যে পাঠাতে। এই নিয়ে পত্রব্যবহার অনেকদিন ধরে গড়ায়। তারপরে বেরোয় সরকারী প্রচারপুস্তিকা, তাতে অভ্যুত্থানের বিস্তারিত বিবরণ দিয়ে কংগ্রেসকে ও গান্ধীকে বিনা বিচারে অপরাধী করা হয়। দুনিয়ার চারিদিকে রটে গান্ধী ও কংগ্রেস যে কেবল ব্রিটেনের শত্রু তাই নয়, জাপানের মিত্র ও তাঁদের কার্যকলাপ যুদ্ধজয়ের পরিপন্থী। গান্ধীর বিরুদ্ধে বিশেষ অভিযোগ তিনি অহিংসার বদলে হিংসার বিধান দিয়েছেন।

এর কোন প্রতিকার খুঁজে না পেয়ে গান্ধীজী অনশনের সঙ্কল্প নেন। তখন জানানো হয় তাঁকে অনশন কালের জন্যে ছেড়ে দেওয়া হবে। তিনি তার উত্তরে বলেন, ছেড়ে দিলে তিনি অনশন নাও করতে পারেন। তখন প্রতিকারের অন্য উপায় পাবেন। তা শুনে বড়লাট সিদ্ধান্ত করেন যে অনশনটা বিনা শর্তে মুক্তি পাবার জন্যে একটা চাল। কাজেই অনশনের একুশদিন ছেড়ে দেওয়া হবে এরূপ প্রস্তাব রদ করেন।

এমনি করে শুরু হয় সেই হৃদয়বিদারক অভিজ্ঞতা। গান্ধীজীর না হোক আমাদের। কিছুই করতে পারিনে আমরা। এত অসহায়। ওই অনশন পর্যন্তই আমাদের দৌড়। সেটা আর কতটুকু সময়ের জন্যে! একুশ দিন ধরে চলে তাঁর অনশনের ম্যারাথন। কী করে যে বাঁচলেন!

লোকে একটি আঙুলও নাড়ল না। দার্শনিকের মতো মৌন হয়ে দেখল। ছ'মাস আগে যারা অত বড়ো একটা বিদ্রোহ করতে পারল ছ'মাস পরে তারা একেবারে ঠাণ্ডা। এই হচ্ছে হিংসার পরিণাম। হিংসাকে প্রতিহিংসা দিয়ে দমিয়ে দিলে পরে সে আর মাথা তুলতে পারে না। সিপাহী বিদ্রোহীর বেলাও তাই হয়েছিল।

গান্ধীজীর অন্ত্যেষ্টির জন্যে গভর্নমেন্ট উদার ব্যবস্থা করেছিলেন। চন্দনকাঠ ইত্যাদি সংগ্রহ করে রাখা হয়েছিল। ম্যাজিস্ট্রেটদেরও সতর্ক থাকতে নির্দেশ দেওয়া হয়েছিল যাতে শান্তিভঙ্গ না হয়। আমার ম্যাজিস্ট্রেট বন্ধু খবরটা আমাকে দেন। না, শান্তি-ভঙ্গের লেশমাত্র লক্ষণ ছিল না। গান্ধীজীর প্রয়াণ লোকে শান্তভাবেই নিত। কিন্তু ক্ষমা করত না ইংরেজদের।

ইতিহাসের রায় কী বলতে পারিনে, কিন্তু আমার নিজের রায়, ওই আগস্ট মাসটাই তাঁর জীবনের ফাইনেস্ট আওয়ার, সুন্দরতম ঘটিকা। যুদ্ধকালে আর কখনো কেউ যুদ্ধবিরোধী শান্তিবাদী জন আন্দোলনের ডাক দিয়ে যাননি। রেজিস্টান্স বা প্রতিরোধ হয়েছে হিটলার অধিকৃত ফ্রান্সে। যুগোস্লাভিয়ায় হয়েছে নাৎসী আক্রমণের পর সশস্ত্র বিদ্রোহ। কিন্তু ওসব সংগ্রাম যুদ্ধকালীন হলেও শান্তির জন্যে নয়, দুই আগুনের মধ্যবর্তী নয়। তা ছাড়া ওসব দেশের সাময়িক শাসকগণ অনবচ্ছিন্ন দুই শতাব্দীর বদ্ধমূল রাষ্ট্রীয় ব্যবস্থার ঊর্ধ্বতম অঙ্গ নন। গান্ধীর ওই কীর্তি যদিও গণসত্যাগ্রহ নয় তা হলেও ইতিহাসে অভূতপূর্ব। বাইরে যদিও থাকতে দেওয়া হলো না তাঁকে, তবু নিছক আত্মিক বল দিয়ে তিনিই নেপথ্য থেকে প্রেরণা দিচ্ছিলেন।

এই প্রসঙ্গে তিনি বলেছিলেন মনে আছে যে শরীর না থাকাটাই সব চেয়ে ভালো, শরীরটা কেবল বাধা দেয়। অবারিত আত্মা তা হলে আরো স্বাধীনভাবে কাজ করতে পারবে। তিনি যদি শুধু চিন্তাই করেন, আর কিছু না করেন, তা হলেও কাজ তাঁর চিন্তামতো হবে। অর্থাৎ তাঁকে জেলেই পোরা হোক আর গুলীই করা হোক, যে চিন্তা সেই কাজ। এখন চিন্তাটাই আসল। চিন্তার সাহস ক'জনের আছে? আর সে চিন্তা এমন চিন্তা হওয়া চাই যা ইতিহাসের গতিপথের নির্দেশক। ব্যক্তি-বিশেষের দিবাস্বপ্ন নয়।

গান্ধীজী সেদিন ইতিহাসের গতিপথ নির্দেশ করে দেন। সঙ্গে সঙ্গেই তাঁকে গ্রেপ্তার করা হয়। গুলী করা হতো যদি জাপান সেই মুহূর্তে জয়যাত্রা করে ইংরেজকে কোণঠাসা করত। গান্ধীজী সেবিষয়ে অবহিত ছিলেন বলেই এমন লগ্নে বিদ্রোহ করেন যে লগ্ন জাপানী আক্রমণের প্রতিকূল। যখন বাংলায় আসামে চতুর্মাস্যা। তা ছাড়া একথাও তিনি বলে রাখেন যে জাপানীরা তাঁর আন্দোলনের সুযোগ নিলে তিনি তা বন্ধ করে দেবেন।

কিন্তু এহো বাহ্য। এর চেয়ে গূঢ় সত্য হলো তাঁর হৃদয় ছিল ইংরেজদের প্রতি প্রেমে পরিপূর্ণ। তিনি ওঁদের আন্তরিক ভালোবাসতেন। আর ওঁরাও সেটা অনুভব করতেন। অগাস্টের আগে বড়লাট বলেছিলেন প্রখ্যাত মার্কিন লেখক লুইস ফিশারকে—

"Make no mistake about it.…The old man is the biggest thing in India.…He has been good to me.…If he had come from South Africa and been only a saint he might have taken India very far. But he was tempted by politics.…I have been here six years and I have learned restraint…but if I felt that Gandhi was obstructing the war effort I would have to bring him under control."

তা ছাড়া ইংরেজ প্রধানরাও দেয়ালের লিখন পড়তে জানতেন। সিঙ্গাপুর, মালয়, বর্মার পতন তাঁদের প্রেস্টিজে নাড়া দিয়েছিল। শুধুমাত্র গায়ের জোরে তো এত বড়ো সাম্রাজ্য রক্ষা করা যায় না। প্রভাব প্রতিপত্তিও চাই। বড়লাটই লুইস ফিশারকে বলেছিলেন, "আমরা ভারতবর্ষে থাকতে যাচ্ছিনে। অবশ্য, কংগ্রেস একথা বিশ্বাস করে না। কিন্তু আমরা এদেশে থাকব না। আমরা প্রস্থানের জন্যে প্রস্তুত হচ্ছি।"

স্বরাষ্ট্রসচিব ম্যাক্সওয়েল তো আরো খোলসা করে বলেছিলেন ফিশারকে, "যুদ্ধ শেষ হবার দু'বছর বাদেই আমরা এদেশ থেকে বেরিয়ে যাচ্ছি।"

এসব কথা অগাস্ট ঘটনাবলীর পূর্বের। পূর্বের থেকেই প্রস্থানের ভাব মনে উদয় হয়েছিল। গান্ধীজীর সঙ্গে বড়লাটের খুব বেশী মতভেদ ছিল না। মাত্র পাঁচ বছর এদিক ওদিকের। একটা জাতির ইতিহাসে পাঁচটা বছর এমন কী বেশী সময়! তবু গান্ধীর কাছে ব্যবধানটা অসহ্য হয়ে উঠেছিল। সেই ঐতিহাসিক ঘটিকায় তিনি ভারতকে এমন এক মহত্ত্ব দিতে চেয়েছিলেন যার দরুন আর সব দেশের লোক তার দিকে শ্রদ্ধার সঙ্গে তাকাত। তার কথা শ্রদ্ধার সঙ্গে শুনত। কে জানে সে হয়তো বিশ্বশান্তির দূত হতো।

অনেকেই ধরতে পেরেছিলেন যে গান্ধীজীর প্রকৃত উদ্দেশ্য জাপানের সঙ্গে সম্মানজনক সন্ধি করা। সেটা ইংরেজ থাকতে হবার নয়। ইংরেজ আমেরিকানরা জাপানের আত্মসমর্পণ চায়। জাপানও বিনা শর্তে আত্মসমর্পণ করবে না। এরাও শর্তাধীন আত্মসমর্পণ গ্রাহ্য করবে না। তা হলে ভারত কেনই বা এই ঝগড়ায় জড়িয়ে পড়বে! জাপান এমন কী ক্ষতি করেছে ভারতের!

তা হলে দেখা যাচ্ছে ওর পেছনে ছিল পররাষ্ট্রনীতির প্রশ্ন। সে প্রশ্নে গান্ধী বড়লাট কখনো একমত হতে পারতেন না। গান্ধী চার্চিল তো উত্তরমেরু দক্ষিণমেরু। রুজভেল্ট ভারতের বন্ধু হলেও জাপানের শত্রু। তাঁর পররাষ্ট্রনীতি যদি ভারতেরও পররাষ্ট্রনীতি হয় তবে রুজভেল্টের দৌলতে শাসনক্ষমতা হাতে পেয়ে কংগ্রেস রুজভেল্টেরই পদাঙ্ক অনুসরণ করবে ও জাপানের শত্রু হবে। [illegible] করবে জাপানকে অকারণে

খোঁচানো হবে। সে কি সন্ধি করবে তাদের সঙ্গে? দেশ কি যুদ্ধক্ষেত্র হবে না? গান্ধী যুদ্ধ ডেকে আনতে চান না। কিন্তু জাপান যদি আসে প্রতিরোধ করবেন।

গান্ধীজীর পররাষ্ট্রনীতি ছিল স্বতন্ত্র ও স্বাধীন দেশের মতো। তিনি যে সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন সেটাও স্বাধীন মানুষের মতো। চার্চিল রুজভেল্টের সঙ্গে পায়ে পা মিলিয়ে চলার নাম ভারতীয় স্বাধীনতা নয়। জাপানকে রুখতে হবে একশো বার। কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে সন্ধির কথাবার্তাও চালাতে হবে। তাতে যদি যুদ্ধ একটু আগে শেষ হয় তা হলে তো বিশ্বের আরাম, আর যদি কোনো পক্ষকে বিনাশর্তে আত্মসমর্পণ না করতে হয় তবে তো আরো উত্তম।

যেখানে সামরিক কর্তৃত্ব নিয়ে গভীর মতবিরোধ, যেখানে পররাষ্ট্রনীতি নিয়ে মূলগত মতভেদ সেখানে যুদ্ধকালীন গভর্নমেন্ট গঠন করা যায় না, যুদ্ধকালীন অসহযোগই সেখানে একমাত্র নির্ভরযোগ্য নীতি। অগাস্ট অভ্যুত্থান গভর্নমেন্ট পরিবর্তনের জন্যে পরিকল্পিত হয়নি, যদিও কংগ্রেসের অগাস্ট প্রস্তাবটা পড়লে সেইরকম মনে হবে। পরিকল্পনাটা জনগণকে জাগানো ও তাদের ভাগ্য তাদের হাতে নিতে শেখানো। যুদ্ধে নয়, যুদ্ধবিরোধিতাতেই তাদের আত্মশক্তির উপলব্ধি।

অগাস্ট আন্দোলন অহিংসাব্রতী না হলেও আত্মউপলব্ধির একটা মধুর স্বাদ রেখে যায়। তার সঙ্গে অহিংসার স্বাদ থাকলে সে মাধুরী তিক্ততাহীন হতো। সেটা হবার নয়। স্বাধীনতা যেমন অনেকদূর এগিয়ে গেল, অহিংসা তেমনি অনেকদূর পিছিয়ে রইল। অগাস্ট আন্দোলনের ফলশ্রুতি স্বাধীনতার দিক থেকে প্রগতি, অহিংসার দিক থেকে অগতি। গান্ধীজী একই সঙ্গে জিতলেন ও হারলেন। দেশ দিনকের দিন সহিংস ও অরাজক হলো। তবে তার আগে কিছুকাল বলহীন ও অবসন্ন।

সেই অবসাদের সময়টাতেই বাংলার মন্বন্তর ঘটে যায়। বাংলা সরকার চরম অপদার্থতার পরিচয় দেন। আশ্চর্যের কথা বড়লাট লিনলিথগৌ ছিলেন কৃষিবিশারদ। প্রথমবার ভারতে এসেছিলেন কৃষি কমিশনের সভাপতি হয়ে। ভারত সরকারের সর্বময় কর্তা হিসাবে তিনিও দায়িত্ব এড়াতে পারতেন না। মন্বন্তর বিহারে ও যুক্ত প্রদেশেও ছড়াতে যাচ্ছিল। সেসব প্রদেশের গভর্নররা কঠোর হস্তে প্রতিরোধ করেন। ছুটি নিয়ে আলমোড়ায় বসে আমি গভর্নর হ্যালেটের সুব্যবস্থার সাক্ষী হই।

বাংলা আর যুক্ত প্রদেশ এই দুই জায়গার অভিজ্ঞতা থেকে আমার এই শিক্ষা হয় যে ভারতীয় বণিকদের বিশ্বাস করা যায় না, তাদের উপরে অঙ্কুশ প্রয়োগ করা চাই। আর সেকাজ ইংরেজরাই ইচ্ছা করলে পারতেন। সেখানে নির্বোধ নন।

কথাগুলো আমি গান্ধীজীকে শোনাতে চেয়েছিলুম। কিন্তু শোনাতে পারিনি।

শোনালে লাভ কী হতো ? ভারতীয় বণিকদের সুমতি উদ্রেক করা তাঁরও সাধ্যের বাইরে। অহিংসার সব চেয়ে বড়ো সমস্যা ছিল কী করে গরিবকে বড়লোকের শোষণ থেকে বাঁচাতে হয়। সে সমস্যার সঙ্গে মোকাবিলা করার আগেই আরেক সমস্যা তাঁর কাল হয়। সাম্প্রদায়িক সমস্যা।

গান্ধীজী যখন জেলে তখন তাঁর পক্ষে অবহিত হওয়া সম্ভব ছিল না সাম্প্রদায়িক দলগুলি কী ভাবে পরস্পরবিরোধী কার্যক্রমের দ্বারা পরস্পরের বলবৃদ্ধি করে চলেছে। দৃশ্যত শত্রু, বস্তুত মিত্র। সাম্প্রদায়িকতা উভয়ক্ষেত্রেই জাতীয়তার নামাবলী ধারণ করেছিল। মুসলিমরা নাকি এখন একটা সম্প্রদায় নয়, একটা নেশন। তেমনি হিন্দুরাও এখন একটা সম্প্রদায় নয়, একটা নেশন। এ যেমন মুসলিম লীগের নয়া থীসিস তেমনি হিন্দু মহাসভার নতুন তত্ত্ব হলো হিন্দুরাই একমাত্র নেশন, মুসলমান খ্রীষ্টানরা নেশন নয়, এলিয়েন। কতকটা জার্মান ইহুদীর মতো। সেদিন জনমত এমন বিভ্রান্ত ছিল যে জাতীয়তার মুখোশপরা এই সাম্প্রদায়িকতাকে জাতীয়তা বলে অনেকে ভুল বুঝেছিল ও প্রশ্রয় দিয়েছিল।

যে প্রদেশে ত্রিশ লক্ষ হিন্দু মুসলমান একটু ফ্যান না পেয়ে একমুঠো ভাত না পেয়ে পথে ঘাটে মারা যায় সেই প্রদেশেই শোনা গেল উপনির্বাচনে মুসলিম লীগ জিতেছে। আমার ধারণা ছিল লীগ হেরে যাবে, কারণ যুদ্ধের সময় যখন চট্টগ্রাম নোয়াখালী বরিশাল বিপন্ন তখন লীগ অগাস্ট অভ্যুত্থানের মতো কোনো আন্দোলন করেনি, যা করবার তা করেছে কংগ্রেস। কিন্তু বিচিত্র মানুষের মন। অগাস্ট অভ্যুত্থানে মুসলমানরা প্রায় জায়গায় সরে দাঁড়িয়েছে। আমার এক মুসলমান বন্ধুর সঙ্গে এ নিয়ে কথাবার্তার সময় তিনি বলেন, "আমার প্রদেশের মুসলমানরা তো কংগ্রেসকে অভিশাপ দিচ্ছে।"

তিনি যুক্ত প্রদেশের মুসলমান। সিপাহীবিদ্রোহের অভিজ্ঞতা তাঁর স্মরণে জ্বলজ্বল করছে। হিন্দু মুসলমান একযোগে বিদ্রোহ করে ফায়দা কী হলো ? মুসলমানদের ধরে ধরে ঝুলিয়ে দেওয়া হলো। ওদের সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত হলো। আর হিন্দুরা সেসব কিনে নিয়ে বড়লোক হয়ে গেল। এই অগাস্ট অভ্যুত্থানও তো সেই রকম একটা বিদ্রোহ। এতে যোগ দিলে মুসলমানরাই পস্তাবে।

আমার অপর এক মুসলমান বন্ধু খাকসার। এমন ত্যাগবীর আমি দেখিনি। মন্বন্তরের সময় তিনি যা করতে চেয়েছিলেন তা করলে বহুলোক প্রাণে বাঁচত। স্বার্থপর মুসলমান মন্ত্রীরা তাঁকে তা করতে দেননি বলে তিনি পদত্যাগ করেন। আমাকে বলেন, "আমরা সবাই এই দুর্ভিক্ষের দায়ে দায়ী। কারো বিবেক নির্মল নয়। আপনারও

না।" আমি বলি, "আমি তো জজ। আমার কী দায়!" তিনি বললেন, "আপনি এই সরকারের কর্মচারী।"

আমার সেই গান্ধীভক্ত খদ্দরভক্ত অথচ খাকসার বন্ধুও আমাকে এর আগেই বলেছিলেন যে, "আপনি আশা করছেন আমরা ও আপনারা এক নেশন গঠন করব। তা হবে না।" পরে তিনি এক খাকসার পত্রিকা পাঠিয়ে দেন। দেখি তিনি পাকিস্তান চান।

অগাস্ট অভ্যুত্থান একটা প্যারাডক্স। পাকিস্তানকেও সে কয়েক কদম এগিয়ে আনে। গান্ধী কী করে জানবেন যে স্বাতন্ত্র্যকামী মুসলমানরা কংগ্রেসের ভয়েই পাকিস্তানী হবে।

॥ বিশ ॥

অগাস্ট অভ্যুত্থানের মূলে এই ভয়টাও একটা প্রেরণা ছিল যে ইংরেজরা আমাদের জাপানীদের হাতে ছেড়ে দিয়ে পালাবে, আমাদের প্রভুবদল ঘটবে। প্রভুবদলের ভয়েই আমরা সেদিন অমন মরীয়া হয়ে উঠেছিলুম। অহিংসার নিয়ম মানতে পারিনি। প্রভুবদলের আশঙ্কা না থাকলে সেই আমরাই অহিংসার দৃষ্টান্ত দেখাতুম।

তেমনি জীণা সাহেবের ও তাঁর অনুবর্তীদের প্রাণেও ছিল আরেক রকম প্রভুবদলের ভয়। ইংরেজ তাঁদের কংগ্রেসের হাতে ছেড়ে দিয়ে চলে যাবে আর কংগ্রেস তখন অহিংসার কথা ভুলে গিয়ে পুলিশ ও মিলিটারির সাহায্যে ব্রুট মেজরিটির শাসন চালাবে। হিন্দুদের বুটের তলায় পড়ে থাকবে আর সব সম্প্রদায়। মাইনরিটি কোনো-দিন গণতন্ত্রের পথ ধরে মেজরিটি হবে না। সুতরাং কংগ্রেস মেজরিটিই চিরন্তন হবে। সেটা হবে ব্রিটিশ রাজত্বের চেয়েও চিরস্থায়ী। ইংরেজরা বিদেশী লোক। তারা একদিন বিদায় নিতে পারে। কিন্তু হিন্দুরা তো যাবার মানুষ নয়, তাদের যাবার জায়গাও নেই। কাজেই তারা মুসলমানদের মাথায় চড়ে বসে থাকবে। সিন্দবাদ নাবিকের ঘাড়ে যেমন সেই বুড়ো।

এই ভয়টাকে জাগিয়ে দিয়েছিলেন কংগ্রেস নেতারাই, মায় গান্ধী। তারা খোলাখুলি বলে বেড়িয়েছিলেন যে ইংরেজের পরে কংগ্রেস। কংগ্রেসের হাতেই ইংরেজ ক্ষমতা হস্তান্তর করে যাবে। মুসলমানরা যদি ক্ষমতার অংশ চায় তো কংগ্রেসে যোগ দিক ও স্বাধীনতার জন্যে লড়ুক। মুসলমানদের জন্যে আবার আলাদা নির্বাচক মণ্ডলী

কেন ? তেমন মণ্ডলী যতদিন না রচিত হয়েছে ততদিন তাতে কংগ্রেসও প্রার্থী দেবে। মুসলিম প্রার্থী অবশ্য। কংগ্রেস মুসলিম প্রার্থীরা জয়ী হলে কংগ্রেস মন্ত্রীমণ্ডলীতে তাঁদের ভিতর থেকেই মুসলিম মন্ত্রী নেওয়া হবে। বাইরে থেকে যদি কাউকে নেওয়া হয় তো তিনি কংগ্রেস অঙ্গীকারনামায় সই করবেন। ইতিমধ্যে আটটা প্রদেশ কংগ্রেসের ছত্রতলে এসেছিল। এর পরের ধাপটা কেন্দ্রে কংগ্রেস মন্ত্রিত্ব। অন্তনিরপেক্ষ মেজরিটি যদি সে পায় তবে তাকে হটাবে কে ও কবে ?

পুরাতন শাসনসংস্কার আইন অনুসারে কেন্দ্রীয় আইনসভার জন্যে যে নির্বাচন হয়েছিল তাতে কংগ্রেস অন্তনিরপেক্ষ মেজরিটি পায়নি, কারণ মনোনীত সদস্য ও সরকারী সদস্যদের একটা ব্লক ছিল, সেটা কংগ্রেসের পথরোধ করেছিল। কোনো মতে সেটাকে সরাতে পারলে কংগ্রেসকে রোখে কে ? ব্রিটিশ সরকারের সঙ্গে একটা বোঝাপড়া হলে সে ব্লক আর কংগ্রেসবিরোধী হবে না। তখন কংগ্রেস নিজের খুশিমতো স্টীমরোলার চালাবে।

সেকথা ভাবতেই জীণা সাহেব চোখে সরষে ফুল দেখেন। ছিলেন তিনি কেন্দ্রীয় আইনসভার ইণ্ডিপেণ্ডেণ্ট পার্টির নেতা। তাঁর পার্টিতে ছিলেন কোয়াসজী জাহাঙ্গীর প্রমুখ পার্শী, হিন্দু, মুসলমান সভ্য। ওটা একটা নিরপেক্ষ অসাম্প্রদায়িক গোষ্ঠী। কখনো সরকারের পক্ষে ভোট দেয়, কখনো কংগ্রেসের পক্ষে। কারো কাছে কোনো অনুগ্রহ চায় না। জীণা সাহেব তেমন মানুষই নন। তাঁর নিজের যথেষ্ট আয় ছিল। তাঁর সঙ্গীরাও ধনিক। তা ছাড়া জীণা সাহেবের জীবনের রেকর্ড এমন যে সরকারী পদমর্যাদা বা উপাধির জন্যে কোনোদিন তিনি তাঁর স্বাধীনতা বিকিয়ে দেননি।

তিনি অসহযোগ আন্দোলনে যোগ দেননি তা ঠিক। তা বলে তিনি সহযোগীও ছিলেন না। উইলিংডন যখন বম্বের গভর্নর ছিলেন তখন জীণা তাঁকে অস্থির করে তুলেছিলেন। বম্বের কংগ্রেসকর্মীরা চাঁদা করে তাঁর নামে একটা হল প্রতিষ্ঠা করেন। যাঁর স্ত্রী পার্শী ও বন্ধুরা অধিকাংশ হিন্দু বা পার্শী, যিনি আহারে বিহারে সাহেব বিলিতী, তাঁকে মুসলমান বলতেই অনেকের আপত্তি ছিল। তাঁর স্ত্রীর নাম রত্তনপ্রিয়া, তাঁর নিজের নামের পদবী জীণা, যে নাম হিন্দুদেরই মনে হয়। গান্ধী নাকি প্রথম পরিচয়ে জানতেনই না যে জীণা একজন হিন্দু নন। পাকিস্তানের ভাবী প্রতিষ্ঠাতা ছিলেন একজন ইসমাইলিয়া খোজা। উত্তরাধিকার আইনে বলে, "The term 'Hindu' includes an Ismailia Khoja."

আইনসভায় যিনি ইণ্ডিপেণ্ডেণ্ট পার্টির নায়ক হিসাবে ভারতীয় স্বার্থ দেখতেন তিনিই আবার মুসলিম সাম্প্রদায়িক স্বার্থ দেখতেন মুসলিম লীগ নেতা হিসাবে। এই দ্বৈত

সত্তা তাঁর রাজনৈতিক জীবনের বিশেষত্ব ছিল প্রথমাবধি। গান্ধীযুগের পূর্বে তিনি ছিলেন একাধারে কংগ্রেস নেতা ও মুসলিম লীগ নায়ক। সেইজন্যে দুই প্রতিষ্ঠানের মাঝখানে সেতুবন্ধন করা তাঁর পক্ষে সহজ হয়। লখ্‌নউ চুক্তি তাঁর সেতুবন্ধনের নিদর্শন। সরোজিনী নাইডু তাঁকে হিন্দু মুসলিম একতার রাজদূত বলে অভিহিত করেছিলেন।

ঝীণা সাহেবের রাজনৈতিক জীবনের আদিতে তিনি কংগ্রেসম্যান, শুনেছি দাদাভাই নওরোজীর প্রভাবে। আইনসভায় নির্বাচণের সূত্রপাত হলে তিনি কেন্দ্রীয় আইনসভায় প্রবেশ করেন ও পাকিস্তানের প্রতিষ্ঠা পর্যন্ত থাকেন। দাঁড়াতে হতো তাঁকে স্বতন্ত্র নির্বাচন ক্ষেত্র থেকে। জিততে হতো কেবলমাত্র মুসলমানদের ভোটে। সাম্প্রদায়িক জনপ্রিয়তা ভিন্ন সেটা সম্ভব নয়। তা হলেও তিনি যেমন তাঁর সম্প্রদায়কে উপেক্ষা করতেন তেমন আর কেউ নয়। না পড়তেন নামাজ, না রাখতেন রোজা, না পরতেন মুসলমানী পোশাক, না জানতেন উর্দু, না ছাড়তেন মদ। চল্লিশ বছর বয়সে বিয়ে করে বসলেন রতনপ্রিয়া পেতিতকে। তাঁর কন্যার বয়সী। বিয়েটা ইসলামী মতে হয়েছিল, তা ছাড়া ইসলামের সঙ্গে আর কোনো সম্বন্ধ ছিল না। ভদ্রমহিলা সেকালের পক্ষে স্বাধীনা ছিলেন।

মুসলমান সমাজ তো চটলই, ওদিকে সরকারী মহলও যে খুব খুশি হলো তা নয়। একবার লর্ড চেমসফোর্ডের সকাশে সেই তেজস্বিনী মহিলাকে প্রেজেন্ট করা হলে তিনি রাজপ্রতিনিধিকে হাতজোড় করে নমস্কার করেন। তখনকার দিনে ওটা ছিল অকল্পনীয় এক স্পর্ধা। প্রায় বমশেল বললেও চলে। বড়লাট ছিলেন বাপের বয়সী, তাই ক্ষমা করলেন।

"মিসেস্ জিনা, যখন আপনি রোমে তখন রোমানদের মতো ব্যবহার করবেন।" চেমসফোর্ডের হিতোপদেশ।

"ইওর এক্সেলেন্সী, ওছাড়া আমি আর কী করেছি? যখন আমি ভারতে তখন আমি ভারতীয়দের মতোই নমস্কার করেছি।" রতনপ্রিয়ার প্রত্যুক্তি।

ঝীণা বা তাঁর পত্নী শাসককুলের কাছে মাথা নত করবার পাত্র বা পাত্রী ছিলেন না। তেমনি সমাজের কাছে সুলভ বাহবা কুড়োবার জন্যে খাটো হতেন না। ঝীণার উচ্চাভিলাষ বলতে ওই দুটোই ছিল: আইনসভায় গিয়ে ডিবেটে যোগ দেওয়া। আর কংগ্রেস লীগের মাঝখানে সেতুবন্ধন করা। ইংরেজরা তখন তাঁকে তাঁদের ডিভাইড অ্যাণ্ড রুল নীতিতে আকৃষ্ট করতে পারেননি। সে খেলায় তাঁর কোনো হাত ছিল না। বরং বলা যেতে পারে যে তাঁর কার্যকলাপ ছিল সে নীতির বিপরীত।

গান্ধীজীর অসহযোগ আন্দোলনের পর থেকে ঝীণাকে আর কংগ্রেসে দেখা গেল না। লীগেও যে দেখা গেল তা নয়। কিছুদিনের জন্যে তিনি অজ্ঞাতবাস করেন। নানা কারণে তাঁর পারিবারিক জীবনে অশান্তির ঝড় বয়ে যায়। রত্নপ্রিয়া একটি কন্যা সন্তান রেখে অকালে দেহত্যাগ করেন। ঝীণার সংসারজীবন তখন থেকেই চিরদুঃখের। ওই মেয়েটিকেও কি তিনি রাখতে পারলেন? ওর যখন বিয়ের বয়স হলো তখন ও চলল সাগরপারে এক পার্শী খ্রীষ্টান কুবেরনন্দনের বধূ হয়ে। পিতার অমতে।

সে ঘটনার কিছু আগেই কলকাতায় ঝীণা ও তাঁর দুহিতাকে আমি চাক্ষুষ করি। ফিরপো থেকে বেরিয়ে মোটরের প্রতীক্ষায় দাঁড়িয়েছিলেন ওঁরা। ওঁদের পেছনে একসার বোরা বা খোজা বণিক। বোধহয় লাঞ্চের নিমন্ত্রণ ছিল। আমি তখন দর্জির দোকানে ঢুকছি। সালটা ১৯৩৭। বাংলায় প্রাদেশিক মন্ত্রীমণ্ডলী গঠিত হয়েছে, কিন্তু যেসব প্রদেশে কংগ্রেস মেজরিটি সেসব প্রদেশে হয়নি।

ঝীণা প্রত্যাশা করেছিলেন যে নতুন ভারত শাসন আইন অনুসারে যেসব প্রাদেশিক মন্ত্রীমণ্ডল গঠিত হবে তাতে পুরাতন রীতি রক্ষিত হবে, গভর্নর উদ্যোগী হয়ে আপনার দায়িত্বে মন্ত্রী নির্বাচন করবেন ও মেজরিটি মাইনরিটি দুই সম্প্রদায়ের আস্থাভাজন দু'সেট লোক নেবেন। যেমন হতো মন্টেগু চেমসফোর্ড শাসন সংস্কার অনুসারে। একজন প্রধানমন্ত্রী হয়ে একজন অন্যান্য মন্ত্রী নির্বাচন করবেন ও তাঁদের মধ্যে মাইনরিটির আস্থাভাজন ব্যক্তিকে না নিয়ে অনাস্থাভাজন ব্যক্তিকেও নেবেন ঝীণা এতটা ভাবতে পারেননি। কিন্তু গান্ধী ভেবেছিলেন। গভর্নরকে প্রধানমন্ত্রীর উপর এই দায়িত্ব অর্পণ করতে হবে, নইলে তিনি প্রাদেশিক মন্ত্রীমণ্ডল গঠন করতে কংগ্রেসকে অনুমতি দিতেন না। ভেবে দেখার জন্য ছ'মাস দেরিও করিয়ে দেন তিনি।

ফলে দাঁড়ায় এই যে মন্ত্রীপদগুলো হয় কংগ্রেসের দান। কংগ্রেস দান করলেই লীগ পাবে। তার জন্যে কংগ্রেসের কাছেই হাত পাততে হবে, গভর্নরদের কাছে গিয়ে চাইলে মিলবে না। ঝীণার মতো মানী মুসলমান হিন্দুর কাছ থেকে দাক্ষিণ্য গ্রহণ করবেন? ইংরেজ তাঁকে এমন করে পথে বসাবে এটা কি হলো ইংরেজের মতো কাজ! কেন্দ্রীয় সরকারেও এই নতুন রীতি প্রসারিত হবে নাকি! সেখানেও কি কংগ্রেস দেবে, লীগ নেবে? সম্বন্ধটা হবে দাতা ও গ্রহীতার? যেটা এতদিন ছিল ইংরেজদের সঙ্গে ভারতীয়দের।

ঝীণা ইতিমধ্যে তাঁর ইণ্ডিপেণ্ডেন্ট পার্টি ভেঙে দিয়ে তার বদলে কেন্দ্রীয় আইনসভায় লীগ পার্লামেন্টারি পার্টি গড়েছিলেন ও তার চেয়ারম্যান হয়েছিলেন। মূল মুসলীম লীগের সভাপতিত্বও তাঁর করতলগত হয়। তিনিই হয়ে দাঁড়ান স্থায়ী সভাপতি।

তাঁর যৌবনের মুসলিম লীগের সঙ্গে বার্ধক্যের মুসলিম লীগের পার্থক্য ছিল। সে মুসলিম লীগ কল্পনা করতে পারেননি যে ক্ষমতা একদিন ভারতীয়দের হাতে আসবে ও কংগ্রেসের হাতে পড়বে। যদি করত তবে লখনউ চুক্তিতে তার জন্যে ব্যবস্থা থাকত। লখনউ চুক্তির মতো আর একটা চুক্তি ছিল জীণার ধ্যান। কিন্তু এ কংগ্রেস সে কংগ্রেস নয়। এ কংগ্রেস সংগ্রামী কংগ্রেস, যে সংগ্রাম করবে না তার সঙ্গে চুক্তিতে আবদ্ধ হবে না।

তা ছাড়া কংগ্রেস তো জানিয়ে দিয়েছে যে দেশে দুটিমাত্র পক্ষ আছে, ইংরেজ আর কংগ্রেস। মুসলমানদের কংগ্রেসেই যোগ দিতে হবে। ওদের যা পাবার ওরা পাবে কংগ্রেসের ভিতর থেকে ও তার সভ্য হিসাবে। আর নয়তো ইংরেজদের কাছ থেকে ওদের বাহনহিসাবে। শুধুমাত্র মুসলমানদের নিয়ে একটা তৃতীয়পক্ষ কংগ্রেস স্বীকার করে না, করে ইংরেজ। জীণা সাহেব মনের জ্বালা এইখানে।

তারপর তিনি ভুলে যান যে তিনি যখন লখ্‌নউ চুক্তির ঘটকালী করেছিলেন তখন তিনি ছিলেন কংগ্রেস ও লীগ উভয় দলের আস্থাভাজন নেতা, শুধু মুসলিম লীগের নন। সেসময় তাঁকে জিজ্ঞাসা করা হয়, তিনি মুসলমান হয়ে কংগ্রেসে আছেন কী করে, ওরা না হিন্দু? তিনি উত্তর দেন, কংগ্রেসে আছি ভারতীয়দের সাধারণ স্বার্থের খাতিরে আর লীগে রয়েছি মুসলমানদের বিশেষ স্বার্থের খাতিরে। তখনকার দিনে ভারতীয়দের সাধারণ স্বার্থ ও মুসলমানদের বিশেষ স্বার্থ পরস্পরবিরোধী বলে বিবেচিত হতো না। তাই জীণা, ফজলুল হক, মজহরুল হক, এমন কি আবুল কালাম আজাদ পর্যন্ত দুই প্রতিষ্ঠানে ছিলেন। যতদূর জানি। তখনো কংগ্রেস একটা পার্টিতে পরিণত হয়নি। লীগও না। পার্টির ধারণা আসে স্বরাজ পার্টি সংগঠনের সময়। জীণা তারপরে ইণ্ডিপেণ্ডেন্ট পার্টি গড়েন। ভারতীয়দের সাধারণ স্বার্থের খাতিরেই ইণ্ডিপেণ্ডেন্ট পার্টিতে থাকেন। তাঁর কাছে ওই হয় কংগ্রেসের বিকল্প।

তখনো ক্ষমতার রাজনীতি ভূমিষ্ঠ হয়নি। মন্ত্রিত্ব গ্রহণ করা স্বরাজ পার্টিরও অভিষ্ট ছিল না। ইণ্ডিপেণ্ডেন্ট পার্টির তো নয়ই। ত্রিশের দশকে যখন ক্ষমতার রাজনীতি এসে কাড়াকাড়ি বাধিয়ে দেয় তখন অনেকগুলি পার্টি গজিয়ে ওঠে। কৃষক প্রজা পার্টি, ইউনিয়নিস্ট পার্টি প্রভৃতি নির্বাচনে নামে। যেখানে যেখানে পারে মন্ত্রিত্ব করে। তখন এমন কোনো নিষেধাজ্ঞা ছিল না যে কংগ্রেসপন্থী মুসলমানরা কংগ্রেস টিকিটে মুসলিম নির্বাচন কেন্দ্রে দাঁড়াতে পারবে না। তাই উত্তরপশ্চিম সীমান্ত প্রদেশ যদিও বলতে গেলে হিন্দুশূন্য তবু সেখানেও কংগ্রেসপন্থী মুসলমানরা আধিপত্য করেন। কংগ্রেস আর হিন্দু যে সমার্থক নয় সেটার দৃষ্টান্ত উত্তরপশ্চিম সীমান্ত প্রদেশ।

ইংরেজদের তো একটা ক্ষতিই আছে, তাঁরা যা দেখতে চান না তা দেখেন না। নেলসন তাঁর কানা চোখে দূরবীন দিয়ে কোপেনহাগেন বন্দরের দিকে তাকিয়ে ডেনমার্কের শ্বেত পতাকা দেখতে পান না, সমানে গোলা চালিয়ে যান। তেমনি এ-দেশের ইংরেজরাও মেনে নিতে পারেন না যে কংগ্রেস বলতে মুসলমানও বোঝায়। কিন্তু সবাইকে অবাক করে দেন জীণা সাহেব যখন তাঁর থীসিস হয় মুসলিম লীগই মুসলমান-দের একমাত্র প্রতিনিধিত্বমূলক প্রতিষ্ঠান। তার মানে দাঁড়ায় কংগ্রেস কেবল হিন্দুদের প্রতিনিধিত্ব করতে পারে। তাই যদি হতো তবে খোদ জীণা সাহেব ওর মেম্বর ছিলেন কী করে, দুই প্রতিষ্ঠানের মাঝখানে সেতুবন্ধন করেছিলেন কী সূত্রে! ইতিহাসকে এক-কথায় উড়িয়ে দেওয়া যায় না। কংগ্রেসের নতুন নীতি বা নতুন নেতৃত্ব তাঁর মনঃপূত হয়নি বলেই কি উক্ত প্রতিষ্ঠান ষোল আনা হিন্দু বনে গেল? আর লীগই বা মুসলমান-দের ষোল আনার হয় কী করে? যখন ইউনিয়নিস্টরা পাঞ্জাব চালাচ্ছে আর কৃষক প্রজারা বাংলায় মুসলিম লীগকে প্রধান মন্ত্রিত্ব থেকে বঞ্চিত করেছে?

নেলসনের মতো জীণা সাহেবেরও ছিল দূরবীন নয়, মনোকল চশমা। সেটা এক-চোখে পরতেন। তাই তিনি সেই এক চোখেই দেখলেন যে, মুসলিম লীগ ষোল আনা মুসলমানের একমাত্র প্রতিনিধিত্বমূলক প্রতিষ্ঠান। আসলে এর পেছনে কূটনীতি ছিল। একবার যদি কংগ্রেসকে দিয়ে এটা মানিয়ে নেওয়া যায় তবে একধার থেকে যেখানে যত কংগ্রেসপন্থী মুসলমান মন্ত্রী আছেন সবাই পদত্যাগ করতে বাধ্য হন। তেমনি একবার যদি ব্রিটিশ কর্তাদের দিয়ে এটা মানিয়ে নেওয়া যায় তবে যেখানে যত কংগ্রেসপন্থী মুসলিম মন্ত্রী আছেন সবাই পদচ্যুত হন। তখন তাঁদের পরিবর্তে মন্ত্রিত্ব করেন লীগ মনোনীত ব্যক্তিরা।

লীগ মন্ত্রীরা কংগ্রেস মন্ত্রীমণ্ডলে যোগ দিলে ওর নাম আর কংগ্রেস মন্ত্রীমণ্ডল থাকে না। প্রধানমন্ত্রী বেচারারও ক্ষমতা যায়, তিনি হন শুধু কংগ্রেসের বা হিন্দুদের মন্ত্রী-প্রধান। অন্ত যে কোনো মন্ত্রী তাঁর সঙ্গে সমান। ইংলণ্ডের প্রাইম মিনিস্টার সীস্টেম সবে ভারতে প্রবর্তিত হয়েছে। সেটা এককথায় খারিজ হয়। তেমনি মন্ত্রীমণ্ডলের সমবেত দায়িত্ব নামক তত্ত্বকেও অঙ্কুরেই বিনাশ করা হয়। ক্যাবিনেট সীস্টেম বলে কিছু গড়ে ওঠে না। জীণা সাহেবের পাহচর্য এতই মূল্যবান যে তার দ.ড ব্রিটিশ পার্লামেন্টারি ডেমক্রাসীর দুটি কীর্তিস্তম্ভ—প্রধানমন্ত্রী ও যৌথ দায়িত্ব—বিসর্জন দিতে হয়।

জীণা সাহেব বলতে আরম্ভ করেন, পার্লামেন্টারি ডেমক্রাসী ভারতের অঙ্গে নয়। অধিকন্ত ইংরেজদের মতো কথা। তা যদি সত্য হয় তবে তাঁর নিজের জীবনটাই বৃথা

গেছে। কারণ তিনিই আমাদের সব চেয়ে অক্লিষ্ট পার্লামেন্টারিয়ান। নিরুদ্বেগ আইনসভার গোড়া থেকেই তিনি রয়েছেন ও শেষপর্যন্ত আছেন, মালবীয়জীর বেলাও বা খাটে না। ওটা সত্য হলে বাংলাদেশে নাজিমউদ্দিন সাহেবেরও স্থান হয় না। পার্লামেন্টারি ডেমোক্রাসী না থাকলে তিনিও থাকেন না। তারপর জীণা সাহেব মেজরিটির উপর মাইনরিটির ভীটো দাবী করে বসেন। সেটা কংগ্রেস প্রদেশগুলিতে মুসলমানদের দেওয়া হলে বাংলায় পাঞ্জাবে হিন্দু শিখদেরও দিতে হয়। এর পরে তিনি কেন্দ্রীয় আইনসভায় মুসলমানদের জন্যে একতৃতীয়াংশ ওয়েটেজের প্রস্তাবও তোলেন। কেই বা তাতে রাজী হচ্ছে? ম্যাকডোনাল্ডের সাম্প্রদায়িক রোয়েদাদের ঠেলাতেই মানুষ অস্থির।

প্রাদেশিক মন্ত্রীমণ্ডলগুলোতে কোয়ালিশনের বাসনা তাঁর ছিল, সেইজন্যে তিনি কোনো চরম পদক্ষেপ নেননি। কিন্তু যেই সেগুলি যুদ্ধের ইস্যুতে পদত্যাগ করে চলে গেল অমনি তিনি বুঝতে পারলেন যে ওদের পদত্যাগের উদ্দেশ্য ইংরেজের উপর চাপ দিয়ে কেন্দ্রীয় গভর্নমেণ্ট গঠন করা। সেটাও হতো একটা কংগ্রেস গভর্নমেণ্ট। অন্তত কংগ্রেস প্রভাবিত গভর্নমেণ্ট। সেখানেও সেই মেজরিটি রুল। মাইনরিটির প্রতিনিধিরা যাবেন না, যাবেন মেজরিটির দ্বারা বাছাই করা 'তথাকথিত মুসলমান'। জীণা সাহেব হিন্দু রাজত্বের ভয়ে ঝাঁপ দিয়ে বলেন, মা ধরণী, দ্বিধা হও। ভারতবর্ষ, দ্বিধাবিভক্ত হও।

॥ একুশ ॥

ভারতকে দ্বিধাবিভক্ত করতে হবে, মুসলিম লীগের এই প্রস্তাব থাকলার বাদে আর কোনো মুসলিম দল সমর্থন করেননি। সে প্রস্তাবের গূঢ় উদ্দেশ্য ছিল এক ঢিলে দুই পাখী মারা। একটি তো কংগ্রেসের মিশ্র নেতৃত্ব, আরেকটি লীগ বহির্ভূত মুসলিম নেতৃত্ব। পাকিস্তানের ইস্যুতে নির্বাচনে নামলে কংগ্রেসপন্থী মুসলমানদের তো হারিয়ে দেওয়া যাবেই, কৃষকপ্রজা, ইউনিয়নিস্ট, আহ্‌রার প্রভৃতি মুসলিম দলগুলিকেও নিশ্চিহ্ন করা যাবে। তখন দুটিমাত্র একচেটে দল থাকবে, কংগ্রেস ও মুসলিম লীগ। হিন্দু নির্বাচকদের প্রতিনিধি কংগ্রেস, মুসলিম নির্বাচকদের প্রতিনিধি মুসলিম লীগ। একটির সর্বাধিনায়ক গান্ধী, অপরটির সর্বাধিনায়ক জীণা। দুই দলের দুই হাইকমাণ্ডও থাকবে। দুই পার্লামেন্টারি বোর্ড।

সত্যি সত্যি পার্টিশন হবে মুসলিম লীগ নেতারা কেউ অতদূর দেখতে পারেননি বা

চায়নি। তাঁরা শুধু চেয়েছিলেন যে মেজরিটি রাজত্ব চলবে না। মেজরিটি মাইনরিটি মিলে একপ্রকার দ্বৈরাজ্য স্থাপন করতে হবে, যাতে উভয়ের মর্যাদা ও ক্ষমতা সমান সমান। যেমন এক সিংহাসনে দুই রাজা। ব্রিটিশ রাজ্যের দুই উত্তরাধিকারী। কেউ বড়ো নয়, কেউ ছোট নয়। তোমার ভোটসংখ্যা বেশী বলে তোমার কথায় কাজ হবে, আমার কথায় হবে না, এমন নয়। তোমার যেমন মেজরিটি ভোট, আমার তেমনি মাইনরিটি ভীটো। মোটের উপর তোমাতে আমাতে প্যারিটি। বিরোধ বাধলে নিষ্পত্তি করবার জন্যেও মাথার উপরে একজন থাকবেন। তিনি ব্রিটিশ রাজপ্রতিনিধি।

তবে যদি এ ব্যবস্থা একেবারেই বিকল হয়, যদি ইংরেজরা সত্যি সত্যি অপসরণ করে তবে পার্টিশন ভিন্ন আর কোনো সমাধান মুসলিম লীগ গ্রাহ্য করবে না। আর মুসলিম লীগ গ্রাহ্য না করার অর্থ মুসলিম সম্প্রদায় গ্রাহ্য করবে না। মুসলিম সম্প্রদায় কেন বলা হবে? বলতে হবে মুসলিম নেশন। যার জন্যে চাই স্বতন্ত্র হোমল্যাণ্ড। যার একটা নিজস্ব রাষ্ট্র, নিজস্ব সৈন্যদল, নিজস্ব মিত্রগোষ্ঠী। হিন্দুরাও তেমনি হিন্দু নেশন, তাদের স্বতন্ত্র হোমল্যাণ্ড, নিজস্ব রাষ্ট্র, নিজস্ব সৈন্যদল, নিজস্ব মিত্রগোষ্ঠী। এই তো কেমন চমৎকার বন্দোবস্ত। দ্বিকেন্দ্রীকরণ।

এই পর্যন্ত পৌছতে ঝীণা সাহেবের বছর দশেক লেগেছিল। রোম যেমন একদিনে নির্মিত হয়নি তেমনি ঝীণা সাহেবও একদিনে দ্বৈরাজ্য থেকে দ্বিকেন্দ্রীকরণে উপনীত হননি। কংগ্রেস যখন প্রাদেশিক মন্ত্রিত্ব নেয় তখনো তিনি ছিলেন দ্বৈরাজ্যবাদী। যখন মন্ত্রিত্ব ছেড়ে দিয়ে যুদ্ধকালীন অসহযোগ ও সত্যাগ্রহের পন্থা ধরে তখন কেন্দ্রীয় সরকার কংগ্রেসের হাতে আসার আশঙ্কায় তিনি হন দ্বিকেন্দ্রীকরণবাদী।

গোল টেবিল বৈঠকের সময় গান্ধীজীর কথাবার্তা শুনে ঝীণা সাহেবের মনে ধাঁধা লাগে। তার কারণও ছিল। গান্ধী ইতিমধ্যে বহু মুসলমানকে কংগ্রেসে আনতে পেরেছেন, তাঁরা তাঁর নেতৃত্বে সংগ্রামও করেছেন, সংগ্রামের শেষে যখন সংগ্রামের ফল পরিবেশনের সময় আসবে তখন তাঁদের একভাগ না দিয়ে আর কোনো মুসলিম দলকে তো দিতে পারা যাবে না। তাই তিনি কোনরূপ কমিটমেন্ট করেন না। ঝীণা চোখে অন্ধকার দেখেন।

গোল টেবিলের পর ঝীণা বিলেতেই বসবাস করতে শুরু করেন। চারবছর বাদে লিয়াকৎ আলী খান্ তাকে ফিরিয়ে নিয়ে আসেন ও মুসলিম লীগের পুনর্গঠন হয়। সেই চারবছর ঝীণা যে কেবল প্রিভি কাউন্সিলে প্র্যাকটিস করেছিলেন তা নয়, ব্রিটিশ পার্লামেন্টের ও গভর্নমেন্টের মতিগতি অনুধাবন করেছিলেন। ব্রিটিশ পলিসি তিনি

যেমন বুঝতেন গান্ধীজীও তেমন নয়। আর ব্রিটিশ শাসনতান্ত্রিক নিয়মকানুন ও কনভেনশন ছিল তাঁর নখদর্পণে। যেটা গান্ধীর মতে পার্লামেন্টারি প্রথাবিরোধীর পক্ষে সম্ভব নয়।

ঝীণা কল্পনাও করতে পারেননি যে গান্ধী একদিন প্রাদেশিক মন্ত্রীমণ্ডল গঠনে সায় দেবেন ও সর্বপ্রকার পার্লামেন্টারি কনভেনশন উপেক্ষা করে পার্লামেন্টারি প্রোগ্রামকেও একটা সংগ্রামে পরিণত করবেন। ওটাও যেন ইংরেজে কংগ্রেসে যুদ্ধ। মাঝখান থেকে মুসলিম মাইনরিটির স্বার্থ অবহেলিত। তারা তো লড়াই করতে যায়নি, গেছে মন্ত্রিত্বের ভাগ নিতে, ক্ষমতার অংশীদার হতে। আর এটাও ওরা আশা করেছে যে ওদের যারা আস্থাভাজন তারাই হবে মন্ত্রী। হিন্দুদের যারা আস্থাভাজন তারা কেন হবে?

ঝীণা সাহেব বরাবরই বিশ্বাস করতেন যে ভারতের সাধারণ স্বার্থ যেমন সত্য মুসলমানদের বিশেষ স্বার্থও তেমনি সত্য। একটার কাছে আরেকটাকে বলি দিতে তিনি চাননি, চেয়েছেন সামঞ্জস্য। কিন্তু গোল টেবিলে গিয়ে দেখেন সাধারণ স্বার্থ ভিন্ন আর কোনো বিষয়ে গান্ধীর আগ্রহ নেই, আর সবই অপেক্ষা করতে পারে। আগে তো স্বাধীনতার সংগ্রাম সারা হোক। কিন্তু ঝীণার চিন্তাধারা সেরূপ নয়। স্বাধীনতার পূর্বেই মাইনরিটিদের অভয় দিতে হবে যে মেজরিটিই সর্বশক্তিমান হয়ে উঠবে না। এতগুলো মাইনরিটি যেদেশে আছে সেদেশে ঢালা গণতন্ত্র চলতে পারে না। বিশুদ্ধ মেজরিটি রুল সেদেশের জন্য নয়। স্বরাজের প্রশ্নের সঙ্গে জড়িত অনেকরকম চেক আর ব্যালান্স। স্বরাজ চাই বইকি, কিন্তু তার আগে স্থির হয়ে যাক চেক আর ব্যালান্স।

ভারতবর্ষ বিলেত নয় যে রক্ষণশীল ও শ্রমিকদলের মতো কংগ্রেস ও মুসলিম লীগ পালা করে গভর্নমেন্ট গঠন করবে ও দেশ শাসন করবে। এদেশের নির্বাচকমণ্ডলী এমনভাবে ভাগ করা হয়েছে যে কেন্দ্রীয় আইনসভায় ও ছয়টি প্রাদেশিক আইনসভায় মুসলিম লীগ কোনোদিনই মেজরিটি পাবে না, সুতরাং অন্যনিরপেক্ষভাবে সরকার গঠন করতে পারবে না। অপরপক্ষে কংগ্রেস চিরদিন মেজরিটি পাবে ও অন্যনিরপেক্ষভাবে সরকার গঠন করতে পারবে।

তা হলে মুসলিম লীগের দৌড় বাকী পাঁচটি প্রাদেশিক আইনসভা ও বাকী পাঁচটি প্রাদেশিক সরকার পর্যন্ত। এদের মধ্যে আসাম ঠিক মুসলিম মেজরিটি প্রদেশ নয়। কিন্তু ইউরোপীয় ও পার্বত্য প্রতিনিধিদের সঙ্গে জোট পাকানো যায়। আর উত্তরপশ্চিম সীমান্ত প্রদেশ যদিও কংগ্রেসের অনুগত তবু ইসলামের নামে আবেদন করলে পাকা ঘুঁটি কাঁচিয়ে দেওয়া যায়। মুসলিম লীগের প্রভাব পাঞ্জাবেও নেই, কিন্তু হতে কতক্ষণ, যদি পাকিস্তানের প্রলোভন সামনে তুলে ধরা হয়। আর বাংলাদেশে কোনো মতে

একবার কৃষকপ্রজাদের হাত করতে বা কাত করতে পারলেই হলো। বাকীটা ইউরোপীয় প্রতিনিধিদের সৌজন্য।

জীণা সাহেব মনে মনে ধরে নেন যে পরবর্তী নির্বাচনে কংগ্রেস আসাম ও উত্তর-পশ্চিম সীমান্তপ্রদেশ থেকে হটে যাবে, ইউনিয়নিস্টরা পাঞ্জাব থেকে। সিন্ধু নিয়ে কোনো ঝামেলা নেই। সিন্ধু তাঁর ভাগে। বাংলা নিয়েই ভাবনা। ফজলুল হক অতি প্রবল প্রতিদ্বন্দ্বী। তিনি যাতে লীগে ফিরে আসেন সেই চেষ্টা হবে। তা হলে আর বাংলা নিয়ে ভাবনা থাকবে না।

এমনি করে পাঁচটি প্রদেশে সরকার গঠন করতে পারলে মুসলিম লীগ কংগ্রেসের প্রায় সমকক্ষ হবে। কংগ্রেসের ছয়, লীগের পাঁচ। এমন কী তফাৎ! এরই জোরে লীগ কি দাবী করতে পারে না যে কেন্দ্রীয় সরকারে কংগ্রেস ছ'টা আসন পেলে লীগ পাঁচটা আসন পাবে? ছ'জন মন্ত্রী তো আর পাঁচজন মন্ত্রীকে কথায় কথায় পরাস্ত করতে পারেন না। তেমন যদি করেন তবে বড়লাট হস্তক্ষেপ করবেন। নয়তো লীগ দাবী করবে পার্টিশন।

কিন্তু এটা একটা চরম দাবী। জীণা সাহেব জানতেন যে পার্টিশন মানেই মুসলিম লীগের নিজের পার্টিশন, মুসলিম সম্প্রদায়ের নিজের পার্টিশন। লীগ রাজী হবে কেন? সম্প্রদায় সম্মত হবে কেন? কতক লোকের লাভ হবে ঠিক, কিন্তু কতক লোকের লোকসানও তো হবে। কেমন করে তিনি বলবেন যে পাকিস্তানই মুসলমানমাত্রের কাম্য, মুসলমান মাত্রের বাসভূমি?

কাজেই দ্বিধা তাঁর আপনার অন্তরেই ছিল। লীগের ১৯৪০ সালের প্রস্তাবেও পাকিস্তান শব্দটা ব্যবহার করা হয়নি। তার জায়গায় ছিল 'Independent States'—একটা নয়, একাধিক। মুসলিম লীগ সদস্যদের ও সমর্থকদের সকলের আশঙ্কা ছিল কেন্দ্রটা হিন্দুরা একচেটে করবে। তাই তারা যা চেয়েছিলেন তা একটিমাত্র কেন্দ্রে নয়, উত্তরপশ্চিম ও পূর্বে মুসলমান প্রধান দুই স্বতন্ত্র ও স্বাধীন রাষ্ট্র।

আঠারো দিন ধরে গান্ধী জীণা সংবাদ চলে। গান্ধীই বার বার জীণার বাড়ী যান। জীণা একবারও আসেন না। পরিশেষে কথাবার্তা ভেস্তে যায়। এটা ১৯৪৪ সালের ঘটনা।

হিন্দু আর মুসলমান এক নেশন না দুই নেশন এ নিয়ে বিস্তর কথাকাটাকাটি চিঠি চালাচালি হয়। কিন্তু কাজের কথা অতি সামান্য। যেটা হলে পার্টিশন নিবারিত হতো সেদিক দিয়ে গান্ধীজী যান না, সেটা হলো কংগ্রেস লীগ পার্টনারশিপ। অর্থাৎ কেন্দ্রে ও প্রত্যেকটি প্রদেশে কংগ্রেস লীগ কোয়ালিশন গভর্নমেন্ট। পার্টনারশিপের বিকল্প যে পার্টিশন এটা কে না জানে? পার্টনারশিপও নয়, পার্টিশনও নয়, এমন কোনো বিকল্প ব্যবস্থা যদি থাকে তবে তার নাম রোটেশন। অর্থাৎ পাঁচবছর কংগ্রেস রাজত্ব

করবে, পাঁচবছর লীগ রাজত্ব করবে। চক্রবৎ পরিবর্তিত হবে দেশের কেন্দ্রীয় ও প্রাদেশিক সরকার।

তা নয়, গান্ধীজী ঘুরিয়ে ফিরিয়ে বিকেন্দ্রীকরণের পরিকল্পনা পেশ করেন। ক্রিপ্‌স্‌ প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করার পর আবার ওই প্রস্তাবের একটি সূত্র উত্থাপন করেন তিনি। বেলুচিস্থান, উত্তরপশ্চিম সীমান্ত প্রদেশ, সিন্ধু এই তিনটি মুসলিম প্রধান প্রদেশ আর বাংলা, আসাম, পাঞ্জাব এই তিনটি প্রদেশের মুসলিমপ্রধান অঞ্চলকে আত্মনিয়ন্ত্রণের অধিকার দিতে পারা যায়, তারা ভোট দিয়ে বলবে ভারতীয় যুক্তরাষ্ট্রের ভিতর থাকবে না বাইরে যাবে। যদি তারা বাইরে যেতে চায় তবে ভারতের স্বাধীনতার পর যত তাড়াতাড়ি সম্ভব তত তাড়াতাড়ি তাদের নিয়ে একটি স্বতন্ত্র রাষ্ট্র গঠন করা যেতে পারে। তারপর দুই রাষ্ট্রই একটি যৌথ অথরিটির উপর অর্পণ করবে পররাষ্ট্রনীতি, দেশরক্ষা, রেলওয়ে, টেলিগ্রাফ, কাস্টমস ইত্যাদি বিভাগের ভার।

মোট কথা কংগ্রেস ও লীগ দুই স্বতন্ত্র রাষ্ট্রের শাসক হলেও তাদের মাথার উপরে থাকবে একটি সাধারণ অথরিটি, যার হাতে সত্যিকার ক্ষমতা। সেটাতেও কি মেজরিটি মাইনরিটির প্রশ্ন থাকবে না? প্রত্যেকটি নিযুক্তি ও পদোন্নতি নিয়ে মতভেদ হবে না? হলে কার কথা খাটবে? কংগ্রেসের না লীগের? গান্ধীজী কি ভেবেছিলেন পররাষ্ট্রনীতি বা দেশরক্ষার মতো বিষয়ে কংগ্রেস ও লীগ একমত হবেই? লীগের পলিসি বরাবরই ইংরেজ ঘেঁষা। ইংরেজের সঙ্গে ওদের একটা প্রচ্ছন্ন ডোর ছিল। সেটা কি ওরা কংগ্রেসের জন্যে ছেদ করত? ঝীণা নারাজ হন। তিনি এর মধ্যে কংগ্রেস প্রাধান্যের গন্ধ পান। ইংরেজকে ছেড়ে উনি কংগ্রেসকে উপরওয়ালা করবেন না। তা ছাড়া পদ্ধতিগত বিষয়েও গান্ধীর সঙ্গে তাঁর অমিল। গান্ধী চেয়েছিলেন ব্রিটিশ বিদায়ের পর ওসব হবে। ঝীণা চাইলেন ব্রিটিশ থাকতেই। গান্ধীর মতে ওটা 'সেসেসন,' ঝীণার মতে 'পার্টিশন'। ঝীণা এমন কথাও বলেন যে শুধুমাত্র মুসলমানদের ভোটেই হিন্দু মুসলমান উভয়ের অধিকৃত অঞ্চল পাকিস্তানে চলে যাবে।

গান্ধী জানতেন যে তাঁর দিকে বিস্তর মুসলমান আছেন, কিন্তু যেটা জানতেন না সেটা এই যে আগস্ট অভ্যুত্থানে যোগ দিয়েছিলেন খুব কম মুসলমান। তাঁদের অনেকেই গান্ধীর শিবির থেকে ঝীণার শিবিরে যান কিংবা নিরপেক্ষ থাকেন। আর যাঁরা আগে থেকে নিরপেক্ষ ছিলেন তাঁরা ঝীণার শিবিরে যোগ দেন। বাংলাদেশের মুসলিম লীগ চাষী ও খাতকদের সুবিধার জন্যে কয়েকটি আইন পাশ করিয়ে নেয়। চাষী ও খাতকরা বেশীর ভাগ ক্ষেত্রে মুসলমান। তাদের শ্রেণীস্বার্থের কাছে আবেদন করে মুসলিম লীগ তাদের কাছে পায় সাম্প্রদায়িক স্বার্থের সমর্থন। শ্রেণীস্বার্থ ও সাম্প্রদায়িক স্বার্থ একাকার

ঘুঁয়ে যায়। অপরপক্ষে আটটি প্রদেশের কংগ্রেস গভর্নমেন্ট যদি পদত্যাগ না করে চাষী ও খাতকদের সুবিধের জন্যে কয়েকটি আইন পাশ করিয়ে নিত তা হলে তাদের মধ্যে যারা মুসলমান তারা সম্ভবত কংগ্রেসকেই ভোট দিত। কংগ্রেসের মন্ত্রিত্বত্যাগ এদিক থেকে কতকটা আত্মঘাতী হয়েছিল।

ঝীণা তাঁর লক্ষ্য স্থির করার পর লক্ষ্যে স্থির ছিলেন। গান্ধী ঝীণা সাক্ষাৎকার ব্যর্থ হলো বলে ঝীণার ক্ষতি হলো না। একই কালে তিনি মুসলিম জনগণের আস্থাভাজন হন, আর ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদীদের নির্ভরযোগ্য। কী করে যে তিনি শ্যাম আর কুল দুই রাখতে পারলেন এটা একটা রহস্য। মুসলিম জনগণ কি ভারতীয় নয়? ভারতীয় জনগণ যদি ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদীদের বিপরীত মেরু হয়ে থাকে তবে মুসলিম জনগণ কী করে অন্যরূপ হয়?

ঝীণা এককালে ভারতীয় জাতীয়তাবাদ ও মুসলীম স্বাতন্ত্র্যবাদের মাঝখানে সেতুবন্ধন করেছিলেন। এখন করলেন মুসলিম স্বাতন্ত্র্যবাদ ও ব্রিটিশ সাম্রজ্যবাদের মাঝখানে সেতুবন্ধন। এর ফলে আবার জাতীয়তাবাদীদের সঙ্গে স্বাতন্ত্র্যবাদীদের পোলারাইজেশন হয়ে গেল। হিন্দু মুসলমানে এমন মনোমালিন্য আমরা কস্মিন্‌কালে প্রত্যক্ষ করিনি। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের গোড়ার দিকে যা ছিল না শেষের দিকে তাই কেমন করে সম্ভব হলো। স্বাধীনতা পেলে হিন্দু মুসলমান এক রাজত্বে বাস করবে না। এই যে 'না' এটাকে দৃঢ় করার জন্যে এলো দুই নেশন থিয়োরি। এত বড়ো মিথ্যাও মানুষ মুখে আনে! আনবার সাহস রাখে!

তবে এটাও ঠিক যে মুসলমানরা কখনো হিন্দুর অধীনে বাস করেনি, করেছে ইংরেজের অধীনে। কংগ্রেসের আমলে বাস করা তাদের বিচারে হিন্দু মেজরিটির শাসনে বাস করা। গত শতাব্দীতে উত্তরপশ্চিম সীমান্তের এক বিশিষ্ট মুসলমান কংগ্রেসের প্রতি অবজ্ঞার সঙ্গে বলেছিলেন, "কী! আমরা হব কিনা আমাদের গোলামদের গোলাম!" তা বটে! মুসলমানরা যে বাদশার জাত। ইংরেজদের সঙ্গেই বরং ওদের মিল বেশী। কারণ ইংরেজরাও রাজার জাত।

গোল টেবিল বৈঠকের সময়ও মুসলিম নেতারা ন্যাশনাল মাইনরিটি বলে গণ্য হতে সম্মত ছিলেন। পরে একটু একটু করে তাঁদের মন বদলায়। তাঁরা আর সে মর্যাদায় পরিতুষ্ট হন না। তাঁরাও হতে চান কেন্দ্রস্থলে মেজরটি। অতএব স্বতন্ত্র এক নেশন। তাঁদের হোমল্যাণ্ড সর্বভারত নয়। ভারতের মুসলিমপ্রধান অংশ, তার সঙ্গে আসাম। এই চিন্তাপরিবর্তন ত্রিশের দশকে ঘটে। তখনো ঝীণা ততদূর যাননি। তাঁর চিন্তা-পরিবর্তন লক্ষিত হয় চল্লিশের দশকে। তখন তিনিও আর মাইনরিটি মর্যাদায় তৃপ্ত থাকতে চান না।

গান্ধীজীর কাছে যেমন স্বরাজ মানে স্টেটাস, জীণা সাহেবের কাছেও তেমনি পাকিস্তান মানে স্টেটাস। স্টেটাসের প্রশ্নে মহাত্মা যেমন নাছোড়বান্দা, কায়দে আজমও তেমনি। লক্ষ্যপথে কংগ্রেসের অন্তরায় ব্রিটিশরাজ, লীগের অন্তরায় হিন্দু মেজরিটি। বিরোধটা ফাণ্ডামেন্টাল। এর কাটান ছিল না। বড়জোর এই পর্যন্ত হতো যে আগে ইংরেজরা ভারত ছাড়ত, তারপরে হিন্দু মুসলিম একমত না হলে কয়েকটি প্রদেশ বা অঞ্চল ভারত ছেড়ে যেত। তারপরে হয়তো কয়েকটা বিষয় উভয়পক্ষের ইচ্ছায় একসঙ্গে পরিচালিত হতো। একপ্রকার কনফেডারেশন প্রতিষ্ঠিত হতো।

কিন্তু সেইপর্যন্ত হতো বেশ কিছু মূল্যের বিনিময়ে। বিনামূল্যে নয়। গান্ধীজী যা দিতে চেয়েছিলেন তা জীণাসাহেবের গ্রহণযোগ্য হয়নি, কংগ্রেসেরও হতো কি ? কংগ্রেস একটি দুর্বল কেন্দ্র নিয়ে সন্তুষ্ট হতো না। বিকেন্দ্রীকরণ কংগ্রেস নীতি নয়।

বছর খানেক ঘুরতে না ঘুরতে দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ শেষ হয়ে যায় ও ব্রিটিশ কর্তারা তাঁদের প্রতিশ্রুতি মতো আবার কথাবার্তা শুরু করেন। সিমলায় বৈঠক বসে, নতুন বড়লাট ওয়েভেল এবার তাঁর প্রস্তাব উত্থাপন করেন। তিনি তাঁর শাসন পরিষদ রদবদল করবেন। জঙ্গীলাট ভিন্ন তাতে আর কোনো ইংরেজ থাকবেন না। বড়লাটের হস্তক্ষেপের অধিকার থাকবে, কিন্তু তিনি ভদ্রতা করে যথাসম্ভব বিরত থাকবেন। ভারতীয় সভ্যরা প্রায় সকল বিষয়েই কর্তৃত্ব করবেন।

ওয়েভেলের পরিকল্পনায় মুসলিমদের ও বর্ণহিন্দুদের আসনসংখ্যা ছিল সমান সমান। কংগ্রেসের আপত্তি ছিল, তবু সে তার আপত্তি খাটাতে গেল না। কিন্তু জীণাসাহেব জেদ ধরলেন যে মুসলমানদের তালিকা তাঁর কথামতো হবে। তাতে কংগ্রেসপন্থী মুসলিম থাকলে চলবে না। এমন কি ইউনিয়নিস্ট মুসলিমও অপাঙ্‌ক্তেয়। ঠিক এই জায়গায় বড়লাটের বাধে। সব চেয়ে রাজভক্ত মুসলমান হলেন পাঞ্জাবের হায়াৎ খান্ বংশ। সিকন্দর তখন নেই। তাঁর আত্মীয় খিজর হয়েছেন প্রধানমন্ত্রী। তখনকার দিনে মুখ্যমন্ত্রী কথাটা ছিল না। এখন জীণাকে খুশী করতে গিয়ে খিজরকে তো চটানো যায় না। তার চেয়ে সিমলা বৈঠক পণ্ড হোক। ওয়েভেল সাধারণ নির্বাচনের নির্দেশ দেন।

॥ বাইশ ॥

যারা একটানা সাড়ে পাঁচ শতাব্দী ধরে শাসকের জাত ছিল তারা পলাশীকে মনে করেছিল একটা সাময়িক বিপর্যয়। তাই এক শতাব্দীকাল কেঁদেছিল ও দিন গুণেছিল। ইংরেজী শেখেনি, ফিরিঙ্গীর চাকরি নেয়নি, উনবিংশ শতাব্দীকেই স্বীকার করেনি।

তারপরে সিপাহীবিদ্রোহে যোগ দিয়ে ভাবে এইবার চাকা ঘুরে যাবে। আবার মুঘল বাদশাহী। আরো সাড়ে পাঁচ শতক। কিন্তু ইংরেজরা অতি নিষ্ঠুরভাবে তাদের মোহ ভঙ্গ করে। লাল কেল্লার অনেকগুলি মহল কামানের গোলা দিয়ে উড়িয়ে দেয়। মুঘল বংশের উত্তরাধিকারীদের বধ করে। আর বাদশাহকে ভারতের বাইরে নির্বাসন দেয় রেঙ্গুনে। মুসলমানরা আর কখনো মাথা তুলতে পারবে না এই ছিল নতুন শাসকদের নীতি।

ইতিমধ্যে হিন্দুরা বাস্তববাদীর মতো ইংরেজী লেখাপড়া শিখেছে, চাকরি নিয়েছে, যুগের সঙ্গে পা মিলিয়েছে, অন্তত পঞ্চাশ বছর এগিয়ে রয়েছে। সিপাহী বিদ্রোহের পর মুসলমান সমাজের নেতারা দেখেন যে জীবনের ও জীবিকাব প্রত্যেকটি ক্ষেত্রে হিন্দুরা পেয়ে গেছে পঞ্চাশ বছরের স্টার্ট। প্রতিযোগিতায় ওদের সঙ্গে এঁটে ওঠা যাবে না। মুসলমানদের জন্যে বিশেষ ব্যবস্থা চাই। আর সেটা সম্ভব ইংরেজদের সঙ্গে যদি সদ্‌ভাব বজায় রাখা যায়। এই নতুন নীতির জনক সার সৈয়দ আহমদ মুসলমানদের উনবিংশ শতাব্দীতে উপনীত করেন। আলীগড় বিশ্ববিদ্যালয় এঁর অক্ষয় কীর্তি।

কংগ্রেসকে সার সৈয়দ সন্দেহের চোখে দেখতেন। কংগ্রেসই একদিন ইংরেজের উত্তরাধিকারী হবে। অপোজিশনই তো আখেরে গভর্নমেণ্ট হয়। তখন মুসলমানের কী দশা হবে? "ইংরেজ রাজত্ব যাক" বলে একশো বছর প্রার্থনা করার পর সার সৈয়দের মতো লোকের প্রার্থনা হলো "ইংরেজ রাজত্ব থাক।" ইংরেজকে তাড়াবার জন্যে যারা কোমর বেঁধেছিল তারাই কোমর বাঁধল তাকে রাখতে। পরের ধাপ মুসলিম লীগ গঠন। তারই একটু আগে বংলাদেশের পার্টিশান।

তখনকার দিনে বেঙ্গল বলতে যা বোঝাত তার মধ্যে পড়ত বিহার ওডিশা ও মাঝখানে কিছুকাল আসাম। সেই বেঙ্গল একান্ত অশাসনীয় হয়ে পড়ায় তার একাংশ নিয়ে নতুন একটা প্রদেশ গড়ার কথাবার্তা লর্ড কার্জনের পূর্বেও চলেছিল। নতুন প্রদেশটা হবে ওড়িশার কতক অংশ ও ছোটনাগপুরের কতক অংশ নিয়ে। ঝাড়খণ্ড কি

ওইরকম কিছু একটা নাম হবে তার। কার্জন একবার ময়মনসিং শহরে যান। সেখান থেকে ঘুরে এসে রিপোর্ট দেন যে পদ্মানদীই হচ্ছে স্বাভাবিক সীমান্তরেখা। তার দুদিকে দুই প্রদেশ হলে ভালো হয়। নতুন প্রদেশটার নাম হবে পূর্ববঙ্গ ও আসাম। খরচ বাঁচবে, কারণ আসাম তো আগে থেকে ছিলই।

নোয়াখালী প্রভৃতি জেলা সত্যি অশাসনীয় ছিল। লাটসাহেব তো দূরের কথা চুনোপুঁটিরাও ও অঞ্চলে পা দিতেন না। ঢাকা রাজধানী হলে পদার্পণ করতে বাধ্য। কার্জনের প্রস্তাবের উত্তর এলো সেক্রেটারি অভ স্টেট বুঝতে পারছেন না কেন খাড়খণ্ড না কী যেন ওর নাম পরিত্যক্ত হবে। যখন এতকাল ধরে ওই লাইনে কাজ করা হয়েছে ও এগিয়ে রয়েছে। তখন পূর্ববঙ্গ ও আসামের কেসটাকে জোরালো করার জন্যে কার্জন তাঁর ঝুলি থেকে বেড়াল বার করেন। ওটা হবে একটা মুসলিম মেজরিটি প্রদেশ। হলে বেশ হয়।

কেই বা জানত যে বাঙালীরা ইতিমধ্যে এক 'নেশন' হয়ে উঠেছে! কথাটা আমার নয়, পার্টিশন রদ করার জন্যে যে ইস্তাহার রচনা হয় তার রচয়িতাদের। শুরু হয় স্বদেশী আন্দোলন। বোমা ফাটে। রিভলভার ছোটে। সাহেব-মেম মারা যায়। তখন কাটা বাংলা আবার জোড়া লাগে, কিন্তু বিহার ওড়িশা আসাম আলাদা হয়ে যায়। ইতিমধ্যে ইংরেজরা তাঁদের পলিসি ঘুরিয়ে দেন। সাম্প্রদায়িক কারণে প্রদেশ ভাগ করা আর নয়, সাম্প্রদায়িক কারণে নির্বাচকমণ্ডলী ভাগ করাই সুবুদ্ধি। এতে মুসলমানকে শিখকে কোনো কোনো জাতের হিন্দুকে সন্তুষ্ট করা হয়, অথচ অন্যান্যদের অসন্তুষ্ট করা হয় না।

স্বতন্ত্র নির্বাচকমণ্ডলীর দাবী তোলা হয় নবপ্রতিষ্ঠিত মুসলিম লীগের তরফ থেকে। মহামান্য আগা খান্ নিবেদন করেন লর্ড মিন্টোকে ভবিষ্যতের নির্বাচনগুলিতে হিন্দুরা ভোট দেবে হিন্দু প্রতিনিধিদের, মুসলমানরা ভোট দেবে মুসলীম প্রতিনিধিদের। লর্ড মর্লি তখন সেক্রেটারি অভ স্টেট। বড়লাটের সুপারিশ তিনি অনিচ্ছাসত্ত্বেও মেনে নেন। উপর থেকে তাই মনে হয়। ভিতরের খবর শুনেছি উল্টো। অর্থাৎ কর্তারাই ওটা চেয়েছিলেন।

পার্লামেন্টারি ডেমক্রাসীর পত্তন হলো গোড়ায় গলদ নিয়ে। এ যেন জরাসন্ধের জন্ম। দুই আধখানা শিশু। একে পূর্ণাঙ্গ করার সাধনারই নাম ভারতীয় জাতীয়তার সাধনা, ভারতীয় গণতন্ত্রের সাধনা। কর্তারা যেন বিধান দেন কংগ্রেস হবে হিন্দুদের, লীগ হবে মুসলিমদের, আর উপর থেকে যখনি যা পাওয়া যাবে তার একভাগ পাবে হিন্দু, একভাগ পাবে মুসলমান। তারপর তাকে জুড়ে একাকার করলেই হবে জরাসন্ধের একতা।

তা সত্ত্বেও কংগ্রেসে সব সম্প্রদায়ের রাজনীতিক যোগ দেন, বেশীর ভাগই রাজভক্ত, কিন্তু চরমপন্থীরাও বাদ যান না। অপরপক্ষে লীগে যাঁরা থাকেন তাঁরা সবাই রাজভক্ত, তবে সেখানেও দুটি একটি স্বাধীনচেতার প্রবেশ ঘটে। যেমন জীণা সাহেবের। তিনি কংগ্রেসেও স্থান পান ও সামনের সারিতে আসন নেন। লাল, বাল, পালের মতো না হলেও জীণা ও মিসেস বেসাণ্ট ছিলেন তাঁদেরই কাছাকাছি। অবশেষে টিলকের সঙ্গে হাত মিলিয়ে লখ্‌নউ চুক্তির ঘটকালি করেন জীণা।

সে সময় তাঁর মনোভাব কেমন ছিল তার একটি নিদর্শন তাঁর এই উক্তি—

"The main principles on which the first all-India Muslim politcal organisation was based was the retention of the Muslim communal individuality strong and unimpaired in any constitutional readjustment that might be made in India in all the course of its political evolution. The creed has grown and broadened with the growth of political life and thought in the community. In its general outlook and ideal as regards the future the All-India Muslim League stands abreast of the Indian National Congress and is ready to participate in any patriotic efforts for the advancement of the country as a whole."

তখনকার দিনের আর কোন মুসলিম রাজনীতিক তাঁর চেয়ে দেশভক্ত ছিলেন না। তিনিই সেদিনকার বিচারে ন্যাশনালিস্ট মুসলিম। আলীগড়পন্থীদের থেকে ভিন্ন।

আরও একশ্রেণীর মুসলিম নেতা ছিলেন যারা আলীগড়ের পলিসিও মানতেন না, লীগের পলিসিও না। তাঁরা পার্লামেণ্টারি পলিটিকসে বিশ্বাস করতেন না, সরকারের কাছে চাকরিবাকরিও চাইতেন না। তাঁরা কাজ করতেন ইসলামের গৌরবের জন্যে। কী করে বিশ্বময় ইসলামের শক্তি বৃদ্ধি হয় এই ছিল তাঁদের ধ্যান। আর শক্তি বলতে রাজনৈতিক শক্তি সামরিক শক্তিও বুঝতেন। ভারতে তাঁদের যে স্থান সেটা ভারতীয় হিসাবে ততটা নয়, যতটা মুসলমান হিসাবে। যে মুসলমান সাড়ে পাঁচ শতাব্দী জুড়ে রাজত্ব করেছিল। আরো দীর্ঘকাল করত, যদি না ফিরিঙ্গীরা শত্রুতা করত। ফিরিঙ্গীদের এঁরা ক্ষমা করেননি। এখনো এঁদের আশা যে তুরস্কের অভ্যুদয়, ইরানের অভ্যুদয়, আফগানিস্থানের অভ্যুদয় ভারত থেকে ফিরিঙ্গীদের হটতে বাধ্য করবে।

হিন্দুদের সঙ্গে এঁদের সম্পর্ক ক্ষীণ। সাধারণ ভূমি তো কিছু নেই। এঁরা যেদিন রাজত্ব ফিরে পাবেন হিন্দুরা এঁদের রাজভক্ত প্রজা হবে। কংগ্রেস যে ইংরেজের

উত্তরাধিকারী হবে এটা এঁদের কাছে অবিশ্বাস্য। যদি হয় তবে ওই ইংরেজেরই বেনামদার হবে, গুরু যখন ইংরেজ। ইংরেজী শিক্ষায় এঁদের ঘোর বিরাগ ছিল। আলীগড় এঁদের চোখে ইংরেজীস্থান। মুসলিম রাজনীতিকদের এঁরা শ্রদ্ধা করতেন না। জীণা তো মুসলমানই নন। আগা খানই বা কিসের মুসলমান!

প্রথম মহাযুদ্ধের সময় রাজভক্ত মুসলমানরা তুরস্কের বিপক্ষে যান, কেউ কেউ অস্ত্র ধরেন। সেসময় বিশ্ব ইসলামীরা বিপাকে পড়ে যান। ইংরেজের বিরুদ্ধে মুখ খুলতে গিয়ে অনেকের জেল হয়। অনেকের নির্বাসন। অনেকে আবার দেশত্যাগ করেন। সাধারণ মুসলমান টুঁ শব্দটি করে না। এরা যে কত বিচ্ছিন্ন এঁরা সেই প্রথম উপলব্ধি করেন। সাধের তুরস্ককে পরাজয় থেকে রক্ষা করতে না পেরে রব তোলেন খলিফার অধীনেই ইসলামের ধর্মস্থান সংরক্ষণ করতে হবে। কিন্তু সংরক্ষণ করবে কে? কী দিয়ে সংরক্ষণ করবে। তার জন্যে অস্ত্র চাই। সেসব কোথায়? যেখানে হাতী ঘোড়া গেল তল, স্বয়ং তুরস্কই হেরে গেল, সেখানে খেলাফতীরা বলেন কত জল।

তাঁদের সেই দুঃসময়ে আসমান থেকে অবতীর্ণ হন গান্ধী। তাঁর হাতে সত্যাগ্রহ নামে নতুন এক অস্ত্র। খেলাফতীরাই তাঁকে ধরে নিয়ে গিয়ে তাঁদের নেতা করেন। অসহযোগ প্রথমে খেলাফতীদের জন্যে কল্পিত হয়। পরে কংগ্রেস ওটা গ্রহণ করেন। গান্ধীজী আগে খেলাফতীদের নায়ক, পরে কংগ্রেসীদের।

তাঁর নেতৃত্ব অবশ্য সত্যাগ্রহ দিয়ে শুরু। সেসময় সেটা কংগ্রেসের তরফ থেকে নয়। তখন তার জন্যে ছিল অন্য প্রতিষ্ঠান। সত্যাগ্রহ সভা।

দেখতে দেখতে কংগ্রেসটাই একটা সত্যাগ্রহ সভায় পরিণত হয়। তখন পূর্বতন নেতারা একে একে বিদায় নেন। জীণা তাঁদের একজন। মালবীয় আরেকজন। মিসেস বেসাণ্ট আরো একজন। এঁরা অসহযোগ, গণসত্যাগ্রহ ইত্যাদি সমর্থন করতেন না। বিশেষ্য পদের সামনে 'অহিংস' বলে একটি বিশেষণ পদ বসিয়ে দিলে কী হবে, সাধারণ লোক তার জন্যে প্রস্তুত নয়। আর ধর্মকে রাজনীতির ক্ষেত্রে টেনে আনা কেন? হিন্দুত্বই হোক আর ইসলামই হোক ও জিনিস আধুনিক যুগে আর কোনো দেশে রাজ-নীতির সঙ্গে মিশ খায় না। জনগণকে অবশ্য ও দিয়ে আকর্ষণ করা যায়। কিন্তু ফল যা হয় তাতে ধর্মেরও মহিমা বাড়ে না, রাজনীতিরও শিক্ষা হয় না।

এঁরা যে কারাভয়ে ভীত বলে চলে গেলেন সেটা ভুল। কিংবা আদালতের মায়া কাটাতে না পেরে। এঁরা আবহাওয়াটাই পছন্দ করলেন না বলে চলে গেলেন। কিন্তু চলে গিয়ে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়লেন। গান্ধীপন্থী কংগ্রেস এত বেশী শক্তিশালী ও জনপ্রিয় হয়ে ওঠে যে এঁদের বাদ দিয়েও তার বলহানি হয় না। বিকল্প যতগুলো দল সব নিষ্প্রভ

হয়ে যায়। জীণাসাহেব ছিলেন দুই নৌকার মাঝি। একটা নৌকার থেকে পা সরিয়ে নিয়ে আরেকটাতেও কি টিকতে পারলেন ?

সেকালে গান্ধীতে জীণাতে চমৎকার বন্ধুত্ব ছিল। জীণাই তো একদিন বারদোলীতে গিয়ে মহাত্মাকে সতর্ক করে দেন যে গণসত্যাগ্রহ দমন করার জন্যে সরকারপক্ষ সৈন্য আনিয়েছেন। তার চেয়ে বড়লাট লর্ড রেডিং-এর সঙ্গে সাক্ষাৎকার শ্রেয়। জীণাই ঘটকালি করবেন।

গণসত্যাগ্রহ বন্ধ হলো, মহাত্মার জেল হলো, খেলাফতীরা হতাশ হলেন, ধীরে ধীরে গান্ধী নেতৃত্ব থেকে সরে গেলেন। যে কয়জন মুসলমান কংগ্রেসে থেকে গেলেন তাঁদের মোহভঙ্গ হয় কামাল পাশার হাতে খলিফার হাল দেখে। তাঁরা বিশ্ব ইসলাম ছেড়ে ভারতীয় জাতীয়তাবাদে মনোনিবেশ করেন। সাম্রাজ্যবাদ একদিকে, ভারতীয় জাতীয়তাবাদ আর একদিকে। তাঁরা দুটোর থেকে একটাকে বেছে নেন। মৌলানা আবুল কালাম আজাদ গান্ধীজীর সঙ্গে এক ও অভিন্ন হয়ে যান। তেমনি খান্ আবদুল গফর খান্। তেমনি হাকিম আজমল খান্। তেমনি ডাক্তার আনসারী।

এখন এঁদের মতো সহকর্মীদের পথে বসিয়ে গান্ধীজী জীণার কথায় কাজ করবেন এটা কী করে হয় ? এঁরাই তাঁর আপনার লোক। সুখে দুঃখে তাঁর সাথী। এঁদের সঙ্গে পরামর্শ না করে হিন্দু মুসলিম সমাস্যার মীমাংসা করা তাঁর রীতি নয়। ফলে জীণা নিরাশ হন। শেষের দিকে মহম্মদ আলী, শওকত আলী এঁরাও। মহাত্মা তাঁর এককালের সহযাত্রীদের সঙ্গে সদ্ভাব রেখেছিলেন, কিন্তু পরামর্শ যখন নিতেন তখন তাঁর সব চেয়ে একনিষ্ঠ মুসলমান বন্ধুদের। আজমল খাঁর, আনসারীর, আজাদের, আবদুল গফর খাঁর।

এর মধ্যে হিন্দুয়ানী কোথায় ? মহাত্মার এই সব বন্ধুরা কি হিন্দু ? এঁরা কি মুসলমান হিসাবে নিরেস ? এঁদের পরামর্শ কি ইসলামবিরোধী, মুসলিম স্বার্থবিরোধী ? কংগ্রেসে সব সময়েই একদল মুসলমান ছিলেন যাঁদের এক নম্বর শত্রু ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদ। তাকে আগে নিপাত করো, তারপরে উত্তরাধিকারের প্রশ্ন উঠবে। তার সঙ্গে শলা পরামর্শ করতে যেয়ো না। তার হাত যাতে শক্ত হয় তেমন কিছু কোরো না। মহাত্মাই এঁদের মনের মানুষ। হিন্দু বলে নয়। এক নম্বর সাম্রাজ্যবাদবিরোধী বলে।

তারপর এঁরা বিশ্বাস করতেন না যে হিন্দুরা মুসলমানদের শত্রু। পঞ্চাশ বছর স্টার্ট পেয়ে গেছে, তার জন্যে হিন্দুদের দোষ দিয়ে কী হবে ? দৌড়লে ওদের ধরে ফেলা যায়। তা ছাড়া চাকরিই মানুষের জীবনে মোক্ষ নয়। তাই যদি হতো এত ছেলে অসহযোগ করত কেন ? ঢের বড়ো বড়ো প্রশ্ন আছে যেখানে কেউ

হিন্দু নয়, কেউ মুসলমান নয়, সবাই ভারতীয়, বেশীর ভাগই দরিদ্র। সেইজন্যেই তো গান্ধীজীর গঠনের কাজ। পার্লামেন্টে যাওয়া তো নিপীড়িতদের স্বার্থে। পার্লামেন্ট থেকে চলে আসাও তেমনি বৃহত্তর স্বার্থে।

গান্ধীজী সব মুসলমানকে কংগ্রেসে যোগ দিতে ডেকেছিলেন। সব মুসলমান কংগ্রেসে যোগ দিলে তার দ্বারা প্রমাণ হতো যে ভারতীয়দের সকলের সাধারণ স্বার্থ এক। কিন্তু মুসলিম মাইনরিটির বিশেষ স্বার্থ তো ছিল। প্রতিযোগিতায় তারা হিন্দুদের সমকক্ষ নয়, বিশেষ ব্যবস্থা না করলে আপিসে আদালতে কাউন্সিলে ক্যাবিনেটে কোথাও যথেষ্ট সংখ্যায় প্রবেশ পেতো না। স্কুলকলেজেও তাদের সংখ্যা যথেষ্ট হতো না। এইসব কারণে বিশেষ স্বার্থ সম্বন্ধে সচেতন মুসলমান রাজনীতিকরা কংগ্রেসের বাইরেও একটা প্রতিষ্ঠান থাকা আবশ্যক বোধ করতেন। সেই আবশ্যকতা বোধ থেকেই লীগের উৎপত্তি। কিন্তু এটাও তাঁরা জানতেন যে তাঁদের বিশেষ স্বার্থ ভারতীয়দের সাধারণ স্বার্থের উপরে নয়। তাই কংগ্রেসেও তাঁদের কেউ কেউ যোগ দিয়েছিলেন। দুই নৌকায় পা দেওয়া বারণ ছিল না। পরে ওটা আপনা থেকে অপ্রচলিত হয়। কারণ বিশেষ স্বার্থের প্রতি কংগ্রেসের চেয়ে ব্রিটিশ সরকারই অনুকূল। কংগ্রেস তো স্বরাজের আগে কোনো কমিটমেন্টই করবে না।

অপরপক্ষে কংগ্রেসের বা গান্ধীজীর অভিজ্ঞতা হলো যখনি তাঁরা কিছু দিতে রাজী হয়েছেন ব্রিটিশ সরকার নীলাম দর চড়িয়ে দিয়েছেন। আগাম দিয়েছেন। আর মুসলমানরা ইংরেজের দান পকেটে পুরে কংগ্রেসের দিকে হাত বাড়িয়েছেন আরও বেশীর জন্যে। বেশীর ভাগই তো হিন্দুর যোগ্যতার পাওনা থেকে। এই পদ্ধতির মধ্যে কোনো চূড়ান্ততা নেই। মুসলমানরা বলছেন না যে এই তাঁদের শেষ দাবী। যখনি একটা দাবী মিটিয়ে দেওয়া হয় তখনি আর একটা হাজির হয়। কংগ্রেস যা দেয় ব্রিটিশ সরকার তার চেয়ে বেশী দেয় বা দেবার আশা দেয়।

ক্রমে উপলব্ধি হয় যে এ খেলা কংগ্রেসের বাইরে থেকেই ভালো চলে, ভিতর থেকে নয়। বিশেষ স্বার্থ সম্বন্ধে যাঁরা সচেতন তাঁরা কংগ্রেসের বাইরেই থাকবেন ও তাঁদের একটা হাত সব সময়েই ইংরেজের দিকে প্রসারিত থাকবে, আর একটা হাত কংগ্রেসের দিকে। কংগ্রেস সাধারণ স্বার্থের উপরে নিবদ্ধদৃষ্টি। লীগ বিশেষ স্বার্থের উপর নিবদ্ধদৃষ্টি। কেউ কারো দিকে তাকায় না। তাকাবার সময় বয়ে যায়। কংগ্রেস তার ভিতরকার মুসলমান সভ্যদের অগ্রস্থান দেয়, লীগ মুসলিমদের স্থান তার পরে। আর লীগ ব্রিটিশ কর্তৃপক্ষকেই অগ্রস্থান দেয়, কংগ্রেসকে তার পরে। এমনি করে উভয়ের মধ্যে সেতুবন্ধন অসম্ভব হয়। লীগের যে হাতটা কংগ্রেসের দিকে প্রসারিত ছিল সেটা সংগ্রামের জন্যে প্রস্তুত হয়।

লর্ড কার্জন যে ভাগ্যচক্র প্রবর্তন করেছিলেন সেটা চল্লিশ বছর পরে পূর্ণবৃত্ত হয়ে ঘুরে এলো। বেঙ্গল পার্টিশন, তার থেকে সেপারেট ইলেকটোরেট, তার থেকে ইণ্ডিয়া পার্টিশন, তথা বেঙ্গল পার্টিশন।

॥ তেইশ ॥

এক হাতে তালি বাজে না। একপক্ষ যদি অহিংস হয় অপরপক্ষ হিংসার দ্বন্দ্ব একা একা চালাতে পারে না। আপনা হতেই নিরস্ত হয়। তেমনি একপক্ষ যদি অসম্প্রদায়িক হয় তবে অপর পক্ষ অসাম্প্রদায়িকতার কুস্তি একা একা লড়তে পারে না। আপনা হতেই থামে।

কিন্তু একপক্ষ অহিংস ও অসাম্প্রদায়িক হলে তো? অগাস্ট অভ্যুত্থানের সময় থেকেই লক্ষ করি অহিংসার উপর থেকে লোকের বিশ্বাস চলে গেছে। যদিও গান্ধীর উপরে আছে। ওটাও একটা প্যারাডকস। তারপর আরো চমৎকৃত হই যখন শুনি সুভাষ-চন্দ্র নেতাজীরূপে সশস্ত্র সৈন্যদল নিয়ে ভারতের অভিমুখে অভিযান করেছেন। সরকারি কর্মচারীদের বাড়ীর মেয়েরাও গাইতে শুরু করেছেন "কদম কদম বড়ায়ে যা"। হিংসার তেমন মরসুম আমরা কল্পনাও করতে পারিনি। মহাত্মার অহিংসার শিক্ষা কারো মনে বসেনি।

তেমনি সাম্প্রদায়িকতার সঙ্গে মোকাবিলা করবার জন্যে দিকে দিকে মাথা তুলছে সাম্প্রদায়িকতা। ওই ১৯৪৪ সালেই আমি ছুটি নিয়ে বিহারে কিছুদিন থাকি। সেখানে শুনি একদিকে যেমন খাকসার অন্যদিকে তেমনি রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবকসঙ্ঘ সশস্ত্রভাবে সঙ্ঘবদ্ধ হচ্ছে। শস্ত্র অবশ্য তেমন কিছু নয় যাকে ইংরেজরা ভয় করে। তাই সরকার থেকে নিষেধ নেই। কিন্তু সাধারণ হিন্দু তো ভয় করে। সাধারণ মুসলমান তো ভয় করে। আমার বন্ধু একজন সরকারী অফিসার। তিনি তখনি আমাকে বলেন যে ইংরেজ চলে যাবার সময় সঙ্কট ঘনিয়ে আসবে।

এই হচ্ছে গান্ধী জীণা সংবাদের সমসাময়িক অবস্থা। জীণা কেমন করে বিশ্বাস করবেন যে হিন্দুরা অহিংস ও অসাম্প্রদায়িক থাকবে, তাদের ব্রুট মেজরিটি দিয়ে পার্লা-মেন্টের ভিতরের ও বাইরের মাইনরিটিকে দাবিয়ে রাখবে না? তিনি যদি তাঁর সম্প্রদায়ের ভবিষ্যৎ নিয়ে দুশ্চিন্তাগ্রস্ত হয়ে থাকেন সেটার জন্যে তাঁকে দোষ দেওয়া যায় কি?

স্বাধীন মানুষ যখন খুশি খেলার নিয়ম পালটে দিতে পারে। আজ তোমার খেলার

নিয়ম অহিংসা ও সত্যাগ্রহ। কাল যখন ইংরেজ থাকবে না, তার বেয়োনেট থাকবে না, তখন হয়তো তোমার খেলার নিয়ম হবে হিংসা ও হত্যাগ্রহ। আজ তোমার খেলার নিয়ম পার্লামেন্টারি গণতন্ত্র। কাল যখন ব্রিটিশ পার্লামেন্টের প্রভাব থাকবে না, অঙ্কুশ থাকবে না, তখন হয়তো তোমার খেলার নিয়ম হবে ডিকটেটরশিপ ও রণতন্ত্র। আজ তোমার খেলার নিয়ম জাতীয়তাবাদ ও সাম্প্রদায়িক মৈত্রী। কাল যখন আধুনিক যুগের থেকে দেশ কয়েকশতক পেছিয়ে যাবে তখন হয়তো তোমার খেলার নিয়ম হবে হিন্দুরাষ্ট্র ও মুসলিম দলন।

মেজরিটি যখন বৈদেশিক অঙ্কুশমুক্ত হবে তখন সে যে মাইনরিটির সঙ্গে কখন কী ব্যবহার করবে তা কেউ জোর করে বলতে পারে না। এমন কি সংবিধানে লিপিবদ্ধ সেফগার্ডও যথেষ্ট নয়। মেজরিটি ইচ্ছা করলে সংবিধান ছিঁড়ে ফেলতে পারে। নাঙ্গা তলোয়ার দিয়ে দেশ শাসন করতে পারে। তখন মাইনিরিটি পালাবার পথ পাবে না। পাকিস্তান হচ্ছে সেই পালাবার পথ। সেখানে পালাবার জন্যে সমুদ্র পার হতে হবে না, গিরিসঙ্কট পার হতে হবে না। একবার পা চালিয়ে দাও, তারপর পাকিস্তান।

এর অনুরূপ দাবী আয়ারল্যাণ্ডেও উঠেছিল। ঝীণাসাহেব তা জানতেন। আলস্টার কবুল না করে আইরিশ ন্যাশনালিস্টদের গতি ছিল না। কংগ্রেসকেও তেমনি পাকিস্তান কবুল করতে হবে। নইলে ব্রিটিশ পার্লামেণ্ট আইন পাশ করবে না। বেআইনী স্বাধীনতা নিয়ে কাজ করা কঠিন। আর্মির লয়্যালটি পাওয়া সহজ হবে না। অন্তত মুসলিম রেজিমেণ্টগুলির লয়্যালটি তো নয়ই। সৈন্যবলহীন স্বরাজ আকাশকুসুম।

এখন তাঁর প্রথম কাজ হচ্ছে সাধারণ নির্বাচনে মুসলিম নির্বাচনকেন্দ্রগুলিকে দিয়ে মুসলিম লীগের পাকিস্তান প্রস্তাব সমর্থন করিয়ে নেওয়া। মুসলিম নির্বাচনকেন্দ্রগুলি যদি একবাক্যে পাকিস্তানের দাবী সমর্থন করে তবে তো অর্ধেক লড়াই ফতে। বাকি অর্ধেক হবে হাটে বাটে মাঠে। এডওয়ার্ড টমসনকে ঝীণা তার আভাস দিয়েছিলেন অনেকদিন আগে। তখন কেউ সেটাকে সীরিয়াসভাবে নেয়নি। কিন্তু ক্রমেই আমার কাছে পরিষ্কার হচ্ছিল যে ইংরেজ থাকতে যদি মিটমাট না হয় তো পরে কুরুক্ষেত্র বাধবে।

শেষপর্যন্ত ওটা একটা উত্তরাধিকারের দ্বন্দ্ব। ব্রিটিশ রাজের উত্তরাধিকারী কে হবে? ষোল আনা ভারতীয় প্রজা? না বারো আনা হিন্দু প্রজা? ঝীণা সাহেবের মতে ষোল আনা ভারতীয় প্রজার কোনো প্রতিষ্ঠান নেই, যেটা তেমন দাবী করে সেটা প্রকৃতপক্ষে বারো আনা হিন্দুর প্রতিষ্ঠান। ষোল আনা ভারতীয় প্রজার কোনো যৌথ ইলেকটোরেট নেই, আছে মুসলিমদের স্বতন্ত্র ইলেকটোরেট, ফলে হিন্দুদেরও স্বতন্ত্র ইলে-

কর্টোরেট। আর্মিতেও স্বতন্ত্র মুসলিম রেজিমেণ্ট, শিখ রেজমেণ্ট, রাজপুত রেজিমেণ্ট। এই যে দেশের চেহারা সেখানে কনষ্টিটুয়েণ্ট আসেম্বলি ডেকে কী হবে? নিচের দিক থেকে সংবিধান তৈরি করতে চাইলে হবে কেন? মেজরিটি রুল অচল। এদেশে মেজরিটি বলতে পলিটিকাল মেজরিটি বোঝায় না, বোঝায় সাম্প্রদায়িক মেজরিটি। আইনসভায় কংগ্রেসের মেজরিটি কার্যত হিন্দু নির্বাচনকেন্দ্রের ভোটারদের কাছেই দায়ী। মুসলিম নির্বাচনকেন্দ্রের ভোটারদের কাছে দায়ী নয়। কংগ্রেসপন্থী মুসলিমরা ব্যতিক্রম।

কায়দে আজম সাধারণ নির্বাচনের উপর দৃষ্টি রেখে কাজ করছিলেন। সাধারণ নির্বাচনে মুসলিম নির্বাচকরা অধিকাংশ স্থলে তাঁর পার্টিকে ভোট দিয়ে জিতিয়ে দেয়। কিন্তু কার উপরে জিতিয়ে দেয়? হিন্দুদের উপরে নয়, শিখদের উপরে নয়, অন্যান্য মুসলিম পার্টিগুলির উপরে। এইসব পার্টির অপরাধ এরা পাকিস্তান চায় না। এদের পক্ষেও অনেক ভোট পড়েছিল, তবে অপেক্ষাকৃত কম। লীগ যদি শতকরা ৫১টা ভোট পায় তা হলে নির্বাচনে জয়ী হতে পারে, কিন্তু তার মানে এ নয় যে শতকরা ৪৯টা ভোট যারা পেলো তারা মুসলিন নয় বা তাদের মতের কোন দাম নেই। তা ছাড়া বহু মুসলিম ভোটার ছিল নিরপেক্ষ। বহু মুসলিম ভোটার না বুঝে ভোট দিয়েছিল। বহু মুসলমান ভোটাধিকার পায়নি। ভোটাধিকার প্রাপ্তবয়স্কমাত্রের অধিগত ছিল না। সব মুসলমান মুসলিম লীগের পেছনে ছিল এটা সম্পূর্ণ ভুল ধারণা। অনেকেই জানত না পাকিস্তান হলে তারা অবশিষ্ট ভারতে এলিয়েন হয়ে যাবে।

তা হলেও জীণাসাহেবের উদ্দেশ্য সিদ্ধ হলো। তিনি প্রমাণ করে দিলেন যে তাঁর পেছনে অধিকাংশ মুসলিম ভোট। এখন তাঁকে হিন্দু শিখের সম্মতি পেতে হবে, আর যদি তিনি মনে করেন যে তাদের সম্মতি অবান্তর তা হলে তাদের সঙ্গে প্রত্যক্ষ সংগ্রামে জয়ী হতে হবে। এটা তত সহজ নয়। তবু তিনি সে ঝুঁকিও নিতেন। কারণ তিনি জানতেন যে প্রত্যক্ষ সংগ্রামে মার খেলেও তিনি সেটাকে পাকিস্তানের পক্ষে একটা যুক্তি বলে ব্রিটিশ পার্লামেণ্টে পেশ করতে পারতেন। পাকিস্তান না হলে মাইনরিটির জান মান নিরাপদ নয়। তাদের পালাবার একটা স্থান থাকা চাই।

সাধারণ নির্বাচনের পরে ব্রিটিশ ক্যাবিনেটের তিনজন মন্ত্রী ভারতবর্ষে আসেন সরেজমিনে অবস্থাটা দেখতে ও দেখে ব্যবস্থা করতে। কংগ্রেস লীগ যাতে একমত হয় সেটাই তাঁদের মিশন। সেটা ব্যর্থ হলে ব্রিটিশ গভর্নমেণ্ট যা করবার তা করতেন। তাঁরা কংগ্রেসের সঙ্গে স্বতন্ত্রভাবে কথাবার্তা চালান, কারণ ততদিনে কংগ্রেস ও লীগ নিজেদের মধ্যে বাক্যালাপ বন্ধ করেছে। তাঁরা গান্ধীজীর সঙ্গেও পরামর্শ করেন, তবে সেটা ঠিক নেগোশিয়েশনস বলতে যা বোঝায় তা নয়। এখানে স্পষ্ট করে বলা দরকার যে ইংরেজরা

গান্ধীর উপরে আগুন হয়ে রয়েছিলেন। তাঁদের বিশ্বাস কংগ্রেস তো ভালো ছেলের মত ক্রিপস প্রস্তাব গিলতে যাচ্ছিল, গান্ধীই তার কান ধরে টান দিলেন। গান্ধীর থেকে কংগ্রেসকে বিচ্ছিন্ন করাই তার পর থেকে ব্রিটিশ পলিসি। তাই গান্ধীকে তাঁরা বাপ হিসাবে সম্মান দেখালেও ছেলেকে হাত করার তালে ছিলেন। তাঁতে কংগ্রেসের কদর বেড়েছিল, লীগের কমেছিল।

ক্যাবিনেট মিশন কারো উপরে কিছু চাপিয়ে দিতে পারতেন না। শুধু প্রস্তাব করতে পারতেন। সে প্রস্তাব কেউ গ্রহণ করতেও পারে, না করতেও পারে। তবে তাঁদের থলিতে ছিল একটি লোভনীয় জিনিস। সেটি তারা তাঁকেই দেবেন যে তাঁদের প্রস্তাব পুরোপুরি গ্রহণ করবে। এবার বড়লাট তাঁর শাসন পরিষদ্ ঢেলে সাজবেন। তাতে জঙ্গীলাট থাকবেন না। ভারতীয়রাই সব ক'টি পদ পাবেন। ওটা হবে সত্যি-কারের একটা ক্যাবিনেট। বড়লাট পররাষ্ট্র বিভাগও বিলিয়ে দিয়ে রাজসন্ন্যাসী হবেন। হস্তক্ষেপ করার অধিকার থাকবে, কিন্তু সাধারণত প্রয়োগ করা হবে না। এর নাম ইণ্টারিম গভর্নমেণ্ট।

হ্যামলেটের প্রশ্ন টু বী অর নট টু বী। কংগ্রেসেরও তেমনি, টু গো অর নট টু গো। লীগেরও তাই। কারণ ক্যাবিনেট মিশন যে প্রস্তাব সামনে রেখেছিলেন সে যে ছুঁচো গেলার প্রস্তাব। গিলবে কি গিলবে না?

ক্যাবিনেট মিশন আশ্বাস দিয়েছিলেন যে ভারতীয়রা মিলে মিশে যে সংবিধান প্রণয়ন করবে ব্রিটেন সেই সংবিধানই স্বীকার করবে। নিজের জন্যে কিছু হাতে রাখবে না। এখন ভারতীয়দের একমত হওয়া চাই। একটি পার্টির উপর মেজরিটির সিদ্ধান্ত চাপাতে না চায়। অপরপক্ষে মাইনরিটিও যেন মেজরিটির পথ রোধ না করে। দু'পক্ষের বিবেচনার জন্যে ক্যাবিনেট মিশন যে পরিকল্পনা দেন তার সার কথা ভারতের জন্যে একটাই কেন্দ্র হবে, দুটো নয়। সেই একমাত্র কেন্দ্রের হাতে থাকবে দেশরক্ষা, পররাষ্ট্রবিভাগ, চলাচল ও সেসব বিভাগের জন্যে প্রয়োজনীয় অর্থ। আর সমস্ত বিষয়ে তুলে দেওয়া হবে তিনটি প্রদেশগোষ্ঠীর হাতে। একটি গোষ্ঠীতে থাকবে মাদ্রাজ, বম্বে, যুক্তপ্রদেশ, মধ্যপ্রদেশ, বিহার, ওড়িশা। আরেকটিতে পাঞ্জাব, সিন্ধু, উত্তরপশ্চিম সীমান্ত প্রদেশ। শেষেরটিতে বাংলা, আসাম। এই তিন গোষ্ঠীর প্রত্যেকটি গোষ্ঠী স্বতন্ত্রভাবে স্থির করবে কোন কোন বিষয় গোষ্ঠীর সকলের পক্ষে সাধারণ বিষয়, কোন কোন বিভাগ সাধারণ নয়, প্রদেশের নিজস্ব। গোষ্ঠীতে যোগ দিতে কাউকে বাধ্য করা হবে না, যোগ দিলে বেরিয়ে যেতেও পারবে। কিন্তু গোড়ায় যোগ দেওয়া চাই। তেমনি দেশীয় রাজ্য সম্বন্ধেও পরিকল্পনায় ব্যবস্থা ছিল।

প্রথমটা বুঝতে পারা যায়নি যে ওর ভিতরে একটু কৌশল ছিল। ওদিকে উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশ আর এদিকে আসাম অর্থাৎ উত্তরপূর্ব সীমান্ত প্রদেশ দুই যাচ্ছে লীগের বগলে। লীগ পাচ্ছে পাঁচটা প্রদেশ। ব্যালান্স অফ পাওয়ার। তা ছাড়া সীমান্ত দুটোর অবস্থানগত গুরুত্ব যেমন তাতে লীগের বল বাড়বে। বারগেনিং পাওয়ার।

এটা গান্ধী আজাদের পরিকল্পিত বিকেন্দ্রীয়করণ নয়, কায়দে আজমের পরিকল্পিত দ্বিকেন্দ্রীকরণ নয়, এটা দুয়ে এক, একে দুই। দুই পাশে দুই পাকিস্তান, মধ্যিখানে হিন্দুস্থান। মাথার উপরে কেন্দ্রস্থান। তাতে দেশীয় রাজ্যের প্রতিনিধিরাও থাকবেন, কিন্তু তাঁরা মনোনীত না নির্বাচিত তা পরিষ্কার নয়। শিখদের ভাগ্যও অনিশ্চিত।

এ পরিকল্পনা মেনে নিলে আসাম ও উত্তরপশ্চিম সীমান্ত প্রদেশের মায়া কাটাতে হয় কংগ্রেসকে। গান্ধী তাতে রাজী হতে পারেন না। তা হলে কি ক্যাবিনেট মিশনকে ব্যর্থ হয়ে ফিরে যেতে হবে? তা যদি হয় তবে ব্রিটেনের দিক থেকে আর কোনো প্রস্তাব আসবে না। নেগোশিয়েশনস ছিন্ন হয়ে যাবে। কিছুদিন বাইরে থেকে কংগ্রেসকেও ফিরতে হবে জেলে। কেন্দ্রে কোনোরকম পরিবর্তন না ঘটলে শুধুমাত্র প্রাদেশিক সরকার চালিয়ে কংগ্রেসের মানসম্মান থাকবে না। লোকে হাসবে। বামপন্থীরাও বিদ্রোহ করবে।

তা হলে কি ক্যাবিনেট মিশন স্কীম গিলতে হবে? অগত্যা। গান্ধীরও ইচ্ছা নয় অসময়ে আবার এক গণ আন্দোলন করা। জোয়ারের লক্ষণ ছিল না। যেটা ছিল সেটা অরাজকতার। তিনি আর অগাস্ট অভ্যুত্থানের পুনরাবৃত্তি চান না। তাঁর মতে কংগ্রেসের পার্লামেন্টারি প্রোগ্রামে ফিরে যাওয়াই ভালো। কনস্টিটুয়েন্ট অ্যাসেম্বলির প্ল্যান মেনে নেওয়াই ভালো, তবে আসাম সম্বন্ধে তাঁর ব্যাখ্যা যে অন্যরূপ এটাও তিনি জানিয়ে রাখেন। ওদিকে লীগও স্কীম গিলতে রাজী ছিল। যাতে ইন্টারিম গভর্নমেণ্টে যাওয়া সুগম হয়।

কিন্তু ইন্টারিম গভর্নমেন্ট নিয়ে দুই পক্ষের সামঞ্জস্য হলো না। লীগ চায় কংগ্রেসের সঙ্গে প্যারিটি। না পেলে ভীটো। কংগ্রেস চায় লীগের চেয়ে অন্তত একটা আসন বেশী পেতে। ভীটোতে কংগ্রেস নারাজ। বড়লাট চোদ্দটা আসনের থেকে লীগকে অফার করেন পাঁচটা, কংগ্রেসকে ছ'টা, তার মধ্যে একটা আসন হরিজনের জন্যে সংরক্ষিত। কংগ্রেস বলে সে তার ছ'জনের মধ্যে একজন মুসলমানকেও নেবে, কারণ কংগ্রেস কেবল হিন্দুদের দল নয়, হিন্দু মুসলিম নির্বিশেষে সকলের। লীগের ঠিক এইখানেই গলায় কাঁটা। সে অমন সরকারে থাকবে না। বড়লাট কিছুতেই দু'দিক মেলাতে পারলেন না। তাঁর প্রয়াস ব্যর্থ হলো।

ব্রিটেনের প্রধানমন্ত্রী তখন অ্যাটলী। তিনি ওপার থেকে নির্দেশ পাঠান যে লীগ যোগ দিক আর নাই দিক ইণ্টারিম গভর্নমেণ্ট গঠন করতেই হবে। না করলে কংগ্রেস হয়তো আবার সিভিল ডিসওবিডিয়েন্স বাধাবে। তিনি আর সিভিল ডিসওবিডিয়েন্স চান না। সুতরাং বড়লাটকেও সে আজ্ঞা করতে হয়। জবাহরলালকে আমন্ত্রণ করতে হয় ক্যাবিনেট গঠনে সাহায্য করতে। তিনিই যখন কংগ্রেস সভাপতি। তিনি কায়দে আজমের সঙ্গে মোলাকাৎ করেন ও কোয়ালিশন গঠনের প্রস্তাব তোলেন।

ঝীণা ইতিমধ্যে মুসলিম লীগের মিটিং ডেকে ক্যাবিনেট মিশন স্কীম খারিজ করেছিলেন। কাজেই ইণ্টারিম গভর্নমেণ্টে যোগ দিতে পারেন না। আসলে ক্যাবিনেট মিশনের পরিকল্পিত বিকেন্দ্রীকরণ তাঁর দাবীর পরিপূরণ নয়। তিনি চেয়েছিলেন দ্বিকেন্দ্রীকরণ। একটিমাত্র কেন্দ্র যতই ক্ষুদ্র হোক না কেন সেখানেও মেজরিটি মাইনরিটির দ্বন্দ্ব দেখা দেবে। মেজরিটি তার বাড়তি ভোট দিয়ে মাইনরিটিকে পরাস্ত করবে। গণতন্ত্রের নিয়ম যদি খাটে তো কংগ্রেস প্রত্যেকবার জিতবে। সেইজন্যে তিনি চেয়েছিলেন প্যারিটি। আপাতত বড়লাটের পরিষদে। সেইজন্য তিনি চেয়েছিলেন ভীটো। আপাতত বড়লাটের উপস্থিতিতে। পরে বড়লাটের অবর্তমানে তিনি হয়তো কাস্টিং ভোট চেয়ে বসতেন। তা নইলে কোয়ালিশন পোষায় না। তা ছাড়া তাঁর পক্ষে এটিও একটি জীবনমরণ প্রশ্ন কে মুসলমানদের প্রকৃত প্রতিনিধি। লীগ না কংগ্রেস। লীগ যদি সব মুসলমানদের একমাত্র প্রতিনিধি না হয়ে থাকে তবে কোয়ালিশনে লীগের আগ্রহ নেই। কংগ্রেসী মুসলমানদের সঙ্গে এক টেবিলে বসলে লীগ মুসলমানের জাত যাবে।

ইণ্টারিম গভর্নমেণ্টে তাঁর দাবী মিটবে না। কনষ্টিটুয়েণ্ট অ্যাসেম্বলিতেও তাঁর উদ্দেশ্যসিদ্ধি হবে না। তা হলে কেন আর পিছুটান? তারপর সবচেয়ে বড়ো কথা বড়লাটের শাসনপরিষদের সব পারিষদের সমান মর্যাদা। কেউ প্রধানমন্ত্রী নন। জবাহরলাল ধরে নিয়েছেন যে তাঁকে কার্যত প্রধানমন্ত্রী করা হবে। ওয়েভেলও সেটা ধরে নিয়েই তাঁকে গভর্নমেণ্ট গঠনে সহায়তার ভার দিয়েছেন। ঠিক যেমন বিলেতে হয়। কিন্তু দেশটা তো বিলেত নয়। এখানে এখনো সেরকম কোনো কনভেনশন গড়ে ওঠেনি। কংগ্রেস থেকে একজন প্রধানমন্ত্রী হলে লীগের উপর সর্দারি করবেন। লীগের মান-ইজ্জৎ থাকবে না। প্রধানমন্ত্রী পদত্যাগ করলে গোটা ক্যাবিনেট পদত্যাগ করে। সেটাও মুসলিম লীগ মেনে নেবে না।

ঝীণা তাঁর চালগুলো ঠিক করে রেখেছিলেন। একটার পর একটা ক্রমশ প্রকাশ্য। জবাহরলালকে তিনি "না" বলে দেন। তখন বড়লাট তা শুনে দ্বিধাগ্রস্ত হন। ব্রিটিশ

পলিসি নয় লীগকে বাদ দিয়ে শুধুমাত্র কংগ্রেসকে ক্ষমতা দেওয়া। গান্ধী গিয়ে ওয়েভেলকে মনে করিয়ে দেন যে তিনি প্রতিশ্রুত। প্রতিশ্রুতি ভঙ্গ করলে পরিণাম ভালো হবে না। ওয়েভেল বেকায়দায় পড়ে জবাহরলালের মনোনীত সদস্যদের নিয়ে গভর্নমেণ্ট গঠন করেন। গান্ধীর কাছে সেটি একটি স্মরণীয় দিবস। তাঁর মনে বিজয়োল্লাস।

ওদিকে ঝীণার কাছে ওটি একটি কালো দিন। ইতিমধ্যেই তিনি লীগকে দিয়ে ডাইরেক্ট অ্যাকশনের প্রস্তাব পাশ করিয়ে নিয়েছিলেন। শুরু হয়ে গেছল "লড়কে লেঙ্গে পাকিস্তান"। চারদিনেই পাঁচ হাজার নিহত। এক কলকাতায়।

॥ চব্বিশ ॥

ঝীণা মনে মনে স্থির করে রেখেছিলেন যে ইংরেজের সঙ্গে কংগ্রেসের যখন একটা 'ডীল' হবে তখন তাঁকে তার থেকে বাদ দিলে তিনি অনর্থ বাধাবেন। সেই অনর্থটা কী হতে পারে, তা নিয়ে আমরা ছ'বছর আগে বলাবলি করেছি যে ঝীণা আর যাই করুন ফৌজদারি করবেন না। তাঁর মেজাজটা দেওয়ানি। কিন্তু আমাদের সে ধারণা যে ভুল সেটা প্রতিপন্ন হয় ১৯৪৬ সালের ১৬ই অগাস্ট। তাঁর কথা হলো তিনি এতকাল শাসনতান্ত্রিক পথ ধরে কিছু পাননি। এবার দেখাবেন তাঁরও একটা পিস্তল আছে।

তা তিনি দেখিয়ে ছাড়লেন। সাতশো বছর যারা সুখে দুঃখে একত্র বাস করে এসেছে, যারা ধর্মে এক না হলেও রক্তে এক, ভাষায় এক, সাধারণ স্বার্থে এক তারাও সাত মাসের মধ্যেই পরস্পরের উপর ক্ষোভে রাগে অনাস্থায় বলতে লাগল, এর চেয়ে আলাদা হয়ে যাওয়া ভালো। পাঞ্জাবী হিন্দু শিখরাই আওয়াজ তুলল যে পাঞ্জাব ভাগ করতে হবে। সে আওয়াজ ভারতের পূর্ব প্রান্তেও প্রতিধ্বনিত হলো। বাংলা ভাগ করতে হবে।

ঝীণা সাহেব ভোট নিয়ে মুসলমানের সম্মতি পেয়েছিলেন। এবার পিস্তল দেখিয়ে হিন্দু শিখের সম্মতিও পেলেন। বাকী রইল ইংরেজের অনুমোদন। সেটার জন্যে পিস্তলের দরকার হবে না। তবে সরকারী খেতাব বর্জন করে একটা প্রতীকী প্রতিরোধ জ্ঞাপন করা হয়েছিল। তোমরা যদি ধরে নিয়ে থাকো যে আমরা মুসলমানরা চিরকাল ভালো ছেলে হব সেটা ভুল। আমরাও দুষ্টু ছেলে হতে জানি। কেন আমাদের মিঠাইমিনির মুখে ঠেলে দিচ্ছ ?

মুসলমানরা ক্ষেপলে তাদের শায়েস্তা করার ক্ষমতা বা রুচি কোনোটাই ছিল না ইংরেজের। সে কাজ যদি করতে হয় হিন্দুরাই করুক। কিন্তু ইংরেজ থাকতে নয়। তার আগেই ওরা বিদায় নেবে। শুধুমাত্র কংগ্রেসের সঙ্গে সেটলমেণ্ট হবে এ প্রস্তাবে তারা নারাজ। একমাত্র কংগ্রেসই সারা ভারতের প্রতিনিধি এ ঘোষণায় তারা বিশ্বাস করে না। কংগ্রেসে অহিন্দুরাও থাকতে পারে, তা বলে কংগ্রেসের হাতে অহিন্দুদের সঁপে দেওয়া যায় না।

স্বাধীনতা বলতে যদি বোঝায় ব্রিটেনের সঙ্গে বন্দোবস্ত না করে ক্ষমতা আত্মসাৎ করা তবে নেগোশিয়েশনসের কী দরকার? শক্তি থাকে তো কেড়ে নাও। কিংবা ছেড়ে যাচ্ছি, দখল করো। আর যদি ব্রিটেনের সঙ্গে বন্দোবস্ত বোঝায় তবে যেটা হবে সেটা ক্ষমতা হস্তান্তর। সেটাতে মাইনরিটিরও একটা অংশ থাকবে। তবে সেটা পাকিস্তান আকারে না অন্য কোনো আকারে সে প্রশ্ন ব্রিটেনের মাথাব্যথা নয়। মাইনরিটির পক্ষে কথা বলবার পাত্র মুসলিম লীগ। তাকে বাদ দিয়ে নেগোশিয়েশনস নয়। তা সে যতই দস্যিপনা করুক। ডাইরেক্ট অ্যাকশন করতে তাকে বাধ্য করল কে?

স্বাধীনতা বলতে গান্ধী বুঝতেন ইংরেজের অধীনতা থেকে মুক্তি। আর জীণা বুঝতেন হিন্দু মেজরিটির মুখাপেক্ষিতা থেকে মুক্তি। একজনের প্রতিপক্ষ ইংরেজ, অপরজনের হিন্দু মেজরিটি। এঁদের মধ্যে মিটমাট ইংরেজ থাকতে হবার নয়। কিন্তু ইংরেজ গেলেও কি হবার? ইংরেজ গেলে কি হিন্দু মেজরিটিও যাবে? হিন্দু মেজরিটি যেত শুধু একটি উপায়ে। সেটি দেশভাগ। সেইজন্যে জীণা অমন মরিয়া হয়ে উঠেছিলেন। তাঁর পাওনা একপাউণ্ড মাংস তিনি না পেয়ে ছাড়বেন না। কিন্তু খেয়াল ছিল না যে কংগ্রেসও একপাউণ্ড মাংস চাইবে। প্রদেশভাগ।

তবে কংগ্রেসকে তিনি চিনতেন। গান্ধীর কাছে যেমন নীতি বড়ো কংগ্রেসের কাছে তেমনি ক্ষমতা বড়ো। একটা সর্বশক্তিমান কেন্দ্র পেলে কংগ্রেস মুসলিমপ্রধান প্রদেশ বা অঞ্চল ত্যাগ করতেও পারে। যদি ইংরেজ সেটা রোয়েদাদ হিসাবে দেয়। স্বতন্ত্র নির্বাচন পদ্ধতিও কি কংগ্রেস অমনি নিত? নিল সাম্প্রদায়িক রোয়েদাদ হিসাবে। স্বতন্ত্র ইলেকটোরেট থেকে ক্রমে ক্রমে স্বতন্ত্র নেশন। একই বিবর্তনধারা। খানিকটা গিলবে, বাকীটা গিলবে না, এ কি কখনো হতে পারে? কংগ্রেস যদি গিলতে আপত্তি করে তবে ইংরেজরা সেটলমেণ্ট না করেই বিদায় নেবে। ক্ষমতার হস্তান্তর যদি আইন অনুসারে না হয় তবে কংগ্রেসকে মানবে কে? মুসলিম সৈন্য কি লয়্যালটির শপথ নেবে? মুসলিম রাজপুরুষরাও কি আনুগত্য জানাবেন? মুসলিম প্রজারাও কি বিদ্রোহ করবে না?

সত্যি তাই। নেহরু ও পটেল দেখেন যে মুসলিম সৈনিক, রাজপুরুষ প্রভৃতির আনুগত্য বড়লাটের শাসনপরিষদের মুসলিম সদস্যদেরই প্রতি। কংগ্রেস সদস্যদের তাঁরা আপনার মনে করেন না। এসব ডিসলয়াল কর্মচারী নিয়ে গভর্নমেণ্ট চলবে কী করে, যখন ইংরেজ থাকবে না? বড়লাট চলে গেলে কি একটা দিনও এদের সহযোগিতা পাওয়া যাবে? একটা হুকুমও কি এরা মানবে? তা হলে কেন এদের ধরে রাখা? হোক পাকিস্তান। যাক পাকিস্তানে।

ইতিমধ্যে বড়লাট মুসলিম লীগকে বলে কয়ে তাঁর শাসনপরিষদে নিয়ে এসেছিলেন। তা না হলে ত্রিপাক্ষিক কথাবার্তা সম্ভব হতো না। দ্বিপাক্ষিক কথাবার্তা এগোত না। ইংরেজরা কেবলমাত্র কংগ্রেসের সঙ্গে সেটল করত না। সেটলমেণ্ট বলতে ওরা বুঝত ত্রিপাক্ষিক সেটলমেণ্ট। ওর মধ্যে কোন নূতনত্ব ছিল না। অন্যান্য বারের শাসন-সংস্কারেও ত্রিপাক্ষিক কথাবার্তা হয়েছিল। দ্বিপাক্ষিকটা গান্ধীজীর আইডিয়া। যেমন গান্ধী আরউইন চুক্তি। ইংরেজরা একবারমাত্র ওটা হতে দিয়েছে। আর দেয়নি ও দিত না। তার চেয়ে বিনা সেটলমেণ্টে প্রস্থান করত। গৃহযুদ্ধ বাধলে বাধত। সেটা যে অহিংস ব্যাপার হতো না খীণার ডাইরেকট অ্যাকশন তারই প্রস্তাবনা।

খীণার হাত থেকে পিস্তল কেড়ে নেবার জন্যেই গান্ধীজী নোয়াখালী যাত্রা করেন। সেখানে যদি তিনি হিন্দু মুসলমানকে শান্তিতে রাখতে পারেন তো গৃহযুদ্ধের সম্ভাবনা দূর হয়ে যায়। তখন যে সিদ্ধান্ত নেওয়া হবে তা পিস্তলের মুখে নয়, শান্ত মনে। কিন্তু তাঁর নোয়াখালীতে পদার্পণের পিঠ পিঠ ঘটে গেল বিহারের ঘটনাবলী। আরো ভয়ঙ্কর, আরো ব্যাপক। তার কিছুকাল পরে পাঞ্জাবের ঘটনাবলী। আরো পৈশাচিক, আরো ব্যাপক। গান্ধীজী একসঙ্গে ক'টা জায়গায় যাবেন? ক'টা জায়গায় শান্তি স্থাপন করবেন? তাঁর সহকর্মীরা বিহারে সক্রিয় ছিলেন, কিন্তু সেখানেও জবাহরলালকে বোমাবর্ষণের হুমকি দিতে হলো। স্টেট ভায়োলেন্স যদি সঙ্গে সঙ্গে চালানো যায় তা হলে অহিংসার উপর লোকের নির্ভরতা থাকে কোথায়? নোয়াখালীতে দেখা গেল লোকে মিলিটারির উপস্থিতি চায়। গান্ধী বার বার বারণ করা সত্ত্বেও মিলিটারি গিয়ে সেখানে হাজির হয় ও তার অর্থ দাঁড়ায় এই যে, গান্ধী না থাকলে মিলিটারি থাকে না, সুতরাং মহাত্মা থাকুন, তাঁর থাকার ফলে মিলিটারিও থাকবে। কী সুন্দর লজিক!

' গান্ধীর থাকার উপর মিলিটারির থাকা নির্ভর করছে এটা বুঝতে পেরে নোয়াখালীর মুসলমানরাও বেঁকে বসে। ওরা বলে, গান্ধীর চলে যাওয়াই উচিত, তাহলে মিলিটারিও চলে যাবে। ওদের দোষে মিলিটারি এসেছে এটা ওরা বুঝবে না। দোষ অস্বীকার করবে। তাহলে আর হৃদয়পরিবর্তন হলো কোথায়? রাষ্ট্রই কতক

লোককে ধরে নিয়ে যায়, বিচার করে, কারো কারো সাজা হয়। হিন্দুদের আস্থা ফিরে আসে মুসলমানদের গেপ্তার, বিচার ও সাজা দেখে। কিন্তু তার ফলে মুসলমানদের রাগ চড়ে যায়। তারা আরও জোরসে পাকিস্তান দাবী করে।

গান্ধীজী উপলব্ধি করেন যে তিনি এতকাল যে অহিংসা শিখিয়ে এসেছেন সে অহিংসা নয়, দুর্বলের নিষ্ক্রিয় প্রতিরোধ। সে বস্তু অরাজকতার দিনে কাজ দেয় না। তিনি অন্ধকারে পথ হাতড়ে চলেন। তাঁর মনে বোধহয় একটা ক্ষীণ আশা ছিল যে ব্রিটেনের সদিচ্ছায় আস্থা হারিয়ে কংগ্রেসের নেতারা ইণ্টারিম গভর্নমেণ্ট ছেড়ে বেরিয়ে আসবেন। তখন মুসলিম লীগের ষাঁড়ের সামনে আর কংগ্রেসের লাল ন্যাকড়া থাকবে না। ষাঁড়ের ষণ্ডামি থাকবে। মুসলিম লীগের ষণ্ডামি থামলে হিন্দুরা নিরাপদ হবে। তখন জন বুলের বিরুদ্ধে গণ সত্যাগ্রহের কথা ভাবা যাবে।

কিন্তু কংগ্রেস নেতাদের মনোভাব ছিল ইংলণ্ডের রাজা দ্বিতীয় চার্লসের মতো। তাঁরা অনেককাল ভ্রমণ করেছেন। আর ভ্রমণে যাবেন না বলে মনঃস্থির করেছেন। ইংরেজরাও চান না যে কংগ্রেস নেতারা পদত্যাগ করে আবার গণ সত্যাগ্রহে উদ্যোগী হন। দুপক্ষেই একটা দীয়তাং নীয়তাং ভাব। বড়ো বড়ো সমস্যা ছিল তিনটে কি চারটে। সেগুলোর যদি সমাধান হয়ে যায় ব্রিটেন কালকেই যেতে রাজী। গান্ধীজী যে ভেবেছিলেন কংগ্রেস পদত্যাগ করে আবার সংগ্রাম করবে তার দরকারই হয় না।

বড়ো বড়ো সমস্যার প্রথমটা ছিল সিভিল সার্ভিস ও আর্মির ভবিষ্যৎ। স্থির হয়ে গেল যে যারা অবসর চায় তারা যদি অভারতীয় হয়ে থাকে তবে তারা পেনসন তথা ক্ষতিপূরণ পাবে। যারা কাজ করতে রাজী তারা যদি ভারতীয় হয়ে থাকে তবে তারা অবসর নেবার সময় পেনসন তথা ক্ষতিপূরণ পাবে। আর যারা অভারতীয় তাদের কপালে ক্ষতিপূরণ নেই, কিন্তু আর যা সব আছে। অবসর নিলে তারা পেনসন পাবে, কাজ করলে তারা মাইনে ইত্যাদি আগের মতো পাবে। তাদের প্রসপেক্টস বরং আরো ভালো হবে। সুতরাং ক্ষতিপূরণের কথা মুখে এনেছ কি মরেছ।

এরপরের সমস্যা হলো মাইনরিটির ভবিষ্যৎ। তারা যদি তাদের জন্যে আলাদা একটা রাষ্ট্র চায় তবে কি মেজরিটি তাতে রাজী হবে? এই যে প্রশ্ন এটা ওয়েভেল থাকতে মিটল না, তিনি বা অন্যান্য ব্রিটিশ আর্মির লোকেরা সৈন্যদল ভেঙে দেবার পক্ষপাতী ছিলেন না। কত কষ্টে গড়া হয়েছে যাকে তাকে কি এককথায় তছনছ করে দেওয়া যায়? ওয়েভেলকে গান্ধী ভুল বুঝেছিলেন, আরো অনেকে ভুল বুঝেছেন। তিনি কিন্তু পার্টিশনের বিপক্ষেই ছিলেন। তাঁর ছিল আজব এক পরিকল্পনা। তাতে ব্রিটিশ নরনারীর জীবন নিরাপদ হতো, কিন্তু হিন্দু মুসলমানের জীবন বিপন্ন হতো। কে

জানে হয়তো বিপন্ন হয়েই ওরা নিজেদের মধ্যে একটা ঘরোয়া মিটমাট করত। তৃতীয় পক্ষের সাহায্য নিত না। গান্ধী তো একটা ঘরোয়া মিটমাটই চেয়েছিলেন, তাতে তৃতীয় পক্ষের হাত থাকত না।

কিন্তু ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রী ওয়েভেলকে সরিয়ে দিয়ে মাউন্টব্যাটেনকে পাঠালেন ও তার আগেই ঘোষণা করে দিলেন যে ইংরেজেরা ১৯৪৮ সালের জুন মাসের মধ্যেই অপসরণ করবে। ক্ষমতা হস্তান্তর কার হাতে করবে সেটা নির্ভর করবে দেশের নেতারা একমত না একাধিকমত তারই উপর। একাধিকমত হলে একাধিক হাতে, একমত হলে একহাতে। তার মানে ভারত ভাগ হয়ে যেতে পারে। যদি কংগ্রেস লীগ ভিন্নমত হয়। এই ওয়ার্নিংটা পেয়ে কংগ্রেস নেতারা যে লীগ নেতাদের সঙ্গে হাত মেলাবার চেষ্টা করলেন তা নয়। আর লীগ নেতারা যে বিন্দুমাত্র সচেষ্ট হলেন তাও নয়। তাঁদের কাছে ওটা ওয়ার্নিং না হয়ে গ্রীন সিগনাল। দেশ ভাগ হয়ে যেতে পারে এর মধ্যে আশঙ্কার কী আছে ? এ তো পরম আশ্বাসনার কথা।

মাউন্টব্যাটেন আসার আগেই রব উঠেছিল পাঞ্জাব ভাগ করা হোক। কিছুদিন যেতে না যেতেই প্রতিধ্বনি উঠল বাংলা ভাগ করা হোক। গান্ধীজীর অমতে কংগ্রেস প্রদেশ ভাগে রাজী হয়ে যায়। মাউন্টব্যাটেন যখন বলেন যে ঐক্য দেশভাগের বেসিস ছাড়া অন্য কোনো বেসিসে মিটমাট করবেন না তখন কংগ্রেস নেতারা বলেন, বেশ তো, সেই-সঙ্গে প্রদেশ ভাগও হয়ে যাক। তখন দ্বিতীয় সমস্যাটার মীমাংসা হলো। একটা নয়, দুটো কেন্দ্রীয় গভর্নমেণ্টকে ক্ষমতা হস্তান্তর করা হবে। তাদের মধ্যে সরকারী বিভাগ-গুলো ভাগ করে দেওয়া হবে। অখণ্ড ভারত নয়, দ্বিখণ্ড ভারত। অখণ্ড বঙ্গ নয়, দ্বিখণ্ড বঙ্গ। অখণ্ড পাঞ্জাব নয়, দ্বিখণ্ড পাঞ্জাব। আসামের থেকে সিলেট বিচ্ছিন্ন হয়ে পূর্ববঙ্গের সামিল হবে, যদি লোকে তাই চায়। তেমনি উত্তরপশ্চিম সীমান্ত প্রদেশ পাকিস্তানের সামিল হবে, যদি লোকে চায়।

অতি সহজ সমাধান। কিন্তু কেউ ভেবে দেখলেন [illegible]ত্তরপশ্চিম সীমান্ত প্রদেশের কংগ্রেসী মুসলমানদের কী দশা হবে। তাদের একূলও গেল, ওকূলও গেল। তেমনি দুই রাষ্ট্রের মাইনরিটিদের কী হবে। এসব ভাববেন আর কে ? সেই গান্ধী। কিন্তু তাঁর সহকর্মীরা যখন মাউন্টব্যাটেনের সঙ্গে মীমাংসা করে ফেলেছেন আর মুসলিম লীগও যখন সে মীমাংসায় সম্মত তখন তিনি একা কী করতে পারেন ? দেশকে ডাক দিয়ে বলতে পারেন, এ সমাধান ঠিক নয়। এটা অগ্রাহ্য করো। কিন্তু কোন সমাধানটা ঠিক ? কোনটা নির্ভুল ? ক্যাবিনেট মিশনের সমাধান তো তিনি নিজেই সংশোধন করতে চেষ্টা করে বিফল হয়েছেন।

আলামের মায়া না কাটালে ক্যাবিনেট মিশন স্কীম অপরের গ্রাহ্য হবে না। আর তাতে যে বিকেন্দ্রীকরণের ব্যবস্থা করা হয়েছে সেটা কংগ্রেস নেতাদের অগ্রাহ্য। তাঁরা বরং দ্বিকেন্দ্রীকরণ নেবেন, তবু বিকেন্দ্রীকরণ নয়। কিন্তু দ্বিকেন্দ্রীকরণ নিলে এই শর্তে নেবেন যে বাংলা ও পাঞ্জাব দ্বিধাবিভক্ত হবে।

গান্ধীজী আপ্রাণ চেষ্টা করেছিলেন যাতে বাংলা অন্তত ভাগ না হয়। তেমনি আপ্রাণ চেষ্টা করেছিলেন জীণা। তেমনি বাংলার গভর্নর বারোজ। তিনি ইউরোপীয়দের দিক থেকে। কিন্তু সেটা সম্ভব হতো অন্য একটি ফরমুলা মেনে নিলে। পার্টিশন ফরমুলা নয়, বলকান ফরমুলা। অর্থাৎ ক্ষমতার হস্তান্তর হবে প্রদেশওয়ারি। পরে প্রদেশের সঙ্গে প্রদেশের জোড়া লেগে অখণ্ড ভারতও হতে পারে, দ্বিখণ্ড ভারতও হতে পারে, বহুখণ্ড ভারতও হতে পারে। ওই ফরমুলাটিও মাউন্টব্যাটেনের ঝুলিতে ছিল। তাঁর ইউরোপীয় সাঙ্গোপাঙ্গরা ওটি উদ্‌ভাবন করেছিলেন। কতকটা ইউরোপীয় স্বার্থে, কতকটা মুসলিম স্বার্থে। ও ফরমুলা মেনে নিলে বাংলা স্বতন্ত্র হতে পারত, আসামও স্বতন্ত্র হতে পারত, দুই মিলে অর্ধপাকিস্তান হতে পারত। কিন্তু জবাহরলাল জানতে পেরে ওটা নাকচ করেন ও পার্টিশনের ভিত্তিতেই মীমাংসা করেন। দুটো মন্দের মধ্যে যেটা কম মন্দ সেটাই বেছে নেন। জনমতও সেইটের পক্ষে।

এমনি করে দ্বিতীয় বৃহৎ প্রশ্নের উত্তর পাওয়া গেল। মাইনরিটির ভবিষ্যৎ কী হবে তার উত্তর। এর পরে তৃতীয় বৃহৎ প্রশ্ন। ইউরোপীয়দের ভবিষ্যৎ কী? তাঁরা এদেশে দুই শতাব্দী ধরে ব্যবসাবাণিজ্য করে আসছেন। তাঁদের কি তবে পাততাড়ি গুটোতে হবে? সাম্রাজ্য গুটিয়ে নেওয়া মানে কি বাণিজ্য গুটিয়ে নেওয়া? এর উত্তর, ভারত ও পাকিস্তান ডোমিনিয়ন স্টেটাস নিয়ে কমনওয়েলথে অবস্থান করতে সম্মত। একবার যখন এই প্রশ্নটার মীমাংসা হয়ে গেল তখন মাউন্টব্যাটেন সঙ্গে সঙ্গে স্থির করলেন যে ১৫ই আগাস্টের মধ্যে সব কিছু সেরে ভারত থেকে অপসরণ করবেন। আর দেরি করার কারণও ছিল না, ইচ্ছাও ছিল না।

ইংরেজরা গান্ধীজীর সঙ্গে মীমাংসার আশা ছেড়ে দিয়েছিল। কিছুতেই তিনি মাইনরিটিদের ভবিষ্যতের প্রশ্নে আপস করতেন না। তাঁর মতে ওর মীমাংসা ব্রিটেন থাকতে নয়। ওটা আমাদের ঘরোয়া প্রশ্ন। আমরা দু'ভাই যেমন করে পারি মেটাব। দরকার হলে লড়ব। আর নয়তো দেশ ভাগাভাগি করব। কিন্তু কেউ আমাদের মাঝখানে থেকে নীলাম দর চড়িয়ে দেবে না। আগে ইংরেজ যাক, হয় কংগ্রেসের হাতে সারা দেশটা দিয়ে যাক, নয় লীগের হাতে। কিন্তু তাঁর ও প্রস্তাব কেউ সমর্থন করে না। ওটা কাজের কথা নয়।

অথচ মাইনরিটির ভবিষ্যৎ অনিশ্চিত রেখে ব্রিটেন এদেশ থেকে বেরোতে পারছিল না। দেশীয় রাজ্যদের সে তাদের নিজেদের হাতে সমর্পণ করতে প্রস্তুত ছিল। প্যারামাউন্ট পাওয়ার নিজেও থাকবে না, আর কাউকেও করবে না। কার্যত ওরা কেন্দ্রীয় সরকারের সঙ্গেই জুড়ে যাবে। ওদের জন্যে ব্রিটেনের মাথাব্যথা ছিল না। ছিল মুসলিমদের জন্যে। তার একটা কারণ তো এই যে কংগ্রেসের সঙ্গে সংগ্রামে ওরা মোটের উপর সংগ্রামের বাইরে থেকে পরোক্ষভাবে সাহায্য করেছে। তা ছাড়া আরো একটা কারণ ছিল। সেটা আমার এক ইউরোপীয় বন্ধুর মুখে শুনি। পার্টিশন হতে যাচ্ছে এইজন্যে যে, "ওদেশের মিডল ইস্টার্ন পলিসির অঙ্গ হচ্ছে এদেশের মুসলিম পলিসি। এখানকার মুসলমানদের চটালে মিডল ইস্টে আমরা টিকতে পারব না।"

প্যার্টিশনে রাজী না হলে যা হতো তা বলকান সৃষ্টি। গান্ধীজীর তাতে আপত্তি না থাক কংগ্রেসের ছিল। রাজনীতিতে লেইটেস্ট বরণীয় যেটাতে কম মন্দ। পরে গান্ধীজীও সেটা বুঝতে পেরে কংগ্রেস নেতাদের সমর্থন করেন। সিদ্ধান্তটা তাঁদের, সমর্থনটা তাঁর। এরপর তিনি নোয়াখালীতে ফিরে যাবার জন্যে রওনা হন। কিন্তু পথে কলকাতায় সুহরাবর্দী তাঁকে আটক করেন। কলকাতার মুসলমানরা সন্ত্রস্ত। কে জানে ১৫ই অগাস্ট কী হয়! হিন্দুরা হয়তো প্রতিশোধ নেবে। তারপর সারা বাংলা জুড়ে হিংসা প্রতিহিংসার তাণ্ডব চলবে। গান্ধীজী কলকাতায় থামেন ও তাঁর অলৌকিক প্রভাবে অবস্থা শান্ত হয়। সে এক অপূর্ব দৃশ্য।

॥ পঁচিশ ॥

অবশেষে এল সেই অমৃতময় দিন যেদিন আমরা জেগে দেখলুম যে আমরা স্বাধীন। দু'শো বছরের বিদেশী রাজত্ব কখন একসময় স্বপ্নের মতো মিলিয়ে গেছে। যাবার সময় ইংরেজরা আমাদের হৃদয় জয় করে গেল। আমরাই মাউন্টব্যাটেনকে আরো কিছুদিনের জন্যে ধরে রাখলুম, যাতে দেশীয় রাজ্যের অন্তর্ভুক্তি ও পাকিস্তানের সঙ্গে সম্পর্ক শান্তিপূর্ণ হয়।

গান্ধীজী যখন কুইট ইণ্ডিয়া বলেছিলেন তখন কি তিনি জানতেন যে ইতিহাস তার অন্যরকম অর্থ করবে? ভারতেরই একাংশ হবে পাকিস্তান? সেখান থেকে কুইট করে আসবেন যাবতীয় হিন্দু ও শিখ রাজকর্মচারী? আর পশ্চিমপাকিস্তান থেকে আধকোটি হিন্দু ও শিখের জনতা? তিনি যদি কলকাতায় একটি মিরাক্ল না ঘটাতেন তবে

পূর্বপাকিস্তানের হিন্দুরাও পুরোপুরি না হোক বহুপরিমাণে পশ্চিমপাকিস্তানের হিন্দুদের পদাঙ্ক অনুসরণ করত। আর পশ্চিমবঙ্গের মুসলমানরাও।

অপরপক্ষে ভারতের যে অংশ নিজের নাম হিন্দুস্থান না রেখে ভারত রাখে সেখান থেকেও কুইট করে যান অধিকাংশ মুসলিম রাজকর্মচারী, কিন্তু কতক থেকে যান এই কারণে যে ভারত ঘোষণা করেছে তার রাষ্ট্র ধর্মনির্বিশেষ রাষ্ট্র, সেকুলার স্টেট। সেখান থেকেও কুইট করে যায় আধকোটি মুসলমানের জনতা, কিন্তু তার বহুগুণ থেকে যায় এইজন্যে যে ভারত কেবল হিন্দুদের দেশ নয়, এদেশ ধর্মনির্বিশেষে সকল ভারতবাসীর।

গান্ধীজী যখন কলকাতায় বসে পূর্বদিকটা সামলাচ্ছেন তখন পশ্চিমদিকটা সামলাবার জন্যে তাঁর মতো কেউ ছিলেন না। মাউন্টব্যাটেনের ধারণা গান্ধী যদি সে সময় পাঞ্জাবে থাকতেন তা হলে অত বড়ো একটা বিপর্যয় সেখানে ঘটত না। অহিংসার চরণে নৌসেনাপতি ও রাজবংশীয় পুরুষের এই নতিস্বীকার সোনার অক্ষরে লেখা থাকবে। মাউন্টব্যাটেন গান্ধীজীকে আখ্যা দেন 'ওয়ান ম্যান বাউণ্ডারি ফোর্স'।

কিন্তু বাংলার সঙ্গে পাঞ্জাবের এমন কয়েকটা তফাৎ ছিল যা মনে রাখলে পশ্চিমের ট্র্যাজেডীর হেতু বোঝা যায়। সেখানে কাজ করছিল তিন পক্ষের উচ্চাভিলাষ। শিখ, মুসলমান ও হিন্দু। প্রত্যেকেই ষোল আনার মালিক হবে। তার জন্যে হাতিয়ার সংগ্রহ করা সাত বছর ধরে চলেছিল। শেষের দিকে প্রদেশভাগের রব ওঠে, সেটা কিন্তু মুসলমানের তরফ থেকে নয়। মুসলমান তার ষোল আনার দাবীতে অটল। তারপর, ভাগাভাগির প্রস্তাব যারা তোলে তারা ভেবেছিল তাদের খুশিমতো ভাগ হবে, অন্তত লাহোরটা তাদের ভাগে পড়বে। হলো নিরপেক্ষভাবে, শিখ ও হিন্দুর বিস্তর প্রিয় স্থান ও প্রচুর ভূসম্পত্তি মুসলমানের ভাগে পড়ল। লাহোর—রণজিৎ সিংহের লাহোর—শতবর্ষ পরে শিখরা ফিরে পেলো না, তাদের বদলে পেলো মুসলমানরা। ওটা যেন কলকাতা শহর পাকিস্তানকে দেওয়া। সেরূপ ক্ষেত্রে বাংলাদেশও কি লালে লাল হয়ে যেত না?

পাকিস্তানের নেতারা হিন্দু ও শিখকে পাকিস্তানেই রাখতে চেয়েছিলেন। তাই তাঁদের জাতীয় পতাকার একতৃতীয়াংশ সফেদ। জীণা সাহেব তো পাকিস্তানের গভর্নর-জেনারেল হয়ে ব্যক্তিগতভাবে আশ্বাস দিয়েছিলেন যে এখন থেকে কেউ হিন্দু নয়, কেউ মুসলিম নয়, সকলেই পাকিস্তানী, সকলের জন্যেই পাকিস্তান। কিন্তু সেই তিনিই সরকারীভাবে পাকিস্তানকে ইসলামিক স্টেট আখ্যা দিয়ে মুসলমানকেই দেন তার প্রথমশ্রেণীর নাগরিকত্ব। যারা মুসলমান নয় তারা হলো জিম্মি। না, মূর্তিপূজক যারা তারা জিম্মি হবারও যোগ্য নয়। অনেকেই জানেন না যে ইসলামিক স্টেট মূর্তি-

পূজকদের অস্তিত্বই স্বীকার করে না, যেমন স্বীকার করে খ্রীষ্টান ও ইহুদীদের অস্তিত্ব। ইসলামিক স্টেটে মূর্তিপূজা যারা করে তারা হয় ওকাজ ছেড়ে ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করবে, নয় দেশত্যাগ করবে, নয় কোতল হবে। চতুর্থ পন্থা নেই।

তবে কার্যত এর প্রয়োগের বেলা উদারতা আসে। ভারতের মাটিতে মূর্তিপূজকদের সংখ্যা এত অধিক, আর তাদের হাতে এত বেশী অস্ত্রশস্ত্র যে তাদেব সবাইকে মুসলমান করা সম্ভব হয় না। কোতল করাও কাজের কথা নয়। চাষ করবে কে? খাজনা দেবে কে? আর দেশত্যাগ করে যাবেই বা তারা কোথায়? মুসলিম সুলতানরা ক্রমে দেশের রীতিকেই রাষ্ট্রের নীতি করেন। যার যার ধর্ম তার তার। তবে তাঁরা ইসলামকেই করেন রাজধর্ম। অর্থাৎ ভারতের মাটিতে যা গড়ে ওঠে তা ধর্মরাষ্ট্র নয়, রাষ্ট্রধর্ম। ইসলাম রাষ্ট্রধর্ম হয়েই ক্ষান্ত হয়, ধর্মরাষ্ট্র সংস্থাপনের স্বপ্ন বিসর্জন দেয়। আকবর তো তাকে রাষ্ট্রধর্মের মর্যাদাও দেন না, তবে সেটা পরবর্তী আমলে ফিরে আসে।

এতকাল পরে আবার শোনা গেল ইসলাম যা দেড় হাজার বছর আগে গড়তে চেয়েছিল, কিন্তু সাতশো বছর হলো পারেনি সেই জিনিসই আবার গড়বে পাকিস্তান। ঐসলামিক ধর্মরাষ্ট্র। বলতে গেলে সাতশো বছরের ভারতীয় ইতিহাসকেই সে উল্টে দিয়ে ইসলামের ইতিহাসকে পুনঃপ্রবর্তন করবে। এতকাল মন্দির ও মসজিদ পাশাপাশি দেখা গেছে, যেমন মুসলিম রাজ্যে তেমনি হিন্দু রাজ্যে। মুসলিম রাজার হিন্দু প্রজারা প্রাণভয়ে হিন্দু রাজ্যে পালায়নি। হিন্দু রাজার মুসলিম প্রজারাও মুসলিম রাজ্যে পালিয়ে গিয়ে নিরাপত্তা চায়নি। সাতশো বছব পরে কী এমন হয়েছে যে হিন্দু শিখরা ঊর্ধ্বশ্বাসে ভারতরাষ্ট্রে ছুটে আসবে আর মুসলমানরা পাকিস্তানে দৌড় দেবে? এমন যদি চলতে থাকে তবে তো পাকিস্তান অচিরেই হিন্দুশূন্য হবে, আর ভারতরাষ্ট্র মুসলিমশূন্য।

এপারেও একদল ধুয়ো ধরলেন যে ভারতরাষ্ট্রকেও করতে হবে হিন্দুরাষ্ট্র আর হিন্দুধর্মকে রাষ্ট্রধর্ম। এটাও সেই পাকিস্তানী দুই নেশনতত্ত্বের অনুসরণ, ভারতীয় এক নেশনতত্ত্বের অস্বীকৃতি। পাকিস্তানীরা যেমনটি করবে এঁরাও ঠিক তেমনটি করবেন। ওরা যদি হাজার বছর পিছিয়ে যায় এঁরাও যাবেন হাজার বছর পিছিয়ে। ওরা যদি আত্মহত্যা করে এঁরাও করবেন আত্মহত্যা। দেশের স্বাধীনতার জন্যে ওরা কড়ে আঙুলটি নাড়েনি, দেশ আবার পরাধীন হলে ওদের কী আসে যায়? কিন্তু এঁরা তো স্বাধীনতার জন্যে দুঃখ পেয়েছেন, তার মূল্য বোঝেন। তবে কেন সেই চোরাগলিতে পা দিচ্ছেন যা একদিন পরাধীনতাতেই পৌঁছে দিয়েছিল ও আবার দিতে পারে। আসলে

ওটা ছিল পাকিস্তানকে জব্দ করার ও তার উপর চাপ দেওয়ার কৌশল। সেই কৌশলের অঙ্গ মুসলমানদের যেতে বাধ্য করা, হিন্দুদের আসতে বাধ্য করা, বেআইনী ও বেসরকারীভাবে একটা লোকবিনিময় ঘটানো।

হিন্দুরাও যে সমান সাম্প্রদায়িক হতে পারে, হতে পারে রাতারাতি, এটা সেদিন আমাদের চোখে একান্ত বিস্ময়কর ঠেকে। এক একটা দেশের এক একটা প্যাটার্ন থাকে, সে প্যাটার্ন বুনে যায় তার হাজার হাজার বছরের ইতিহাস। এদেশের প্যাটার্ন ইংরেজ আসার আগেও ছিল নানা জাতির নানা বর্ণের নানা ধর্মের নানা ভাষার মিশ্র প্যাটার্ন। যা হাজার হাজার বছর ধরে ঘোরতর রূপে মিশ্র তাকে আজ হঠাৎ ক্ষমতা হাতে পেয়ে অমিশ্র করতে পারে কেউ! একজন মানুষ ধর্মে মুসলমান, কিন্তু ভাষায় বাঙালী, পেশায় চাষী, মতবাদে ভারতীয় জাতীয়তাবাদী। সে কি থাকবে, না যেতে বাধ্য হবে? তাকে বাধ্য করার দায়িত্ব কে নেবে? রাষ্ট্র না বেসরকারী এক সংগঠন না উচ্ছৃঙ্খল এক জনতা?

আমার এক বন্ধু দিল্লী থেকে ঘুরে এসে বলেন, "কংগ্রেস তো নামেই রাজা। প্রকৃত রাজা আর এস এস। ভোট নিলে দেখা যাবে ওদের মেজরিটি, কংগ্রেসের নয়।"

আমি হতবাক হই। যাঁর মুখে শুনি তিনি নিজেই কংগ্রেস মন্ত্রী। তিনি ভাবতেই পারেননি যে স্বাধীন ভারতের কংগ্রেস সরকার দিল্লীতেই পুত্তলিকা হবেন।

তাঁদের অবস্থা আরো পরিষ্কার হলো যখন খবর এল ম্যাজিস্ট্রেটের কর্তব্য করতে গিয়ে আমার আরেক বন্ধু প্রাণ হারিয়েছেন কার হাতে, না তাঁরই স্বধর্মী এক হিন্দু সিপাহীর হাতে। তাকে নির্দেশ দেওয়া হয়েছিল মুসলমানের উপর হামলা নিবারণ করতে, তা সে নিবারণ করল নিবারণকর্তাকে গুলি করে।

হামলা চলবে, তাকে নিবারণ করা চলবে না। একদিকে আর এস এস, আরেকদিকে পুলিশ, মাঝখানে ফাঁদে পড়া মুসলমান। গভর্নমেণ্ট কি হিন্দু হয়ে হিন্দুকে মারবে? না, হিন্দুর সাত খুন মাফ? মুসলমান যেথা ইচ্ছা যাক।

সমুদ্রমন্থনে যে অমৃত উঠেছিল তা সেবন করলেন দুই রাষ্ট্রের নতুন দেবগণ। আর যে হলাহল উঠেছিল তা পান করলেন নীলকণ্ঠ গান্ধী। তিনি তাঁর কলকাতার মিশন সেরে নোয়াখালী যাত্রা করছেন, সেখানে গিয়ে তাঁর অসমাপ্ত ব্রত সমাপন করতে হবে, এমন সময় দিল্লী থেকে এল জরুরি তলব। সেখানেও হলাহল উঠেছে, পান করবার জন্যে নীলকণ্ঠকে চাই। পূব মুখে যাবার মানুষকে পশ্চিম মুখে যেতে হলো। কে জানত যে অগস্ত্য যাত্রা!

পশ্চিমপাকিস্তানের হিন্দু শিখ শরণার্থীরা দিল্লীতে এসে মুসলমানদের ঘরবাড়ী

মসজিদ দখল করে বসেছে। তাদের ধারণা তারাই ভারতরাষ্ট্রের যথার্থ নাগরিক আর মুসলমানরা এখানে অনধিকারী। বহু হিন্দুর বিশ্বাস যে মুসলমানরা পঞ্চম বাহিনী, তাদের আনুগত্য সীমান্তের ওপারে, সুতরাং তাদের বহিষ্কার ও লোকবিনিময়ই প্রকৃত সমাধান।

মহাত্মাকে প্রতিদিন এর বিরুদ্ধ সংগ্রাম করতে হলো। এই অসত্যের বিরুদ্ধে। একটা অন্যায়ের উত্তর যে আরেকটা অন্যায় নয়, হিংসার উত্তর যে প্রতিহিংসা নয়, বহিষ্কারের উত্তর যে বহিষ্কার নয়, সমস্যার সমাধান যে প্রতিশোধ নয় এসব কথা দিনের পর দিন জনসাধারণকে বোঝাতে হলো। দেশ ভাগ হয়ে গেছে, সেটা দুঃখের বিষয়। তা বলে লোকভাগ হবে কেন? জনগণ যে এক ও অবিভাজ্য। জনগণ যদি অবিভক্ত থাকে তা হলে দেশভাগও তেমন ক্ষতি করবে না, কিন্তু লোকভাগ হবে ক্ষতিকর। আর সেটা যদি হয় বেসরকারী ও বেআইনী, তার পদ্ধতি যদি হয় নিরীহ নির্দোষ সংখ্যালঘু প্রতিবেশীর উপর প্রতিশোধ তবে তো সম্পূর্ণ অহিতকর।

এ যেমন তাঁর জনসাধারণের প্রতি উপদেশ তেমনি রাষ্ট্রনায়কদের প্রতি পরামর্শ তাঁদের সেকুলার পলিসিতে স্থির থাকা, পাকিস্তানের কাছে সমান সদাচার প্রত্যাশা করা, তার বদ আচরণের জবাব বদ আচরণ নয়। এক্ষেত্রেও যা করবার তা একতরফা ভাবেই করতে হবে। কিন্তু এইখানেই তাঁর সহকর্মীদের সঙ্গে মতভেদ ঘটে। তাঁদের মতে আন্তর্জাতিক খেলার নিয়ম হলো রেসিপ্রোসিটি। একপক্ষ যা দেবে অপরপক্ষ তার পাল্টা দেবে। ভালোর বদলে ভালো। মন্দের বদলে মন্দ। বদলা নেওয়াই আন্তর্জাতিক নীতি। নইলে ওরা এদের দুর্বল ভাববে। অন্যায়ের উপর আরো বেশী অন্যায় চাপাবে।

হিংসা আর প্রতিহিংসার, অন্যায় আর পাল্টা অন্যায়ের দুষ্ট বৃত্ত ভঙ্গ করাই হলো গান্ধীজীর কাজ। তিনি রাষ্ট্রনায়ক নন। কিন্তু মন্ত্রণাদাতা। জবাহরলাল সেকুলার স্টেটের রাষ্ট্রীয় শক্তির সদ্ব্যবহার করলেন। শান্তিস্থাপনের জন্যে ডাক দিলেন মাদ্রাজী সৈন্যদের। তারা গুলী চালিয়ে হাঙ্গামা বন্ধ করল। রাষ্ট্র পরিষ্কারভাবে সংখ্যালঘুর পক্ষ নিল।

হিন্দুদের জন্যেই হিন্দুস্থান, না ভারতীয়দের জন্যে ভারত এই প্রশ্নে সংঘাত গান্ধীজীর উত্তরজীবনকে যেমন মহিমাময় তেমনি ট্র্যাজিক করে। হিন্দুর দেশে হিন্দুর উপর গুলী চলছে দেখে কংগ্রেসেরই একভাগ জবাহরলালের বিপক্ষে চলে যায়, আর গান্ধী যেহেতু জবাহরলালের পক্ষে সেহেতু গান্ধীরও বিপক্ষে। যাঁরা ছিলেন পরম গান্ধীভক্ত তাঁরাও তাঁর উপর বিরক্ত হয়ে ভাবেন তাঁর হিমালয়ে চলে যাওয়াই ভালো। কিংবা আর

কোথাও। তাঁদের স্বাধীনতায় যেন তিনি হস্তক্ষেপ না করেন। স্বাধীনতাটা যে গান্ধীরই পুণ্যবলে অর্জিত এটা ভুলে যেতে বেশীদিন লাগে না। গান্ধীর পণ, তিনি মাইনরিটিকে পরিত্যাগ করবেন না। দিল্লীর মাইনরিটিকে স্বস্থানে ও সসম্মানে রেখেই তিনি নোয়াখালীর মাইনরিটিকে স্বস্থানে ও সসম্মানে রাখবেন। অপরপক্ষে তাঁর সমালোচকরা মনে করেন যে পাকিস্তানের উপর চাপ দিলেই কার্যোদ্ধার হবে, আর যদি নাও হয় তাতে কী হয়েছে? চলে যাক না এখানকার মাইনরিটিরা ওখানে। চলে আসুক না ওখানকার মাইনরিটিরা এখানে। এই তো হিন্দুর আপনার দেশ। আর ওই তো মুসলমানের আপনার রাষ্ট্র। যেন ওটাও হিন্দুর আপনার দেশ নয়, এটাও মুসলমানের আপনার রাষ্ট্র নয়।

শত্রুর অভাব ছিল না। তারা তো শেল হানবেই। বন্ধুরও অভাব ছিল না, তারা হাত ধরাধরি করে তাঁকে ঘিরে দাঁড়ান না, তাঁর চারদিকে অভেদ্য ব্যূহ রচনা করেন না। জীবনের অন্তিম পর্বে তিনি স্বজনপরিত্যক্ত অথচ সংকল্পে অটল। তাঁর বন্ধুরা ইচ্ছা করলেই তাঁর অনশনের পূর্বক্ষণেই তাঁর দাবীগুলো মিটিয়ে দিতে পারতেন, অথবা সঙ্গে সঙ্গে। আটাত্তর বছর বয়সের একটি বৃদ্ধকে ছয়দিন ধরে অনশন করতে হলো, তার কারণ সরকারী সহকর্মীদের হৃদয় পাষাণ হয়েছিল। বাইরের সহধর্মীদের হৃদয়ও। লোকের ধারণা তিনি পাকিস্তানকে জিতিয়ে দিচ্ছেন।

ইতিমধ্যে ভারত-পাকিস্তানের অন্যান্য দেশীয় রাজ্যগুলি দুটি রাষ্ট্রের একটিতে বা আরেকটিতে যোগ দিলেও হায়দরাবাদের নিজাম ও কাশ্মীরের মহারাজা মনঃস্থির করতে পারছিলেন না। সুযোগ বুঝে একদল ট্রাইবাল কাশ্মীর আক্রমণ করেও তাতে পাকিস্তানের যোগসাজস ছিল জেনে মহারাজা ভারতে যোগ দেন। তৎক্ষণাৎ ভারতীয় সৈন্য গিয়ে কাশ্মীর উদ্ধার করে। হায়দরাবাদে যেরূপ রজাকরদের উপদ্রব চলেছিল তা অন্য উপায়ে না মিটলে সেখানেও সৈন্য পাঠানোর প্রয়োজন হতে পারে, কিন্তু গান্ধী কি সেটা সমর্থন করবেন? সরকারী মহলে ক্রমেই একটা ধারণা দৃঢ় হচ্ছিল যে গান্ধী থাকতে বলপ্রয়োগের স্বাধীনতা নেই, সুতরাং গান্ধীর থাকাটা অনাবশ্যক। তাঁর ও তাঁর অহিংসার ঐতিহাসিক প্রয়োজন ফুরিয়েছে। তেমনি গান্ধীজীরও মনে হয় যে কংগ্রেসেরও ঐতিহাসিক প্রয়োজন ফুরিয়েছে।

লবণ যদি তার লবণত্ব হারায় তবে আর কিসে তাকে লবণাক্ত করবে? কংগ্রেস তার লবণত্ব হারিয়েছে। গান্ধী-মতবাদ পরিত্যাগ করেছে। এখন পরিত্যাগ করছে গান্ধীকেই। সাম্রাজ্যবাদের সঙ্গে লড়তেই তার অস্তিত্ব। সাম্রাজ্যবাদ আর নেই।

লড়াইও ঢুকে গেছে। এখন তাহলে কংগ্রেসকে লোকসেবক সংঘে রূপান্তরিত করতে হবে। ক্ষমতা যে জনাকয়েক নেতার হাতে কেন্দ্রীভূত হবে এটা তো তিনি চাননি, যেমন ধনসম্পদ গুটিকয়েক পরিবারে কেন্দ্রীভূত হবে এটাও তিনি চাননি। তাঁর পরিকল্পনা ছিল বিকেন্দ্রীকরণ, হয়ে দাঁড়ায় দ্বিকেন্দ্রীকরণ। তিনি জনগণের ক্ষমতার হস্তান্তর কামনা করেন।

জীবনের শেষদিনের আগের দিন মার্গারেট বুর্ক-হোয়াইট তাঁর সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন। প্রশ্নের উত্তরে মহাত্মা বলেন তিনি যে একশো পচিশ বছর বয়স অবধি বাঁচবেন সে আশা তিনি হারিয়েছেন। কিন্তু কেন? মার্কিন লেখিকা ও ফোটোগ্রাফার জানতে চান।

"Because of the terrible happenings in the world. I do not want to live in darkness and madness. I cannot continue...." He paused and I waited.

Thoughtfully he picked up a strand of cotton, gave it a twist, and ran it into the spinning wheel. "But if my services are needed," he went on, "rather I should say, if I am commanded, then I shall live to be one hundred and twenty-five years old."

এর পরে আরো কয়েকটি প্রশ্ন। তারপরে পরমাণু বোমার প্রশ্ন। পরম হিংসার প্রশ্ন। পরমাণু বোমার সঙ্গে তিনি কী ভাবে মোকাবিলা করবেন?

"Ah, ah!" he said, "How shall I answer that!" The charkha turned busily in his agile hands for a moment, and then he replied, "I would meet it by prayerful action." He emphasised the word "action," and I asked what form it would take.

"I will not go underground. I will not go into shelters. I will come out in the open and let the pilot see I have not the face of evil against him."

He turned back to his spinning for a moment before continuing.

"The pilot will not see our faces from his great height, I know. But that longing in our hearts that he will not come to harm would reach up to him and his eyes would be opened."......

পরের দিনই তাঁর অগ্নিপরীক্ষা। প্রার্থনাপূর্ণ ক্রিয়াসহযোগে তিনি মৃত্যুবাণের সম্মুখীন হন। সম্পূর্ণ প্রস্তুতভাবে ভগবানের নাম করেন, "হে রাম! হে রাম!" তাঁর মুখমণ্ডলে মন্দের আভাস নেই। তাঁর সাধনা সার্থক। তাঁর জীবন সুসমাপ্ত। ওই তাঁর ক্রুশিফিকশন।

২০শে অগাস্ট ১৯৬৯

পরিশিষ্ট

গান্ধীজ

আলমোড়া বেড়াতে গিয়ে এক বাঙালী ডাক্তারের সঙ্গে আমার আলাপ হয়। অবসরপ্রাপ্ত মিলিটারি সার্জন। অগাস্ট আন্দোলনের পর বছর ঘুরতে চলল। গান্ধীজী তখন পুণায় খান্ প্রাসাদে বন্দী।

ডাক্তার সাহেব যখন লণ্ডনে পড়াশুনা করতেন তখন গান্ধী এলেন দক্ষিণ আফ্রিকা থেকে ব্রিটিশ সরকারের সঙ্গে কথাবার্তা চালাতে। সত্যাগ্রহ ততদিনে আরম্ভ হয়ে গেছে। কিন্তু খুব কম লোকেই তার খবর রাখে। সাবারকর সেসময় লণ্ডনে ছিলেন। একদিন গান্ধীর সঙ্গে তাঁর আলোচনা হয়। হিংসা অহিংসা নিয়ে তর্ক ওঠে।

সাবারকর বলেন, "গান্ধী, মনে করুন একটা বিরাট বিষধর সাপ আপনার দিকে তেড়ে আসছে। আর আপনার হাতে আছে একগাছা লাঠি। আপনি কী করবেন? মারবেন না মরবেন?

গান্ধী উত্তর দেন, "লাঠিখানা আমি ছুঁড়ে ফেলে দেব। পাছে ওকে মারবার প্রলোভন জাগে।"

"ধর্মে আপনি আমার গুরু হতে পারেন, কিন্তু রাজনীতিতে নয়।" এই বলে সাবারকর শেষ করে দেন।

দু'জনেই ওঁরা হিন্দু। কেউ কারো চেয়ে কম হিন্দু নন। কারণ হিন্দুদের ঐতিহ্য কেবল অহিংসারও নয়; কেবল হিংসারও নয়। শাস্ত্রগ্রন্থে যেমন অহিংসার প্রশস্তি আছে তেমনি অস্ত্রধারণের সমর্থন আছে। ইতিহাসে অসংখ্য রক্তক্ষয়ী সংগ্রাম ঘটেছে, আবার কলিঙ্গবিজয়ের পর যুদ্ধবিগ্রহে ক্ষান্তি দেবার মহৎ দৃষ্টান্তও আছে।

গান্ধীজী ভারতবর্ষে ফিরে আসার পরেও সেই একই তর্ক বার বার বিভিন্ন জনের সঙ্গে উঠেছে। অসহযোগ আন্দোলনের সময় উঠেছে, তার দশ বছর পরে আইন অমান্য আন্দোলনের সময় উঠেছে, আরো দশ বছর বাদে অগাস্ট আন্দোলনের সময় উঠেছে। ইংরেজ যখন আপনা হতে ভারত ছেড়ে যেতে উদ্যত মুসলিম লীগের প্রত্যক্ষ সংগ্রামের সময় উঠেছে। দেশ যখন দু'ভাগ হয়ে গেল তখনো সেই একই তর্ক জনমতকে দু'ভাগ করে দিল। আজও সে বিতর্কের অবসান হয়নি।

হিংসাবাদীরা অবশ্য দলে ভারী, কিন্তু অহিংসাবাদীদেরও একটা শিবির আছে, সে

শিবির একটা দিনও নিষ্ক্রিয় ছিল না ও থাকেনি। গান্ধী নেই, কিন্তু তাঁর নেতৃত্ব আছে। তাঁর আত্মা মার্চ করে চলেছে। কিছু লোক তাঁর অনুসরণ করে চলেছে।

শুধু ভারতে নয়। ভারতের বাইরে ইটালীতে, ফ্রান্সে, আমেরিকায়। প্রায় প্রত্যেক দেশেই অহিংসাবাদী ব্যক্তি আছেন, কিন্তু গোষ্ঠীবদ্ধ হয়েছেন তাঁরা মাত্র কয়েকটি দেশেই। সেসব গোষ্ঠী প্রধানত শুদ্ধভাবে জীবন পরিচালনা করতেই ব্যাপৃত। প্রচার বা আন্দোলন বা সত্যাগ্রহ করতে প্রস্তুত নন। সঙ্ঘবদ্ধ ক্রিয়া দেখা যাচ্ছে দলচির নির্দেশে সিসিলিতে। মার্টিন লুথার কিং-এর নির্দেশে আমেরিকায়।

'ক্যাথলিক ওয়ার্কার' পত্রিকার নাম এদেশের লোক জানেন না। আমেরিকার এই পত্রিকাটি যাঁদের মুখপত্র তাঁরাও একটি গোষ্ঠী। কিন্তু তাঁদের প্রেরণা খ্রীষ্টধর্মের আদি ঐতিহ্য। ভারতীয় অহিংস ঐতিহ্য নয়। অথচ তাঁরা গান্ধীকেও আপনার করে নিয়েছেন। প্রায়ই তাঁর দৃষ্টান্ত দেন, উক্তি উদ্ধার করেন। গত কয়েক শতকের মধ্যে গান্ধীর ধারে কাছে দাঁড়াবার মতো কোনো খ্রীষ্টশিষ্য না থাকায় গান্ধীই তাঁদের একমাত্র আধুনিক পথপ্রদর্শক। হিন্দু বলে তারা তাঁকে পর ভাবেন না।

গান্ধীজীর শিবির এখন বহুদূর বিস্তৃত। যেমন খ্রীষ্টানদের মধ্যে তেমনি বৌদ্ধদের মধ্যেও তাঁর মতবাদে বিশ্বাসী আছেন। তেমনি মুসলমানদের মধ্যেও। ইহুদীদের মধ্যেও। অহিংসা এমন এক তত্ত্ব যার কোনো দেশ-বিদেশ বা ধর্মবিধর্ম নেই। হিন্দু জনমত যেমন দুই ভাগে বিভক্ত খ্রীষ্টান জনমতও তেমনি। বৌদ্ধ জনমতও তেমনি। মুসলিম জনমতও তেমনি। আধুনিক জগতের সর্বত্র হিংসা অহিংসার দোটানা দেখা যাচ্ছে। কোথাও বেশী কোথাও কম। যেখানেই অহিংসাবাদী মণ্ডলী আছেন সেখানেই গান্ধীর চিন্তা ও কর্ম তাঁদের আলো দিচ্ছে।

তবে পথটা কঠিন। এত কঠিন যে গান্ধীর অনুসরণ করতে সাহস হয় না। বিষধর সাপ যার দিকে তেড়ে আসছে সে কি গান্ধীজীর কথায় লাঠি ছুঁড়ে ফেলে দেবে? সাপ যদি অত বড়ো ত্যাগের মহিমা না বোঝে, যদি ছোবল মারে, তখন? তার চেয়ে লাঠিখানা থাকলে সাপকেই ভয় দেখানো যায়। খবরদার, সাপ! আর এগিয়েছ কি মরেছ!

সাপের দাঁত ইতিমধ্যে পারমাণবিক হয়েছে। লাঠিও আর বাঁশের তৈরি নয়। সেও নিউক্লিয়ার না হলেও কনভেনশনাল। অবশ্য দুই রাষ্ট্রের মধ্যে। সংঘাতটা যেক্ষেত্রে দুই রাষ্ট্রের মধ্যে নয়, একটি রাষ্ট্রের সরকার ও নাগরিকদের মধ্যে, সেক্ষেত্রে নাগরিকরা অপেক্ষাকৃত নিরস্ত্র। গোটাকতক বন্দুক রিভলভার হাতে থাকতে পারে, কিন্তু সেরকম

লাঠিতে সাপ মরে না। মাঝখান থেকে প্রাণ যায়। সে প্রলোভন না জাগাই ভালো। পাছে প্রলোভন জাগে সেকথা ভেবে ওরকম হাতিয়ার হাত থেকে ছুঁড়ে ফেলে দেওয়াই শ্রেয়।

তার মানে কি সাপের পায়ে আত্মসমর্পণ ? না, অহিংসার অর্থ আত্মসমর্পণ নয়। অহিংসাও একপ্রকার অস্ত্র। সে অস্ত্র অদৃশ্য থেকে কাজ করে। সাপ তার পাল্টা দিতে জানে না। সাপ যদি পাল্টা দিতে চায় তো তাকেও অহিংস হতে হবে। গান্ধীজী বিশ্বাস করতেন যে তার প্রতিপক্ষও তাঁরই মতো মানুষ, হিংসাবাদী হলেও হিংস্র প্রাণী নয়। আর হিংস্র প্রাণী হলেই বা কী ? প্রাচীন ঋষিরা হিংস্র প্রাণীদেরও অহিংসা দিয়ে বশ করতেন। অহিংসা যদি সম্পূর্ণ নির্ভীক ও সপ্রেম হয় তবে তার ক্রিয়া হিংস্র প্রাণীর অন্তরেও হবে।

কথা হলো পৃথিবীতে ক'জন মানুষ সম্পূর্ণ নির্ভীক ও সপ্রেম ? শতকরা একজনও নয়। ভিতরে ভয় আর দ্বেষ, বাইরে অহিংসার অভিনয়, এ কি কখনো সঙ্কটকালে উদ্ধার করতে পারে ? প্রাচীন ঋষি বা মধ্যযুগীয় সন্ত কবে কোন্ সংগ্রামে জনগণকে নেতৃত্ব দিয়েছেন, জিতিয়ে দিয়েছেন ? ব্যক্তিগত জীবনে অহিংসা অবলম্বন করেছেন অনেকেই। প্রাণও দিয়েছেন। কিন্তু গান্ধীজীর বৈশিষ্ট্য হলো বহুলোককে সঙ্গে নিয়ে জাতীয় জীবনেও অহিংসার প্রয়োগ করা, একটার পর একটা ইস্যুতে সঙ্ঘবদ্ধ সংগ্রামে নামা। ইতিহাসে অহিংসার নজীর অনেক আছে, কিন্তু অহিংস পদ্ধতির বলপরীক্ষা গান্ধীজীর নেতৃত্বেই প্রথম। নিষ্ক্রিয় প্রতিরোধের নজীর অনেক আছে, কিন্তু সক্রিয় সত্যাগ্রহের এপিক উদাহরণ অভূতপূর্ব।

কী করে সম্ভব হলো এ কীর্তি, যখন শতকরা একজনও সম্পূর্ণ নির্ভীক বা সপ্রেম নয়, যখন ভয় আর দ্বেষ অতি ব্যাপক ? এর উত্তর, একজন তো সম্পূর্ণ নির্ভীক ও সপ্রেম ছিলেন, তাঁর তো কোনো ভয়ডর বা দ্বেষহিংসা ছিল না। তাঁর প্রভাব আর সকলের উপর সর্বক্ষণ কাজ করছিল। তাই তারাও কতক পরিমাণে নির্ভীক ও সপ্রেম হয়েছিল, ভীতি আর বিদ্বেষ কাটিয়ে উঠেছিল। সেই একজন না থাকলে এ কীর্তি সম্ভব হতো না।

অবশ্য গান্ধী না হলে যে ভারত স্বাধীন হতো না তা নয়। অহিংসা না হলে যে জনগণ লড়াই করত না তা নয়। কলম্বস না হলে যে আমেরিকা আবিষ্কার হতো না তা নয়। কিন্তু একটি বিশেষ দেশে ও একটি বিশেষ কালে যেটা হয় সেটা নিশ্চয়ই কোনো এক আকস্মিক কারণে নয়। তার পেছনে বহু কার্যকারণের সংযোগ আছে, একমুখীনতা আছে। তাছাড়া ব্যক্তিকেও তার ঐতিহাসিক গুরুত্ব দিতে হবে। ইতিহাস নৈর্ব্যক্তিক।

তার জগন্নাথের রথ ব্যক্তিমুখাপেক্ষী নয়। তা হলেও দেখা যায় ব্যক্তিবিশেষের হাতেই তার সারথির ছড়ি। সেই ছড়িখানা দেখেই লোকে রথের রশি ধরে টানে। তাদের রথ টানার সাধ তিনিই মেটান। সেইজন্য তারা তাঁর ডাক শোনে।

গান্ধীজী একবার বলেছিলেন যে প্রত্যেকটি আন্দোলনই তাঁর ঘাড়ে চাপানো। অর্থাৎ পরিস্থিতি এমন যে আন্দোলন না করে তাঁর উপায় ছিল না। চাহিদা ছিল বলেই জোগান দিতে হলো। অর্জুনের মতো তিনিও নিমিত্তমাত্র। ইতিহাসের নিমিত্ত। তিনি করেছিলেন, তা নয়। তাঁকে দিয়ে করানো হয়েছিল।

অনেকের ধারণা গান্ধীজীই তাঁর ব্যক্তিগত অহিংসা দেশের লোকের ঘাড়ে চাপিয়ে দিয়েছিলেন। সেইজন্যে তাঁর যাবার সঙ্গে সঙ্গে তাঁর সাধের অহিংসাও গেছে। যেটুকু আছে সেটুকু বরাবরই ছিল। জৈন ও বৈষ্ণবদের জীবে দয়া। নিরামিষভোজন। প্রাণীহত্যার অপ্রবৃত্তি। রাজনীতির সঙ্গে তার কোনো সম্পর্ক নেই।

যে অহিংসা জীবনের সর্ববিধ প্রকাশের সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত সে কখনো রাজনীতির সঙ্গে সম্পর্কশূন্য হতে পারে না। গান্ধীজীর মতে রাজনীতিতেও অহিংসার স্থান আছে, যেমন ব্যবসাবাণিজ্যেও সাধুতার স্থান আছে। যারা প্রতিদিন মানুষকে ঠকায় তারা নিরামিষভোজী বলেই অহিংস নয়। অপর পক্ষে একজন আমিষভোজীও সাধু হতে পারে। অহিংস হতে পারে। মানুষের সঙ্গেই মানুষের প্রধানত কারবার। মানুষের সঙ্গে মানুষের সম্পর্ক শোষণশূন্য ও হিংসাশূন্য হওয়া দরকার। শোষণ ও হিংসা যেখানে আছে মানুষকে তার প্রতিকার করতে হবে। প্রতিরোধ করতে হবে। তা হলেই রাজনীতি এসে পড়ে। আর রাজনীতি যদি আসে তবে অহিংস পদ্ধতিও আসে বা আসা উচিত।

যতদিন না মানুষের সঙ্গে মানুষের সম্পর্ক শোষণমুক্ত তথা হিংসামুক্ত হচ্ছে ততদিন রাজনীতির সঙ্গে অহিংসার সম্পর্ক থাকবেই। রাজনীতির সঙ্গে নিঃসম্পর্কিত যে অহিংসা সে যেমন চিরকাল ছিল তেমনি চিরকাল থাকুক, কেউ তাকে বাধা দিচ্ছে না। কিন্তু রাজনীতির সঙ্গে সম্পর্কিত অহিংসার প্রয়োজন যতদিন না ফুরোয় ততদিন তার জন্যেও জায়গা ছেড়ে দিতে হবে। সত্যাগ্রহের যুগ চলে যায়নি। উপযুক্ত পরিস্থিতি উপস্থিত হলে লোকে তাদের নিজেদের গরজেই গান্ধীজীর মতো একজন নেতার সন্ধান করবে ও তাঁকে সারথির আসনে বসিয়ে দিয়ে তাঁর নির্দেশে রথের দড়ি টানবে।

অহিংস মানুষ জীবনের কোনো অঙ্গকেই বাদ দিয়ে বাঁচতে পারে না। এমনি করেই গান্ধীজী রাজনীতিক্ষেত্রে এসে হাজির হলেন। নইলে গোড়ায় সেরূপ কোনো স্বপ্ন তাঁর ছিল না। আর রাজনীতির মূলগত প্রশ্নগুলো নিয়েই তিনি সংগ্রাম করেছিলেন। যেমন দক্ষিণ আফ্রিকায় বর্ণবৈষম্য, ভারতে সাম্রাজ্যবাদ, হিন্দুসমাজে অস্পৃশ্যতা, যুদ্ধকালে

যুদ্ধে যোগ না দেবার স্বাধীনতা। দৃশ্যত রাজনৈতিক হলেও তলে তলে নৈতিক প্রায় প্রত্যেকটি প্রশ্ন। নৈতিক বলেই তিনি আকৃষ্ট হয়েছিলেন। নিছক রাজনৈতিক হলে হতেন না। প্রশ্নগুলির মতো উত্তরগুলিও নৈতিক হবে এই ছিল তাঁর ধ্যান।

গান্ধীজীর অহিংসা চিরাচরিত অহিংসার অন্তর্ভুক্ত হলেও বেশ কিছু ভিন্ন। এ অহিংসা নৈতিক তথা রাজনৈতিক তথা সংগ্রামী তথা সমষ্টিগত।

১৯৬৮

ক্ষুরধার পন্থা

মা ছেলেকে ভালোবাসেন বলে তার মন্দ কাজকেও ভালোবাসেন না। মন্দ কাজকে ঘৃণা করেন। ছেলেকে পরিষ্কার শুনিয়ে দেন যে, তোমার মন্দ কাজ তুমি যদি না ছাড়ো তবে আমি তোমাকেই ছাড়ব। তোমার মন্দ কাজের জন্য তোমাকে সাজা পেতে হবে। তা যদি তুমি না পাও তবে আমিই আমার আপনার গায়ে পেতে নেব সব রকম দুঃখ আর দুর্ভোগ। তা দেখে যদি তোমার শুভবুদ্ধি জাগে, মতিগতি শোধরায়।

বহুক্ষেত্রেই আমরা দেখেছি যে মা তাঁর ছেলের অন্যায়ের প্রতিকার করেন দণ্ড দিয়ে। যেখানে দণ্ড দিতে হাত ওঠে না সেখানে আপনাকে অভুক্ত রেখে। যেখানে আরও কঠিন হওয়া দরকার সেখানে আপনাকে সরিয়ে নিয়ে। কিন্তু ভালোবাসার তা বলে বিরতি হয় না। কমতি হয় না।

বিশ্লেষণ করলে আমরা পাই প্রথমত সন্তানের উপর মাতৃহৃদয়ের অহেতুক ভালো-বাসা, নিঃস্বার্থ ভালোবাসা। বিনা শর্তে ভালোবাসা।

দ্বিতীয়ত মন্দের প্রতি ভালোর সহজাত বিরাগ, সক্রিয় বিরুদ্ধতা, সংশোধনকামী প্রতিবাদ বা প্রতিকার বা প্রতিরোধ প্রয়াস।

তৃতীয়ত সন্তানকে আঘাত করতে অনিচ্ছা বোধ করলে আত্মনিগ্রহ বা অসহযোগ। ছেলের গায়ে আঁচটি লাগবে না, কিন্তু তার যদি মন বলে কোনো পদার্থ থাকে তবে মনে লাগবে। ছেলে বুঝবে যে তারই জন্যে তার মা এত কষ্ট পাচ্ছেন, তার মন্দ কাজের জন্যেই। দু-দশ ঘা বেত খেলে সে যা ছাড়ত না তা মাকে সুখী করার জন্যে ছাড়বে।

দশ প্রহরণের উপরে আরো একটি প্রহরণ আছে। সেটির নাম জননীর স্বেচ্ছাদুর্ভোগ। জননী সে অস্ত্র নিজের উপরেই প্রয়োগ করেন। সন্তানের অনিষ্ট কামনা করে নয়। তার শুভবুদ্ধির উদ্রেক কামনা করেই।

মাতৃহৃদয়ের ভালোবাসা যদি অসত্য হয় তবে গোড়াতেই গলদ। সেইজন্যে অহিংসার প্রয়োগের পূর্বে নিশ্চিতভাবে জানতে হবে যে তার প্রয়োগকারীর হৃদয়ে আছে ভালোবাসা, যে ভালোবাসা সত্যিকার। প্রাথমিক সত্য হচ্ছে অন্যায়কারীর প্রতি ভালোবাসা। তার পরের কথা হচ্ছে অন্যায়কার্যের প্রতি বিরাগ বা বিরুদ্ধতা। শেষ কথা হচ্ছে হিংসামিশ্রিত দণ্ডদানে অনিচ্ছা ও অহিংসাত্মক স্বেচ্ছাদুর্ভোগে আগ্রহ।

গান্ধীজীর পূর্বেও নানা দেশে ও নানা যুগে অহিংসার সাধকদের আবির্ভাব ঘটেছে। গান্ধীজীর চেয়ে তাঁরা কেউ কম মানবপ্রেমিক নন। অন্যায়কে তাঁরা অন্যায়ই বলেছেন। কিন্তু তাঁদের অহিংসা অন্যায়কারীকে নিরস্ত করার জন্যে দশ প্রহরণের উপরে আরো একটি প্রহরণ ধারণ করেনি। যদি করে থাকে তো সেটাকে জীবনের ব্রত করেনি।

গান্ধীজীই সেই সাধক যিনি মানবপ্রেমে স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে মন্দের সঙ্গে দ্বন্দ্বে নেমেছেন, অথচ আঘাত প্রতিঘাতের পথ দিয়ে যাননি, স্বেচ্ছাদুর্ভোগ বহন করেছেন। তাঁর একমাত্র পূর্বসাধক যীশু। কিন্তু যীশুর মন্ত্র অপ্রতিরোধ। অহিংস প্রতিরোধ নয়।

তা ছাড়াও দু'জনের মধ্যে গভীর পার্থক্য আছে। গান্ধীর চেতনায় অন্যায়বোধ একান্ত তীব্র। অন্যায় দেখলে তাঁর মনে বিরোধিতার ভাব জাগে। সংগ্রাম না করে তিনি শান্তি পান না। অন্তরে আগুন জলতে থাকে। যীশু অপেক্ষাকৃত ধীর স্থির ও শান্ত।

খ্রীষ্টীয় সন্তদের মধ্যেও কেউ কেউ আর সহ্য করতে না পেরে তরবারি হাতে নিয়েছেন। তাঁরা কেবল সন্ত নন, তাঁরা যোদ্ধা। সেই যে যোদ্ধা-সন্তদের ঐতিহ্য সেটাই গান্ধীজীর আসল ঐতিহ্য। শুধু সন্তানকে সাজা দেবার বদলে আপনাকে দুঃখ দেওয়াটুকুই যা তফাত।

একদা এটা হয়তো একটা সামান্য তফাৎ ছিল। কিন্তু তরবারি কালক্রমে বন্দুকের রূপ নেয় ও বন্দুক আমাদের কালে পারমাণবিক ক্ষেপণাস্ত্রের রূপ নিয়েছে। বিষবাষ্প, ব্যাধিবীজ ইত্যাদি মারণাস্ত্রের প্রয়োগ অসম্ভব নয়। যোদ্ধা সন্তরা কি তা হলে তরবারি ধরতে গিয়ে পরমাণু বা বীজাণু বাণ ছুঁড়বেন ?

মানবজাতি বেঁচে থাকলে তো মানুষের অন্তঃপরিবর্তন হবে ? তা ছাড়া বালবৃদ্ধবনিতাও কি যোদ্ধা সন্তদের তরবারির লক্ষ্য হতে পারে ? এসব প্রশ্নের উত্তর দিতে গিয়ে খ্রীষ্টীয় সাধুরাও উপলব্ধি করছেন যে মন্দের সঙ্গে দ্বন্দ্বে হিংসার ব্যবহার নীতিবিগর্হিত না হলেও অহিংসাই উন্নততর নীতি। ভালোবেসে নিজের ছেলেকে সাজা দেওয়া বলতে যখন তাকে মিসিল বা রকেট দিয়ে নিশ্চিহ্ন করা বোঝায় তখন সেটা না করাই শ্রেয়। তার পরিবর্তে গান্ধী প্রদর্শিত মার্গই অবলম্বনীয়। খ্রীষ্টই যার আদিপ্রবর্তক।

মূল সত্যটা হচ্ছে মানবজাতির প্রতি প্রেম। সে প্রেম যদি সত্য না হয়ে অসত্য হয়ে থাকে তবে মন্দ কর্মের বিরুদ্ধতা করতে গিয়ে মন্দ মানুষকে হত্যা করা আর মন্দ মানুষকে হত্যা করতে গিয়ে নিরীহ নারী ও শিশুকে ধ্বংস করা কোনটাই নীতিবিগর্হিত মনে হয় না। তবে খ্রীষ্টীয় মন্তের আদর্শ যে পরমাণু যুদ্ধের দিন ম্লান দেখায় এটাও স্বতঃসিদ্ধ। কোনো প্রকার কূটতর্ক দিয়েই পরকে বা আপনাকে বোঝানো যায় না যে মন্দের উপর ভালোকে জয়ী করতে হলে মানবজাতিকে সাবাড় করাও সমর্থনযোগ্য। বলা বাহুল্য ভালো মন্দ সকলেই জয়ের আগে লয় পাবে।

অন্যায়ের সঙ্গে সন্ধি না করে সংগ্রাম করে অন্যায়কারীকে ঘৃণা না করে ভালোবেসে সর্বপ্রকার দুঃখভোগ স্বেচ্ছায় বরণ করার নামই গান্ধীপ্রদর্শিত অহিংস পন্থা। ক্ষুরধার পন্থা। এ পন্থা যারা গ্রহণ করবে তারা মূল সত্যে ফাঁকি দেবে না। মানুষ যত মন্দই হোক, যত মন্দ কাজই করুক তাকে ভালোবাসবে। ভালোবাসতে যদি না পারে তবে গান্ধীজীর অনুসরণ করা নিষ্ফল। অহিংসার বনিয়াদ সেই সত্য যে সত্যের অপর নাম প্রেম।

গান্ধী পরিচালিত সত্যাগ্রহীরা ইংরেজবিদ্বেষী ছিলেন না। ইংরাজ জাতিকে তাঁরা কমবেশী ভালোবাসতেন। তাঁদের সংগ্রাম ভারতের পরাধীনতা নামক অভিশাপের বিরুদ্ধে। দীনদরিদ্রের শোষণ নামক অন্যায়ের বিরুদ্ধে। মন্দের সঙ্গে সংগ্রাম করা নীতিবিগর্হিত নয়। বরং সেইটেই হচ্ছে নীতি। কিন্তু মন্দের সঙ্গে সংগ্রামে নেমে মন্দকে ঘৃণা করতে গিয়ে মানুষকে ঘৃণা করা ও তার অনিষ্ট করা গান্ধীজীর বিচারে নীতিবিগর্হিত। তা যদি তুমি কর তবে তুমিও মন্দ কর্ম করলে। তুমিও ভালো থাকলে না।

মন্দের সঙ্গে যারা লড়াই করবে তারাই যদি মন্দ হয় তবে যে পক্ষই জিতুক না কেন মন্দেরই জয় হলো। গান্ধীশিষ্যরা সেরূপ জয় চাননি। তাঁদের কাম্য ছিল ইংরেজের চিত্তপরিবর্তন। বহুবার দুঃখবরণের ফলে তাঁরা সেই চিত্তপরিবর্তন ঘটালেন। ইংরেজরা শত্রু না হয়ে বন্ধু হলো। কিন্তু গোড়ায় ভালোবাসার অভাব থাকলে ও সংগ্রামপদ্ধতি হিংসাপ্রতিহিংসায় রক্তাক্ত হলে স্বাধীনতা হয়তো আসত, কিন্তু বন্ধুতা আসত না। মুখে একটা তিক্ত স্বাদ লেগে থাকত দুই পক্ষেরই। এক শতাব্দী লেগে যেত তিক্ততার ভাব কাটিয়ে উঠতে।

অহিংসা মানব ইতিহাসে নতুন নয়। নতুন তা হলে কী? নতুন হচ্ছে অন্যায়ের সঙ্গে দ্বন্দ্বে অহিংসার পরীক্ষা। অন্যায়ের সঙ্গে সংগ্রাম ইতিহাসে নতুন নয়। নতুন তা হলে কী? নতুন হচ্ছে অন্যায়ের সঙ্গে সংগ্রামে হিংসার দশ প্রহরণ ত্যাগ করে অহিংসার একমাত্র প্রহরণ গ্রহণ করা।

গান্ধীজীর পূর্বেও কেউ কেউ পরীক্ষানিরীক্ষা করেছেন। কিন্তু গান্ধীজীর হাতে অহিংসা একাধারে আর্ট ও বিজ্ঞান। একই সঙ্গে ধর্ম ও রাজনীতি। একই কালে জীবনদর্শন ও রণনীতি। এমনটি ইতিহাসে আর কখনো কোথাও দেখা যায়নি। আমরা তাঁর সমসাময়িকরা ইতিহাসের একটি অপূর্ব অধ্যায়ের অংশভাগী অথবা সাক্ষী।

একথা বলা শক্ত যে গান্ধীজীর ডাকে যারা সাড়া দিয়েছিল তাদের সকলের অন্তরে অন্যায়কারীর প্রতি ভালোবাসা ছিল বা সকলের চেতনায় অন্যায়বোধের তীব্রতা ছিল বা সকলেই তারা মন্দের সঙ্গে দ্বন্দ্বে অপর পক্ষকে সাজা না দিয়ে স্বেচ্ছাদুর্ভোগ বরণ করতে আগ্রহী হয়েছিল। এইপর্যন্ত বলা যেতে পারে যে তারা গান্ধীজীর আদেশে যথাসম্ভব সংযত থেকেছে। অপর পক্ষও মোটের উপর দমননীতির সীমা ছাড়িয়ে যায়নি। রাশ টেনে ধরেছে তাদের রাজনৈতিক প্রজ্ঞা ও ন্যায়বুদ্ধির ঐতিহ্য।

ইংলণ্ডের ইতিহাস স্বৈরতন্ত্রের থেকে গণতন্ত্রে ও খোশমেজাজী বিচারের থেকে আইন-সম্মত বিচারে উত্তরণের ইতিহাস। ভারতের ইতিহাস তা নয়। গণতন্ত্র তথা আইন-সম্মত বিচার যদি কাম্য হয় তবে ভারতের ইতিহাসে তার বিবর্তন অথবা প্রবর্তন অত্যাবশ্যক ছিল। সে কাজটাও করণীয় কাজ। তার দায়িত্ব নিয়েছিলেন উনবিংশ শতাব্দীর নেতারা। শাসকশক্তির দিক থেকেও আনুকূল্য ছিল। কিন্তু আরো জোরালো আন্দোলন না হলে ইংলণ্ডের জনমত মনঃস্থির করতে গড়িমসি করত। বীরত্বের পরীক্ষা না করে তারা চূড়ান্ত ক্ষমতা হাতছাড়া করত না। তা বলে ভারতীয়দের উপর অমানুষিক নির্যাতন চালাতেও তাদের রুচি ছিল না। গান্ধীজী এটা জানতেন বলেই হিংসার প্রশ্রয় দেননি। নিলে প্রতিহিংসার পাল্লাও সমান ভারী হতো।

সহিংস যুদ্ধের মতো অহিংস যুদ্ধও দ্বিপাক্ষিক। একপক্ষ যেমনটি করবে অপর পক্ষও তেমনটি করবে। কিন্তু অহিংস যুদ্ধে ইনিশিয়েটিভ সব সময় অহিংস সেনাপতির হাতে। সেইজন্যে অহিংস সেনাপতি যেমনটি করবেন অপর পক্ষের সেনাপতিও তেমনিটি করবেন। গান্ধীজীর পরিচালনায় দেশ যে পরিমাণ সংযত অথচ সংগ্রামরত হয়েছে দেশের শাসনশক্তিও সেই পরিমাণে সাড়া দিয়েছে। সত্যাগ্রহ যদি সৌম্যতর হতো অপরপক্ষের আচরণও ভদ্রতর হতো।

তবে গান্ধীজী তো দুর্ভোগের কমতি চাননি। বরং আরো বেশী দুর্ভোগের জন্যে প্রস্তুত হয়েই তিনি সংগ্রামের পরিকল্পনা করেছিলেন। তাঁর ভাবনা ছিল শুধু এই যে দমননীতির পেষণে অহিংসা যেন হিংসায় রূপান্তরিত না হয়ে যায়। অহিংস সৈনিকরা যেন হিংসায় উন্মত্ত না হয়। তা হলে মন্দের সঙ্গে দ্বন্দ্বে উভয়েই মন্দ। উভয়পক্ষই অন্যায়কারী। অবশ্য যে কোনো দেশের স্বাধীনতা সমরে তার নজীর মেলে।

স্বাধীনতার সৈনিকদের হিংসাকে ঐতিহাসিকরা কড়া নজরে দেখেন না। নীতিশাস্ত্রেও তেমন হিংসা নিন্দিত নয়। গান্ধীজী কিন্তু উদ্দেশ্যসিদ্ধির চেয়ে উপায়শুদ্ধিকেই মূল্য দিতেন বেশী। ইতিহাসে তিনি একটা নতুন নজীর রেখে যেতে চেয়েছিলেন। নীতি-শাস্ত্রেও একটি নতুন ধারা যোগ করতে যত্নবান হয়েছিলেন। দেশের স্বাধীনতা যেন তেন প্রকারেণ নয়। শুদ্ধতমপ্রকারেণ। এই ছিল তাঁর অভিষ্ট।

১৯৬৮

দ্বান্দ্বিক আদর্শবাদ

গান্ধীবাদ যাকে বলা হয় তার প্রকৃত নাম দ্বান্দ্বিক আদর্শবাদ। যেমন মার্কসবাদ হচ্ছে দ্বান্দ্বিক বস্তুবাদ। এই দুই মতবাদের মধ্যে একটি জায়গায় মিল আছে। সেটি হলো এদের বিশেষণ পদ। উভয়েই দ্বান্দ্বিক।

হাঁ, উভয়েই দ্বান্দ্বিক। কিন্তু দ্বন্দ্বের পদ্ধতি এক নয়। দ্বান্দ্বিক আদর্শবাদ অসত্যকে পরিহার করে, হিংসাকে প্রশ্রয় দেয় না। দ্বান্দ্বিক বস্তুবাদ প্রয়োজন হলে হিংসারও আশ্রয় নেয়, অসত্যেরও সুযোগ নেয়। তবে তেমন কোনো প্রয়োজন না হলে নেয় না।

দ্বান্দ্বিক বস্তুবাদ যে মনে প্রাণে অসত্যাচারী বা হাড়ে হাড়ে হিংসাপরায়ণ এ ধারণা ভুল। তারও প্রস্থাপনা মানবিকবাদের উপরে। তারও অভিষ্ট মানবহিত। অধিকাংশ মানুষকে শোষণের হাত থেকে উদ্ধার করে এমন এক সমাজের পরিকল্পনা যাতে সকলেরই প্রতি ন্যায়। ভাষান্তরে সোশ্যাল জাস্টিস।

দ্বান্দ্বিক আদর্শবাদও মানবিকবাদের উপর প্রতিষ্ঠিত। পরকাল বা পরলোক নিয়ে এর তেমন কোনো মাথাব্যথা নেই, কে কোন দেবতাকে হবি দিয়ে তুষ্ট করে তা নিয়ে এর কিছু আসে যায় না। একজন গান্ধীবাদী আস্তিক না হয়ে নাস্তিকও হতে পারেন, অজ্ঞেয়বাদীও হতে পারেন। মহাত্মার শিষ্যদের মধ্যে আস্তিক নাস্তিক অজ্ঞেয়বাদী সবরকম লোক ছিলেন। কিন্তু সকলেই তাঁরা মানবিকবাদী।

তা হলে দেখা যাচ্ছে দ্বান্দ্বিক বস্তুবাদ ও দ্বান্দ্বিক আদর্শবাদের মধ্যে আরো এক জায়গায় মিল। উভয়েই প্রস্তাবনা মানবিকবাদের উপরে। ইতিহাসের আধুনিক যুগটাই মানবিকবাদী দর্শন বিজ্ঞান রাজনীতি অর্থনীতি সমাজনীতির যুগ। গান্ধীজী এর বাইরে ছিলেন না। তবে প্রাচীন যুগের সঙ্গে তাঁর নাড়ীর যোগ ছিল। সেখান থেকেও তিনি বল সংগ্রহ করতেন। সেখানে তিনি এমন কিছু পেয়েছিলেন যা শুধু

প্রাচীন নয়, যা সনাতন, যা নিত্য নূতন। তা বলে তিনি কারো চেয়ে কম আধুনিক বা কম মানবিকবাদী ছিলেন না। তাঁর চিন্তাধারাও ছিল বৈজ্ঞানিক। কথায় কথায় পদে পদে এক্সপেরিমেন্ট করাই ছিল তাঁর পদ্ধতি। তার সঙ্গে বিরোধ ছিল না অহিংসার। বিরোধ ছিল না সত্যের। বরঞ্চ সেই ছিল সত্যের পরীক্ষা।

দ্বান্দ্বিক আদর্শবাদও অধিকাংশ মানুষকে মুক্তি দিয়ে সব মানুষের মঙ্গল বিধান করতে চায় ও সেইজন্যে বার বার দ্বন্দ্বে প্রবৃত্ত হয়। দ্বন্দ্বে ভীত অথবা শ্রান্ত যারা হয় তারা দ্বান্দ্বিক আদর্শবাদী নয়। গান্ধীবাদী নয়। হতে পারে গান্ধীমার্কা।

দ্বান্দ্বিক আদর্শবাদের সঙ্গে অহিংস পদ্ধতি যোগ দিলে তার নাম হয় সত্যাগ্রহ। সত্যাগ্রহ একজন ব্যক্তিরও হতে পারে। লক্ষ লক্ষ ব্যক্তিরও হতে পারে। সংখ্যার চেয়ে সত্যের দাম বেশী। ব্যক্তিসত্যাগ্রহও তার সত্যের জোরে জয়ী হতে পারে। প্রতিপক্ষের চিত্তপরিবর্তন ঘটাতে পারে। সমাজের বা রাষ্ট্রের প্রয়োজনীয় সংস্কার সাধন করতে পারে। তবে বিপ্লব যদি লক্ষ্য হয় সংখ্যার মূল্য অপরিসীম।

কোটি কোটি মানুষের জনতা দ্বন্দ্বে নামতে পারে, কিন্তু তার কাছে আদর্শবাদ আশা করা করা যায় না। অহিংসা আশা করাও উচ্চাশা। গণসত্যাগ্রহ কথাটা শুনতে যেমন জঁাকালো তেমনি ফাঁকা। জনতাকে জাগিয়ে তুললে জনতা আদর্শের বা সত্যের অনুরোধ শোনে না, হিংসার আকর্ষণে ভুলে যায়। তখন সত্যাগ্রহ হয় হত্যাগ্রহ।

তা হলে কি সংঘবদ্ধ সত্যাগ্রহের আহ্বান ভুল? না, তেমন কোনো কথা নেই। সত্যাগ্রহে সকলের অধিকার আছে। কেবল দু-চারজন উত্তরসাধকের নয়। নতুন কোনো অধিকারীভেদ প্রবর্তন করা গান্ধীজীর উদ্দেশ্য ছিল না। যেখানে সকলেই সমান অধিকারী সেখানে সবাইকে ডাক দিতে হয়। মানুষের শুভবুদ্ধির উপর ভরসা রাখতে হয়।

সত্যাগ্রহের যে ইতিহাস আমরা পড়েছি তার দক্ষিণ আফ্রিকান অংশটিতে সমষ্টির যোগদান মোটের উপর সুশৃঙ্খল ও সংযত। কারণ সংখ্যা সেখানে আয়ত্তের বাইরে চলে যায়নি। গান্ধীজী ও তাঁর সহকর্মীরা তাঁদের নিয়ন্ত্রণ বজায় রেখেছেন। কয়েক হাজার না হয়ে কয়েক লাখ হলে কী হতো তা বলা যায় না। হয়তো হিংসা এসে পড়ত।

যাদের বিরুদ্ধে সত্যাগ্রহ তাদের সংখ্যা বেশী, যাদের দ্বারা সত্যাগ্রহ তাদের সংখ্যা কম। দক্ষিণ আফ্রিকায় তাই জনতাকে সামলানো শক্ত হয়নি। এদেশে শাসকদের সংখ্যা কম, শাসিতদের সংখ্যা বেশী। একবার ভয় ভেঙে গেলে হিংসার প্ররোচনা দুর্বার। জনতাকে অহিংস রাখা যাদের কাজ তাঁরা হয়তো লাখে একজন। দক্ষিণ

আফ্রিকায় ছিলেন হাজারে একজন। ভারতের মাটিতে গণসত্যাগ্রহ রোপণ করতে সেইজন্যে এত বেগ পেতে হয়েছে।

এখনো জোর করে বলা চলে না যে গণসত্যাগ্রহের চারা ভারতের মাটিতে দৃঢ়ভাবে শিকড় গেড়েছে। গান্ধীজীর মতো তেমন নেতাও কি আছেন যিনি, মালীর মতো প্রতিদিন লক্ষ রেখেছেন ও চর্চা করছেন? জনগণের মন পাবার জন্যে হিংসা যেমন সক্রিয় অহিংসা কি তেমনি সক্রিয়? তাই যদি হতো তবে যত্র তত্র যখন তখন জনতা উচ্ছৃঙ্খল হতো না, পুলিশ ডাকতে হতো না, পুলিশে না কুলোলে মিলিটারি।

গণসত্যাগ্রহ এখন একটি ঐতিহাসিক পর্ব। ইংরেজ শাসনের সঙ্গে সঙ্গে চুকে গেছে। আর ব্যক্তিসত্যাগ্রহ এখনো খোলা আছে।

১৯৬৯

মহাকাব্যের নায়ক

পনেরোই অগাস্ট তাঁকে যার থেকে বঞ্চিত করেছিল তিরিশে ও একত্রিশে জানুয়ারি তাই তাঁকে দিল। গ্লোরিয়াস এণ্ডিং। গৌরবময় সমাপ্তি।

গান্ধীজীর সংগ্রাম ছিল এপিক সংগ্রাম। তা নিয়ে একদিন এপিক লেখা হবে। কিন্তু যেভাবে সে সংগ্রাম সারা হলো তাকে গ্লোরিয়াস এণ্ডিং বলা শক্ত। মহাত্মার নিজের কথায় সেটা একটা গ্লোরিয়াস স্ট্রাগলের ইনগ্লোরিয়াস এণ্ডিং।

এপিক যাঁরা লিখবেন তাঁদেরও মনে হবে পনেরোই অগাস্টের পরিসমাপ্তি অমন একটি মহাকাব্যের বা মহানাটকের উপযুক্ত পরিসমাপ্তি নয়। তা নিয়ে ইতিহাস লেখা হবে কিন্তু আর্টের চাহিদা মিটবে না। সেইজন্যেই কি জীবনদেবতা তিরিশে জানুয়ারির ঘটনা ঘটালেন? তার সঙ্গে জুড়ে দিলেন একত্রিশে জানুয়ারির শেষ সৈনিক অপসরণ?

হাঁ, সেইজন্যেই। এপিক যাঁরা লিখবেন তাঁরা পনেরোই অগাস্টের অর্ধসমাপ্তিকে সমাপ্তি ভেবে 'ইনগ্লোরিয়াস এণ্ডিং' বলবেন না। আরো কিছুদূর এগিয়ে যাবেন। অবশেষে পাবেন 'গ্লোরিয়াস্ এণ্ডিং'। গৌরবময় পরিসমাপ্তি।

ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রাম যে একটি মহাকাব্যের বিষয় একথা সে সংগ্রাম সারা হবার আগেই আমার মনে হয়েছে। একদিন না একদিন কেউ না কেউ নতুন এক মহাভারত লিখবেন। তার নায়ক হবেন গান্ধী। একাধারে যুধিষ্ঠির ও কৃষ্ণ। তখন কিন্তু খেয়াল হয়নি যে কুরুক্ষেত্রের জয়ই শেষ কথা নয়, তার পরে আছে যুধিষ্ঠিরের

নৈরাশ্যময় মহাপ্রস্থান ও কৃষ্ণের শোচনীয় বিনাশ। নতুন মহাভারতেও তার অনুরূপ অ্যন্টিক্লাইম্যাক্স থাকবে।

যুধিষ্ঠিরের স্বর্গপ্রবেশ নতুন মহাভারতে দেখানো যাবে না। মহাত্মা গান্ধী স্বর্গ কামনা করেননি। সেখানে তিনি যুধিষ্ঠিরের সঙ্গে নন, বুদ্ধের সঙ্গে তুলনীয়। তিনি চেয়েছেন দীনদুঃখীর সঙ্গে এক হয়ে যেতে। দেখাতে হবে কেমন করে তাঁর আত্মা সকলের আত্মার সঙ্গে এক হয়ে গেল। নির্বাণের ভিতর দিয়ে এক।

তাঁর ছবি যখন আঁকা হবে তখন তাঁর আকার হবে প্রমাণ সাইজের চেয়ে বড়ো। যেমন বুদ্ধের। আশেপাশের মানুষের চেয়ে মাথা উঁচু। বুদ্ধমূর্তির মতো বিরাট।

কিন্তু তাঁর বাণীর কী হবে? যে বাণী তাঁর জীবনের থেকে অভিন্ন। কেউ যদি তাঁর মতবাদ গ্রহণ না করে, সেই অনুসারে কাজ না করে, সবাই যদি তাঁর মতবাদে বিশ্বাস হারিয়ে ফেলে তবে বুদ্ধের বেলা যা হয়েছে তাঁর বেলাও তাই হবে। নিজ বাসভূমে পরবাসী। বরঞ্চ অন্য কোনো দেশে তাঁর বাণীর সমাদর হবে। ইতিমধ্যেই হতে আরম্ভ করেছে। যেমন আমেরিকায়। প্রতিরোধকারীদের মধ্যে।

১৯৬৯

অগ্নিপরীক্ষা

সেদিন আমরা ট্র্যাজেডী ভিন্ন আর কিছু দেখিনি। কিন্তু বীরের অহিংসা তো আর কোনোরূপে প্রতিভাত হতো না। 'আপনি আচরি ধর্ম জীবেরে শেখায়।'

ভারত ইতিহাসের গান্ধী সেদিন মানব ইতিহাসের সপ্তর্ষি মণ্ডলে উত্তীর্ণ হলেন। কেউ তাঁকে সেই উচ্চতা থেকে নামাতে পারবে না।

সাফল্য মহান্ আত্মার জন্যে নয়। অনেকবার মনে হয়েছে, গান্ধী এমন সফলকাম কেন? তিনি কি তবে মহাত্মা নন? আবার মনে হয়েছে, আশ্চর্য! যীশুর মতো এতোদিন তাঁকে ক্রুশে বিদ্ধ হতে হয়নি। এ নিয়তি এড়ালেন কী করে?

এ নিয়তি এড়ানো গেল না। যেমন ব্যক্তিত্ব তেমনি তো নিয়তি। তাঁর মতো চরিত্রের সেইটেই পরিণতি। হ্যাপি এণ্ডিং তাঁর মতো কাহিনীর জন্যে নয়। নাটক বা উপন্যাস বা মহাকাব্য লিখতে বসলে আমরা তাঁর মতো নায়কের জন্যে হ্যাপি এণ্ডিং খুঁজে পেতুম না।

অনেক সময় মনে হয়েছে আমি ধন্য। যে বাতাসে তিনি নিঃশ্বাস নিচ্ছেন সে বাতাসে আমি নিঃশ্বাস নিচ্ছি। যদিও তাঁর সঙ্গে সব মেলে না।

বরাবর মনে হয়েছে তিনি আমাদের সবাইকে ভালোবাসেন। যদিও আমাদের চেনেন না। যখন তাঁর সঙ্গে আলাপই হয়নি তখনো তাঁর ভালোবাসার প্রবাহ আমি অনুভব করেছি। তাঁর সেই ভালোবাসা যেন এক অদৃশ্য ফল্গুধারা।

স্বাধীনতার জন্যে সংগ্রাম করছেন এই তাঁর সম্বন্ধে একমাত্র কথা বা চরম কথা নয়। তিনি তাঁর দেশবাসীদের ভালোবাসেন, ভালোবেসে সেবা করছেন, ভালোবাসার খাতিরে জীবন উৎসর্গ করেছেন, প্রাণ বিসর্জন দেবেন, এই সব চেয়ে বড়ো কথা।

ব্রিটিশ রাজত্ব না থাকলে তার বিরুদ্ধে সত্যাগ্রহ থাকে না, সত্যাগ্রহ না থাকলে গান্ধীনেতৃত্ব থাকে না। সব সত্য। তবু তার চেয়ে সত্য এমন করে এ দেশের মানুষকে আর কেউ তাঁর মতো ভালোবাসেনি। অন্তত আমাদের যুগে।

জীবনের শেষদিনটিতেও সমানে চরকা কাটা চলেছে। সেই তাঁর ভালোবাসার প্রকাশ। দীন দুঃখী দেশবাসী সাধারণের প্রতি। সেইভাবেই তাদের সঙ্গে তিনি সাযুজ্য অনুভব করতেন। তারাও করত তাঁর সঙ্গে।

ভালোবাসার ডোর ছিন্ন করতে পারে এমন শক্তি কি তিনটে বুলেটের আছে? গান্ধী তাঁর দেশবাসীর তথা বিশ্ববাসীর যেমন পরমাত্মীয় ছিলেন তেমনি রয়ে গেলেন।

তা সত্ত্বেও ভুলতে পারিনে যে এর নাম ট্র্যাজেডী। চেষ্টা করলে নিবারণ করতে পারা যেত। সেইভাবেই প্রমাণ করতে পারা যেত আমাদের ভালোবাসা। এ কলঙ্ক মুছবে না।

ক্রুশিফিকশন যদি ঘটল তবে রেসারেকেশনও কি ঘটবে না?

গান্ধীকে ফিরে পাওয়া যাবে না, কিন্তু গান্ধীর জীবনে জীবন লাভ করে সারা দেশ নতুন করে জাগবে। সারা বিশ্বেও নব জাগরণ আসবে।

১৯৬৯